রসায়ন

দাখিল নবম ও দশম শ্রেণি

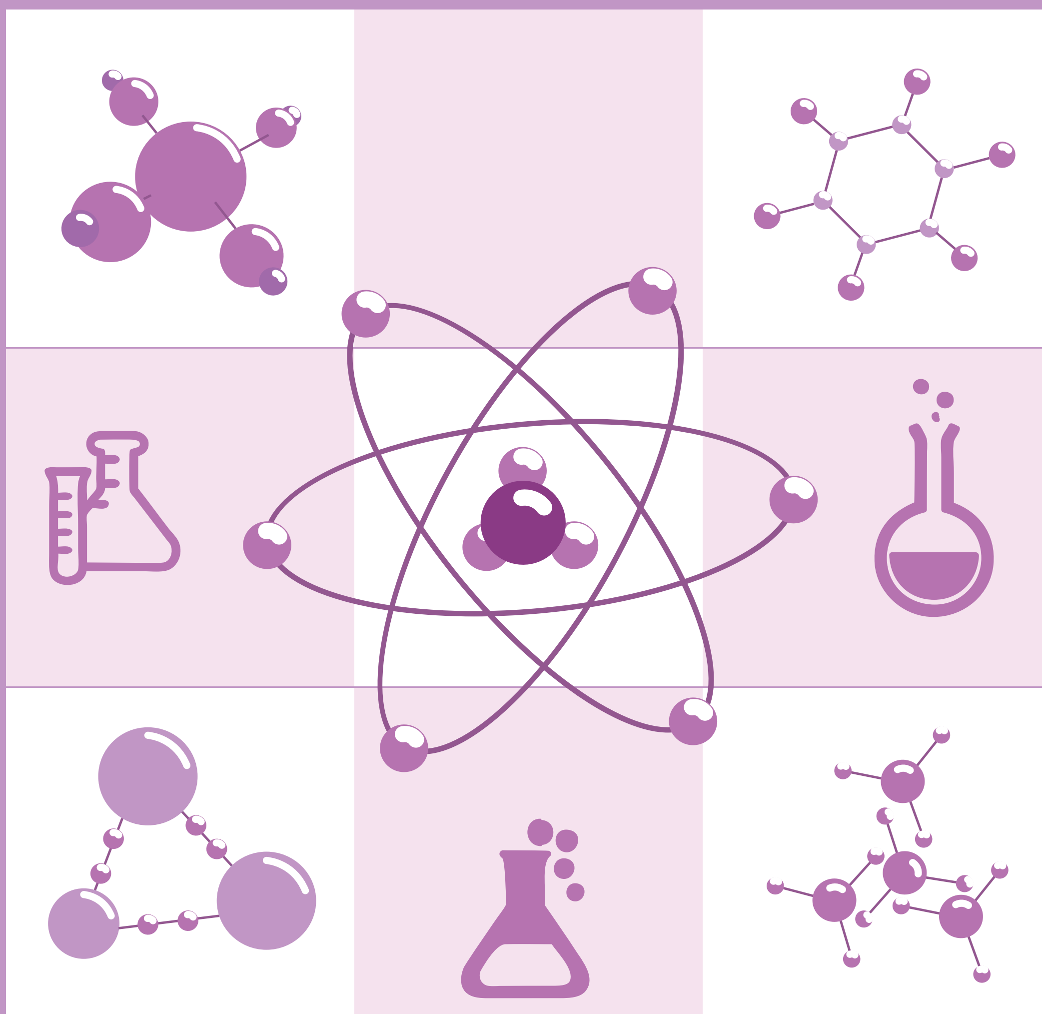

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
দাখিল নবম ও দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

রসায়ন

দাখিল

নবম ও দশম শ্রেণি

২০২৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা

প্রফেসর ড. নীলুফার নাহার

অলিউল্লাহ মোঃ আজমতগীর

ড. মোঃ ইকবাল হোসেন

ড. মোঃ মমিনুল ইসলাম

নাফিসা খানম

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০১২

পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০১৭

পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর ২০২৪

পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর ২০২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গকথা

বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উপযোগ বহুমাত্রিক। শুধু জ্ঞান পরিবেশন নয়, দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমে সমৃদ্ধ জাতিগঠন এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। একই সাথে মানবিক ও বিজ্ঞানমনস্ক সমাজগঠন নিশ্চিত করার প্রধান অবলম্বনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে আমাদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেম, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শক্তিতে উজ্জীবিত করে তোলাও জরুরি।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রাণ শিক্ষাক্রম। শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো পাঠ্যবই। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর উদ্দেশ্যসমূহ সামনে রেখে গৃহীত হয়েছে একটি লক্ষ্যাভিসারী শিক্ষাক্রম। এর আলোকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণের কাজটি নিষ্ঠার সাথে করে যাচ্ছে। সময়ের চাহিদা ও বাস্তবতার আলোকে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও মূল্যায়নপদ্ধতির পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিশোধনের কাজটিও এই প্রতিষ্ঠান করে থাকে।

বাংলাদেশের শিক্ষার স্তরবিন্যাসে মাধ্যমিক স্তরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বইটি এই স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়স, মানসপ্রবণতা ও কৌতূহলের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং একইসাথে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের সহায়ক। বিষয়জ্ঞানে সমৃদ্ধ শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞগণ বইটি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। আশা করি বইটি বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান পরিবেশনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মনন ও সৃজনের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

বিশ্বের চাহিদা, প্রযুক্তিগত উন্নতি, পরিবেশ ও কর্মসংস্থানের দিকে লক্ষ রেখে রসায়ন বইয়ের বিষয়বস্তু নির্বাচন করা হয়েছে। দৈনন্দিন জীবনে রসায়নের প্রয়োগ, হাতে-কলমে কাজ, রসায়ন প্রক্রিয়া, পরিবেশ দূষণ, কর্ম-দক্ষতাসম্পন্ন মানবসম্পদ তৈরি ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় রেখে পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ণ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের উৎসাহ বাড়ানোর জন্য পাঠ্যপুস্তকটির বিষয়বস্তু জীবনঘনিষ্ঠ করা হয়েছে।

পাঠ্যবই যাতে জবরদস্তিমূলক ও ক্লান্তিকর অনুষঙ্গ না হয়ে বরং আনন্দাশ্রয়ী হয়ে ওঠে, বইটি রচনার সময় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত সহযোগে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে বইটিকে যথাসম্ভব দুর্বোধ্যতামুক্ত ও সাবলীল ভাষায় লিখতে। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের সর্বশেষ সংস্করণকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানরীতি অনুসৃত হয়েছে। যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের পরেও তথ্য-উপাত্ত ও ভাষাগত কিছু ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। পরবর্তী সংস্করণে বইটিকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করার আন্তরিক প্রয়াস থাকবে। এই বইয়ের মানোন্নয়নে যে কোনো ধরনের যৌক্তিক পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে।

পরিশেষে বইটি রচনা, সম্পাদনা ও অলংকরণে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

অক্টোবর ২০২৫

প্রফেসর রবিউল কবীর চৌধুরী
চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
প্রথম	রসায়নের ধারণা	১
দ্বিতীয়	পদার্থের অবস্থা	১৭
তৃতীয়	পদার্থের গঠন	৩৫
চতুর্থ	পর্যায় সারণি	৫৯
পঞ্চম	রাসায়নিক বন্ধন	৮২
ষষ্ঠ	মোলের ধারণা ও রাসায়নিক গণনা	১০৯
সপ্তম	রাসায়নিক বিক্রিয়া	১৪২
অষ্টম	রসায়ন ও শক্তি	১৬৮
নবম	এসিড-ক্ষারক সমতা	২০৬
দশম	খনিজ সম্পদ: ধাতু-অধাতু	২৩৩
একাদশ	খনিজ সম্পদ: জীবাশ্ম	২৬১
দ্বাদশ	আমাদের জীবনে রসায়ন	২৮৭

প্রথম অধ্যায়
রসায়নের ধারণা
(The Concepts of Chemistry)

তোমরা যারা নবম শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র তারা রসায়ন বইটি হাতে পেয়েছো। বইটি হাতে পেয়ে কিছু প্রশ্ন তোমাদের মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে—রসায়ন বিষয়টি কী? কেনই-বা আমরা রসায়ন পড়ব? অর্থাৎ রসায়ন আমাদের কী কাজে লাগে? রসায়নের সাথে বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার কি কোনো সম্পর্ক আছে? এসব বিষয়ের উত্তর এ অধ্যায়টি পড়লে জানতে পারবে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- রসায়নের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- রসায়নের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করতে পারব।
- রসায়নের সাথে বিজ্ঞানের অন্য শাখাগুলোর সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারব।
- রসায়ন পাঠের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- রসায়নে অনুসন্ধান ও গবেষণা প্রক্রিয়ার বর্ণনা করতে পারব।
- বিভিন্ন ধরনের অনুসন্ধানমূলক কাজের পরিকল্পনা প্রণয়ন, অনুমিত সিদ্ধান্ত গঠন ও পরীক্ষা করতে পারব।
- রসায়ন পরীক্ষাগারে কাজের সময় প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করতে পারব।
- প্রকৃতির ও বাস্তব জীবনের ঘটনাবলি রসায়নের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করতে পারব।

১.১ রসায়ন পরিচিতি (Introduction to Chemistry)

প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষ কাপড় পরতে জানত না, ঘরবাড়ি বানাতে জানত না, এমনকি রান্না করে খেতে জানত না। আজ ডিজিটালাইজেশনের যুগে মানুষ কত কিনা করছে। তাপকে নিয়ন্ত্রণ করে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করছে, বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে শিখেছে। বিদ্যুৎকে ব্যবহার করে মানুষ কত কী করছে। ইন্টারনেট ব্যবহার করে মানুষ ঘরে বসে পৃথিবীর কোথায় কী ঘটছে তা দেখতে পাচ্ছে। এগুলোর সব কিছুই হলো বিজ্ঞানের অবদান। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন হয়, বিজ্ঞান কী? বিজ্ঞান হলো, মানবজাতির পদ্ধতিগত, নিয়মানুগ ধারাবাহিক প্রচেষ্টা যার দ্বারা প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে নিজেদের কল্যাণে কাজে লাগানো। বিজ্ঞানের অনেকগুলো শাখা আছে যার মধ্যে রসায়ন হলো অন্যতম প্রধান শাখা।

এখানে প্রশ্ন হলো, রসায়ন কী? বিজ্ঞানের যে শাখায় মৌল বা মৌলিক পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত যৌগ বা যৌগিক পদার্থের সংযুক্তি, গঠন প্রকৃতি, ধর্ম, ব্যবহার ইত্যাদি এবং বস্তুসমূহের পারস্পরিক রূপান্তর ও রূপান্তরকালে শক্তি মূলত তাপ শক্তির শোষণ ও নিঃসরণ আলোচনা করা হয় তাকে রসায়ন বলে।

আমরা জানি, কয়লা পোড়ালে তাপ উৎপাদিত হয়; সেই সাথে কার্বন ডাইঅক্সাইড যৌগ গঠিত হয়। আর্দ্র-পরিবেশে লোহা বা লোহা নির্মিত জিনিস রেখে দিলে তাতে মরিচা পড়ে, বিভিন্ন গাছের নির্যাস থেকে ঔষধ ও সুগন্ধি নিষ্কাশন করা হয়, আকরিক থেকে বিভিন্ন ধাতু নিষ্কাশন ইত্যাদি হলো রসায়নের কতিপয় উদাহরণ। বলা যায়, প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই মানুষ জেনে অথবা না জেনে বিভিন্নভাবে রসায়নের ব্যবহার করে আসছে। এ পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী প্রথম ব্যবহৃত ধাতু হলো তামা। এছাড়া সেই প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ সোনা, রুপা, টিন, লোহা ইত্যাদি ধাতু ব্যবহার করছে।

খ্রিষ্টপূর্ব ৩৫০০ অব্দের দিকে কপার ও টিন ধাতুকে গলিয়ে তরলে পরিণত করে এ দুটি তরলকে একত্রে মেশানো হয়। অতঃপর মিশ্রণকে ঠান্ডা করে কঠিন সংকর ধাতুতে (alloy) পরিণত করা হয়। এ সংকর ধাতুর নাম ব্রোঞ্জ। এ ব্রোঞ্জ দিয়ে মানুষ অস্ত্র তৈরি করত এবং পশু শিকার, কৃষিকাজ, জ্বালানির জন্য কাঠ সংগ্রহ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় অনেক কাজে এ অস্ত্র ব্যবহার করত। এ ব্রোঞ্জ তখনকার মানবজাতির জন্য এক অতি প্রয়োজনীয় পদার্থে পরিণত হয়। ব্রোঞ্জ-এর আবিষ্কার মানব সভ্যতাকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গেছে। ব্রোঞ্জের মতো মানুষ ইস্পাতসহ অনেকগুলো সংকর ধাতু তৈরি করেছে এবং বিভিন্ন কাজে সেগুলো ব্যবহার করছে।

প্রাচীনকালের দার্শনিকেরা পদার্থের গঠন নিয়ে অনেক চিন্তা-ভাবনা করেন। খ্রিষ্টপূর্ব ৩৮০ অব্দের দিকে গ্রিক দার্শনিক ডেমোক্রিটাস বলেন যে, প্রত্যেক পদার্থকে অনবরত ভাঙতে থাকলে শেষ পর্যায়ে এমন

২০২৫

এক ক্ষুদ্র কণা পাওয়া যাবে যাকে আর ভাঙা যাবে না। তিনি এর নাম দেন অ্যাটম (Atom অর্থ indivisible বা অবিভাজ্য)। প্রায় একই সময়ে ভারতীয় দার্শনিক কোনাডা 'অণুর' ধারণা প্রকাশ করেছিলেন যা অ্যাটমের ধারণার অনুরূপ। কিন্তু এ ধারণাগুলোর কোনো পরীক্ষামূলক ভিত্তি ছিল না। তাছাড়া দার্শনিক অ্যারিস্টটল এ ধারণার বিরোধিতা করেন। তখন অ্যারিস্টটলসহ অন্য দার্শনিকেরা মনে করতেন সকল পদার্থ মাটি, আগুন, পানি ও বাতাস মিলে তৈরি হয়। ফলে অ্যাটমের ধারণা অনেক দিন পর্যন্ত মানুষ গ্রহণ করেনি।

চিত্র ১.০১: অ্যান্টনি ল্যাভয়সিয়ে, রবার্ট বয়েল, স্যার ফ্রান্সিস বেকন এবং জন ডালটন

Chemistry শব্দের উৎপত্তি

মধ্যযুগে আরবের মুসলিম দার্শনিকগণ কপার, টিন, সিসা ইত্যাদি স্বল্পমূল্যের ধাতু থেকে সোনা তৈরি করতে চেষ্টা করেছিলেন। তাদের আরেকটি চেষ্টা ছিল এমন একটি মহৌষধ তৈরি করা, যা খেলে মানুষের আয়ু অনেক বেড়ে যাবে। এগুলোতে সফল হওয়ার জন্য তারা অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন। ফলে সোনা বানাতে বা মানুষের আয়ু বৃদ্ধিতে সফল না হলেও বিভিন্ন পদার্থ মিশিয়ে সোনার মতো দেখতে এমন অনেক পদার্থ তৈরি করেছিলেন। মূলত এগুলোই ছিল রসায়নের ইতিহাসে প্রথম পদ্ধতিগতভাবে রসায়নের চর্চা বা রসায়নের গবেষণা। মধ্যযুগীয় আরবের রসায়ন চর্চাকে আলকেমি (Alchemy) বলা হতো আর গবেষকদের বলা হতো আলকেমিস্ট (Alchemist)। আলকেমি শব্দটি এসেছে আরবি শব্দ 'আল-কিমিয়া' থেকে। 'আল-কিমিয়া' শব্দটি আবার এসেছে 'কিমি' (Chemi বা Kimi) শব্দ থেকে। এই Chemi শব্দ থেকেই Chemistry শব্দের উৎপত্তি, যার বাংলা প্রতিশব্দ হলো রসায়ন।

আলকেমিস্ট জাবির-ইবনে-হাইয়ান সর্বপ্রথম গবেষণাগারে রসায়নের চর্চা করেন। তাই তাঁকে অনেক সময় রসায়নের জনক বলা হয়ে থাকে। জাবির-ইবনে-হাইয়ান বিশ্বাস করতেন সকল পদার্থ মাটি, পানি, আগুন আর বাতাস দিয়ে তৈরি। তিনি এসব নিয়ে গবেষণা করলেও রসায়নের প্রকৃত রহস্যগুলো তার কাছে পরিষ্কার ছিল না। তবে রসায়নের প্রকৃত রহস্য উদ্ভাবনে রসায়ন চর্চা প্রথম শুরু করেন অ্যান্টনি ল্যাভয়সিয়ে, রবার্ট বয়েল, স্যার ফ্রান্সিস বেকন এবং জন ডাল্টনসহ অন্যান্য বিজ্ঞানী। অ্যান্টনি ল্যাভয়সিয়েকে আধুনিক রসায়নের জনক বলা হয়।

২০২৩

বিজ্ঞানের যে শাখায় পদার্থের গঠন, পদার্থের ধর্ম এবং পদার্থের পারস্পরিক রূপান্তর ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে রসায়ন বলে।

টেবিল ১.০১: দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন বিষয় রসায়নের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ

বিষয়/ঘটনা	রসায়নের দৃষ্টিকোণে ঘটনার বিশ্লেষণ
কাঁচা আম টক কিন্তু পাকা আম মিষ্টি।	কাঁচা আমে বিভিন্ন ধরনের জৈব এসিড থাকে যেমন: সাক্সিনিক এসিড, ম্যালেয়িক এসিড প্রভৃতি থাকে, ফলে কাঁচা আম টক। কিন্তু আম যখন পাকে তখন এই এসিডগুলোর রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজের সৃষ্টি হয়। তাই পাকা আম মিষ্টি।
কেরোসিন, প্রাকৃতিক গ্যাস ও মোম ইত্যাদির দহন।	কেরোসিন, প্রাকৃতিক গ্যাস, মোম এগুলোর মূল উপাদান হাইড্রোকার্বন। হাইড্রোকার্বন হচ্ছে কার্বন আর হাইড্রোজেনের যৌগ। তাই যখন এগুলোর দহন ঘটে তখন বাতাসের অক্সিজেনের সাথে এগুলোর বিক্রিয়া হয় এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড, জলীয় বাষ্প, আলো আর তাপশক্তির সৃষ্টি হয়।
পেটের এসিডিটির জন্য এন্টাসিড ওষুধ খাওয়া।	পাকস্থলীতে অতিরিক্ত হাইড্রোক্লোরিক এসিড নিঃসরিত হলে পেটে এসিডিটির সমস্যা হয়। এন্টাসিডে থাকে অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড ও ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্সাইড। এ দুটি যৌগ এসিডকে প্রশমিত করে।

এ ঘটনাগুলো থেকে সহজেই বুঝতে পারছো যে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন জিনিস রসায়নের সাথে সম্পর্কিত। কাজেই বিজ্ঞানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শাখার একটি হলো রসায়ন।

১.২ রসায়নের পরিধি বা ক্ষেত্রসমূহ (The Scope of Chemistry)

যেখানে পদার্থ আছে সেখানেই রসায়ন আছে। বায়ুমণ্ডলে বিভিন্ন গ্যাসীয় পদার্থ থাকে। বায়ুমণ্ডলে কিছু না কিছু রাসায়নিক পরিবর্তন অনবরত ঘটছে। আমরা যে মাটির উপরে বসবাস করছি সে মাটিতেও প্রতি মুহূর্তে ঘটে যাচ্ছে অসংখ্য পরিবর্তন। শুধু বর্তমান সময় কেন, সুদূর অতীতেও এইসব পরিবর্তন ঘটেছে। যখন এ পৃথিবীর প্রথম জন্ম হলো তখন পৃথিবী এমন ছিল না, পৃথিবী ছিল খুবই উত্তপ্ত। সেখানে কোনো বাতাস ছিল না, পানি ছিল না, ছিল না কোনো জীবের অস্তিত্ব। কোটি কোটি বছর ধরে ঘটেছে অসংখ্য রাসায়নিক পরিবর্তন। সৃষ্টি হয়েছে বায়ুমণ্ডল, সৃষ্টি হয়েছে পানি, সৃষ্টি হয়েছে হাজারো রকমের

পদার্থ। এসব কিছুই পৃথিবীকে জীবজগতের জন্য বসবাসের উপযোগী করেছে। মানুষসহ বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদ তা ক্ষুদ্র অণুজীব (যেমন—ব্যাকটেরিয়া, অ্যামিবা ইত্যাদি) হোক অথবা বৃহৎ উদ্ভিদ বা প্রাণীই হোক সকলের দেহই বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে তৈরি। প্রতিটি দেহ হলো এক-একটি বড় রাসায়নিক কারখানা। এখানে প্রতি মুহূর্তেই ঘটে চলেছে অসংখ্য রাসায়নিক বিক্রিয়া। সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে মানুষ বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে তৈরি করে চলেছে আমাদের ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন সামগ্রী। যেমন— তুমি যে জামা-কাপড় পরছো, যে পেস্ট দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করছো, যে চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছ বা ত্বকে যে কসমেটিকস ব্যবহার করছো তা সবই রসায়নের অবদান। এছাড়া আমরা পরিষ্কারের কাজে সাবান, টয়লেট ক্লিনার, এবং জীবন রক্ষার জন্য ব্যবহার করছি বিভিন্ন ধরনের ওষুধসামগ্রী। আমাদের খাদ্য চাহিদাকে পূরণ করার জন্য ফসলের খেতে ব্যবহার করছি সার ও কীটনাশক। যানবাহনে ব্যবহার করছি পরিশোধিত পেট্রোল, ডিজেল—এসবই শিল্প ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে তৈরি করা হচ্ছে। সত্যি কথা বলতে কি রসায়নের পরিধি এ ক্ষুদ্র পরিসরে লিখে শেষ করা যাবে না। ১.০২ টেবিলে রসায়নের কিছু অতি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রের উদাহরণ দেওয়া হলো—

টেবিল ১.০২: রসায়নের কিছু ক্ষেত্র

বস্তু/পদার্থ	উপাদান	উৎস ও রাসায়নিক পরিবর্তন
বায়ু	প্রধানত নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন	আমরা শ্বাস নেওয়ার সময় যে বায়ু গ্রহণ করি সেই বায়ুর অক্সিজেন শরীরের ভেতরে বিয়োজিত (decomposed) খাদ্য উপাদানের সাথে বিক্রিয়া করে শক্তি উৎপাদন করে। এ ক্ষেত্রে নাইট্রোজেন লঘুকরণের মাধ্যমে বিক্রিয়ার তীব্রতাকে নিয়ন্ত্রণ করে খাদ্য।
খাবারের পানি	পানিসহ বিভিন্ন খনিজ লবণ	জীবের শরীরের বেশির ভাগই পানি। শরীরের বিষাক্ত পদার্থ এ পানিতে দ্রবীভূত হয়ে প্রস্রাব ও ঘামের সাহায্যে শরীর থেকে বের হয়ে যায়। খাবারের পানিতে পানি ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের খনিজ লবণ যেমন—ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদি ধাতুর লবণ থাকে, যা আমাদের শরীরের জন্য বিশেষ উপকারী। শরীরে পানির স্বল্পতা (dehydration) হলে মানুষ মারা যেতে পারে। ওলাউঠা বা কলেরা রোগে মানুষের মৃত্যুর এটিই মূল কারণ।
সার	নাইট্রোজেন, ফসফরাস,	আমরা যেমন খাবার খাই, তেমনি উদ্ভিদেরও খাবারের প্রয়োজন হয়। উদ্ভিদের খাবারের প্রধান উপাদান হলো-নাইট্রোজেন, ফসফরাস ইত্যাদি। এগুলো উদ্ভিদ মাটি থেকে সংগ্রহ করে। তাছাড়া বিভিন্ন সারে এসব মৌলের যৌগ থাকে।

২০২৬

	ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, পটাশিয়াম	তাই বিভিন্ন ধরনের সার উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় পুষ্টি প্রদান করে। ফলে ফসলের উৎপাদন ভালো হয়।
কাগজ	সেলুলোজ	কাগজের আবিষ্কার মানব সভ্যতার এক অনন্য অবদান। বাঁশ, আখের ছোবড়া ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে সেলুলোজ থাকে। কাগজ তৈরির কারখানায় এই সমস্ত বস্তুকে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ করে কাগজ তৈরি করা হয়।

১.৩ রসায়নের সাথে বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার সম্পর্ক (Relationship Between Chemistry and Other Branches of Science)

ইতোমধ্যে তোমরা জেনেছো বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা রয়েছে। যেমন– রসায়ন, জীববিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, গণিত, পরিবেশবিজ্ঞান, ভূ-তত্ত্ব বিজ্ঞান ইত্যাদি। বিজ্ঞানের একটি শাখার সাথে অন্য একটি শাখার গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা যেমন রসায়নের উপর নির্ভরশীল, রসায়নও তেমনি অন্যান্য শাখার উপর নির্ভরশীল। নিচে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সাথে রসায়নের সম্পর্ক কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হলো:

জীববিজ্ঞানের সাথে রসায়নের সম্পর্ক: উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ (Photosynthesis) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তার সবুজ অংশে গ্লুকোজ তৈরি করে। সালোকসংশ্লেষণ মূলত একটি রাসায়নিক বিক্রিয়া। উদ্ভিদ পাতার সাহায্যে বাতাস থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং মূল দিয়ে পানি শোষণ করে। উদ্ভিদ সূর্যালোকের উপস্থিতিতে সবুজ পাতায় বতর্মান ক্লোরোফিলের সাহায্যে এই পানি আর কার্বন ডাই-অক্সাইডের মধ্যে রাসায়নিক সংযোগ ঘটিয়ে গ্লুকোজ উৎপন্ন করে। এছাড়া বিভিন্ন প্রাণী যে শর্করা বা প্রোটিন জাতীয় খাবার খায় শরীর সেই খাবার ভেঙে গ্লুকোজ, অ্যামাইনো এসিড ইত্যাদি উৎপন্ন করে। সমগ্র জীবদেহই রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে তৈরি। উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহের এ সব রাসায়নিক পদার্থ ও তাদের মধ্যে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়া জীববিজ্ঞানে আলোচনা করা হয়। তাই জীববিজ্ঞান ও রসায়ন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

পদার্থবিজ্ঞানের সাথে রসায়নের সম্পর্ক: পদার্থবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে রয়েছে চুম্বক, বিদ্যুৎ, বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ইত্যাদি। বিদ্যুতের জন্য যে ব্যাটারি ব্যবহার করা হয় তা রসায়নেরই অবদান। পেট্রোল, প্রাকৃতিক গ্যাস বা কয়লা পুড়িয়ে যে শক্তি উৎপন্ন হয় তা দিয়ে যানবাহন চলে, বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। রসায়নও আবার পদার্থবিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। ভৌত রসায়ন হলো রসায়নের একটি শাখা যার বিভিন্ন তত্ত্ব মূলত পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্ব এবং সূত্রের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। নিউক্লিয়ার ফিজিক্স এবং নিউক্লিয়ার কেমিস্ট্রি একই সূত্রে বাঁধা।

গণিতের সাথে রসায়নের সম্পর্ক: রসায়নের সাথে গণিতের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। রসায়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ করে গণনার কাজে গণিতের সাধারণ সূত্র থেকে জটিল সূত্র ব্যবহার করা হয়। যেমন- দ্রবণের ঘনমাত্রা নির্ণয়, যৌগের সংযুক্তি নির্ণয়, বিক্রিয়ার হার নির্ণয় ইত্যাদি।

এছাড়া বিজ্ঞানের আরও যে সব শাখা আছে তার প্রায় সব শাখার সাথেই রসায়নের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্পর্ক রয়েছে।

১.৪ রসায়ন পাঠের গুরুত্ব (The Importance of Studying Chemistry)

ধরো, তুমি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠলে। ঘুম থেকে উঠে ব্রাশে একটু পেস্ট লাগিয়ে দাঁত মাজলে। তারপর বই নিয়ে পড়তে বসলে। পড়ার সময় মা তোমাকে চা আর বিস্কুট দিলো। তুমি তা খেলে। খেয়ে গোসল করতে গেলে। গোসল করতে গিয়ে দেখলে তোমাদের বাথরুমটা একটু নোংরা হয়ে আছে। তাই তুমি টয়লেট ক্লিনার দিয়ে টয়লেট পরিষ্কার করলে। গোসল করার সময় ব্যবহার করলে সুগন্ধি সাবান আর শ্যাম্পু। গোসল শেষে গায়ে একটু লোশন মেখে নিলে। তারপর সকালের নাশতা সেরে স্কুলে গেলে। স্কুলে শিক্ষক চক দিয়ে বোর্ডে লিখে তোমাদের পড়া বুঝিয়ে দিলেন। লক্ষ করো, তুমি যে জিনিসগুলো ব্যবহার করেছ যেমন– পেস্ট, ব্রাশ, বিস্কুট, টয়লেট ক্লিনার, সাবান, শ্যাম্পু, লোশন কিংবা চক সবই রসায়নের অবদান।

শুধু কি তাই? জমিকে উর্বর করার জন্য তৈরি করা হয়েছে সার। খেতের ফসল যেন পোকা-মাকড়ে নষ্ট না করে তার জন্য মানুষ তৈরি করেছে কীটনাশক (insecticides)। খাদ্যকে দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করার জন্য তৈরি করেছে প্রিজারভেটিভস (preservatives) জাতীয় রাসায়নিক পদার্থ। অর্থাৎ চাষাবাদ কিংবা খাদ্যের জন্য আমরা রসায়নের উপর নির্ভর করি।

আজ কলেরা, টাইফয়েড, যক্ষ্মা ইত্যাদি মানুষের জন্য অতি সাধারণ চিকিৎসাযোগ্য রোগ, একসময় এ সকল রোগেই লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা গেছে। সাম্প্রতিককালে করোনার ভয়াবহতা থেকে আমরা মুক্তি পেয়েছি রসায়নের কল্যাণে। কীভাবে বলতে পার? রসায়নের জ্ঞান ব্যবহার করে মানুষ এ সকল রোগের ওষুধ সফলতার সাথে আবিষ্কার করেছে। এখন ওষুধের আবিষ্কার এমন পর্যায়ে চলে গেছে যে ক্যানসারের মতো মরণব্যাধি থেকেও মানুষ অনেক ক্ষেত্রে রক্ষা পাচ্ছে।

শিল্পকারখানা, যানবাহন, মানুষের ব্যবহার্য সামগ্রী থেকে সৃষ্ট প্রচুর পরিমাণে রাসায়নিক বর্জ্য আমাদের পরিবেশের ক্ষতিসাধন করছে। এর মাঝে রয়েছে কার্বন ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড, বিভিন্ন এসিড, বিভিন্ন ভারী ধাতু (যেমন– পারদ, লেড, আর্সেনিক, কোবাল্ট ইত্যাদি)সহ আরও অনেক ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য। এগুলো বায়ুর সাথে মিশে বায়ুদূষণ, পানির সাথে মিশে পানিদূষণ এবং অন্যান্য উপায়ে পরিবেশের ক্ষতিসাধন করেই চলেছে। এগুলো বিভিন্ন উদ্ভিদ বা মাছের শরীরে প্রবেশ করে তাদের ক্ষতিসাধন করছে। এসব মাছ এবং উদ্ভিদ আমরা খাদ্য হিসেবে খেয়ে পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি। বিভিন্ন ক্ষেত্রে অতিরিক্ত রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা আমাদের জন্য ক্ষতির কারণ। যেমন– ফসলের খেতে ক্ষতিকারক পোকা-মাকড় ধ্বংস করার কাজে কীটনাশক ব্যবহার করা হয়। কিন্তু তা প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যবহার করলে ঐ অতিরিক্ত কীটনাশক

বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে পুকুর, নদ-নদী, খাল-বিলের পানিতে গিয়ে পড়ে যা ঐ পানিকে দূষিত করে। এ সকল কীটনাশকের কোনো কোনোটির কিছু অংশ উদ্বায়ী হওয়ায় তা বাতাসের সাথে মিশে বাতাসকে দূষিত করে অর্থাৎ কীটনাশকের অতিরিক্ত ব্যবহার পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। রসায়ন পাঠ করলে এ রকম প্রাকৃতিক ও বাস্তব জীবনের অনেক কিছুই তোমরা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

সুতরাং বুঝতে পারছো রসায়ন একদিকে যেমন অনেক প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান জিনিস আবিষ্কার করছে, তেমনই তার অযৌক্তিক এবং অবিবেচকের মতো ব্যবহার পরিবেশেরও মারাত্মক ক্ষতিসাধন করছে। এখনো অনেক রোগের ওষুধ আবিষ্কার হয়নি। রসায়ন অধ্যয়ন ও গবেষণা করে সেসব ওষুধ আবিষ্কারের চেষ্টা করা এখন আমাদের দায়িত্ব। কাজেই তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো রসায়ন পাঠ করে একদিকে আমরা যেরকম মানবকল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয় অনেক নতুন জিনিস তৈরি করতে পারব, একই সাথে পরিবেশের জন্য কোনটি ক্ষতিকর সেটি বুঝতে পারব। আর তোমরা রসায়ন অধ্যয়ন করে এ পৃথিবীকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে। এটা তোমাদের কাছে সবার প্রত্যাশা।

১.৫ রসায়নে অনুসন্ধান বা গবেষণা প্রক্রিয়া (The Process of Research in Chemistry)

বিজ্ঞানের লক্ষ্য হলো মানবজাতির কল্যাণসাধন করা। এ উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানীরা নিরন্তর পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। বিজ্ঞানী নাম শুনতেই তোমাদের নিশ্চয়ই আইনস্টাইন, নিউটন, আর্কিমিডিস, ল্যাভয়সিয়ে, গ্যালিলিও এরকম মহান মনীষীর কথা মনে পড়ে যায়। হ্যাঁ, তাঁরা তো অবশ্যই মহান বিজ্ঞানী। তবে বিজ্ঞানী বলতে যা বোঝায় তাতে তোমরাও হতে পারো এক একজন বিজ্ঞানী। আসলে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পদ্ধতিগতভাবে যে সুসংবদ্ধ জ্ঞান অর্জন হয় সেই জ্ঞানই হলো বিজ্ঞান। আর এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে কোনো কিছু জানার চেষ্টাই হচ্ছে গবেষণা। যিনি এই গবেষণা করেন তিনিই বিজ্ঞানী।

কাজেই তুমিও যদি এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে জ্ঞান অন্বেষণ করো তাহলে তুমিও হতে পারবে একজন বিজ্ঞানী। সঠিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে অজানা কোনো কিছু জানার নামই গবেষণা। তাহলে তোমরা বুঝতে পারছো গবেষণার জন্য কিছু নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। রসায়ন গবেষণারও পদ্ধতি রয়েছে। এখন রসায়ন গবেষণার পদ্ধতি তোমাদের কাছে ধাপে ধাপে ব্যাখ্যা করা হবে।

গবেষণার জন্য প্রথমেই তোমাকে নির্ধারণ করতে হবে যে তুমি কী জানতে চাও বা কোন ধরনের নতুন পদার্থ তুমি আবিষ্কার করতে চাও। ধরা যাক, তুমি জানতে চাও অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডকে পানিতে দ্রবীভূত করলে তাপ উৎপাদিত হবে না শোষিত হবে? একে বলে বিষয় নির্বাচন।

তাহলে তোমাকে সবার আগে এই বিষয়ে কিছু বইপত্র পড়তে হবে অথবা এ ধরনের অন্য কোনো পরীক্ষা আগে করা হয়েছে এমন ধরনের গবেষণাপত্র ইন্টারনেট থেকে বা অন্য কোনোভাবে সংগ্রহ করে তা থেকে তোমার ফলাফল সম্পর্কে আগেই একটি অনুমান করে নিতে হবে। ধরো, তুমি কোনো বই বা গবেষণাপত্র থেকে জানতে পেলে ক্যালসিয়াম অক্সাইড পানিতে দ্রবীভূত হলে তাপ নির্গত হয়। তুমি এই গবেষণাপত্র থেকে আরো জানতে পেলে ক্যালসিয়াম অক্সাইড পানিতে দ্রবীভূত করার জন্য কী কী যন্ত্রপাতি, কোন কোন রাসায়নিক পদার্থ এবং কোন প্রণালি ব্যবহার করা হয়েছে। এ গবেষণা পত্র থেকে তুমি ধারণা পাবে, তোমার পরীক্ষাটি (অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডকে পানিতে দ্রবীভূত করা) করার জন্য তোমাকে কী কী যন্ত্রপাতি এবং কোন কোন রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করতে হবে এবং কোন প্রণালি অনুসরণ করতে হবে। ক্যালসিয়াম অক্সাইডের পরীক্ষা থেকে তুমি মনে করলে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডকে পানিতে দ্রবীভূত করলে তাপ উৎপন্ন হতে পারে। অর্থাৎ তুমি ফলাফল সম্পর্কে অনুমান করতে পারলে।

টেবিল ১.০৩: অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড পানিতে দ্রবীভূতকরণ

বিকারে দ্রবীভূত অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের পরিমাণ	দ্রবণের তাপমাত্রা
0 গ্রাম (দ্রবীভূত করা হয়নি)	25°C
5 গ্রাম	20°C
10 গ্রাম	15°C
15 গ্রাম	10°C

ক্যালসিয়াম অক্সাইডের পরীক্ষা থেকে তুমি ধারণা পেয়েছ যে তোমার এ পরীক্ষাটি করতে বিকার, পানি, অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড, থার্মোমিটার, কাচের তৈরি রড, ব্যালেন্স (নিক্তি) ইত্যাদি জিনিস লাগবে। পরীক্ষাটি সম্পন্ন করার জন্য প্রথমে বিকারে পানি নিতে হবে। এরপর থার্মোমিটার দিয়ে পানির তাপমাত্রা মেপে নিতে হবে। তারপর সঠিকভাবে ওজন করে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড বিকারের পানিতে যোগ করতে হবে এবং কাচের রড দিয়ে সেটুকুকে নেড়ে দ্রবীভূত করতে হবে। এ সময়ের মধ্যে বারবার থার্মোমিটারের সাহায্যে পানির তাপমাত্রা দেখে নিতে হবে। এভাবে তোমাকে পরীক্ষাটি সম্পন্ন করতে হবে। এবার শুরু হবে তোমার পরীক্ষণ।

তোমার পরীক্ষা সম্পন্ন করার জন্য একটি বিকারে 250 মিলি পানি নিয়ে এর তাপমাত্রা থার্মোমিটারে মেপে নাও। ধরো, এর তাপমাত্রা 25°C। তুমি এটি তোমার খাতায় লিখে রাখো। এবার ব্যালেন্সের সাহায্যে 5 গ্রাম অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড মেপে নিয়ে বিকারের পানিতে দাও। কাচদণ্ড দিয়ে নেড়ে নেড়ে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডটুকু দ্রবীভূত করো। দ্রবীভূত হবার সঙ্গে সঙ্গে থার্মোমিটার দিয়ে আবার তাপমাত্রা মাপ। ধরো, এবার তাপমাত্রা 20°C হলো। ব্যালেন্সের সাহায্যে আবার 5 গ্রাম অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড বিকারের দ্রবণে একইভাবে দ্রবীভূত করো। এতে বিকারের দ্রবণে মোট অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড হলো 10 গ্রাম। এভাবে বিকারের দ্রবণে আরো 5 গ্রাম অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড দ্রবীভূত করো। তৃতীয়বারে বিকারে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের পরিমাণ হলো 15 গ্রাম এবং ধরো এবারে দ্রবণের

তাপমাত্রা হলো 10°C। প্রতিটি ধাপে প্রাপ্ত তথ্য (Data) খাতায় লিখে রাখো এবং প্রাপ্ত তথ্যগুলো বিশ্লেষণের জন্য একটি তালিকায় লিপিবদ্ধ করো। তথ্যগুলো কেমন হতে পারে সেটি ১.০৩ টেবিলে দেখানো হলো।

১.০৩ নং টেবিলের তথ্যগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাবে দ্রবণে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড যত বেশি পরিমাণে দ্রবীভূত হচ্ছে দ্রবণের তাপমাত্রা তত কমে যাচ্ছে। এ থেকে তুমি সিদ্ধান্ত নিতে পার, যেহেতু পানিতে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড দ্রবীভূত করলে দ্রবণের তাপমাত্রা হ্রাস পাচ্ছে, তাই এখানে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড পানি থেকে তাপ শোষণ করে দ্রবীভূত হচ্ছে। অর্থাৎ ফলাফল (Result) এই যে, অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড পানিতে দ্রবীভূত করলে তাপ শোষিত হয়। উপরের পরীক্ষা সম্পন্ন করতে তুমি যে সকল ধাপ অনুসরণ করলে সেগুলোকে ফ্লো চার্ট (Flow Chart) বা প্রবাহমান তালিকার মাধ্যমে নিম্নরূপে দেখানো যায়।

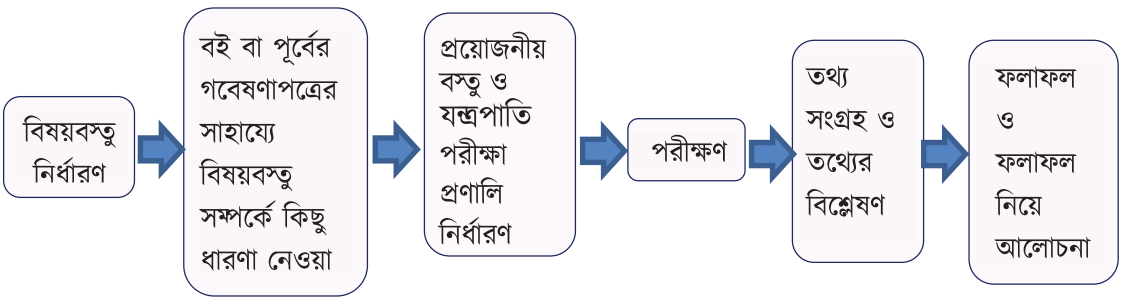

চিত্র ১.০২: রসায়নে অনুসন্ধান বা গবেষণা প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপ

রসায়নের পরীক্ষা বা গবেষণার জন্য সাধারণত উপরের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হয়।

১.৬ রসায়ন পরীক্ষাগার ব্যবহারে ও পরীক্ষাগারে ব্যবহৃত বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারে সতর্কতা গ্রহণ (Safety Measures in Chemistry Laboratory and in Use of Chemicals)

সাধারণত যে ঘরে বা স্থানে বিজ্ঞানের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং গবেষণা করা হয় তাকে পরীক্ষাগার বা গবেষণাগার (Laboratory) বলে। তাই যে ঘরে বা স্থানে রসায়নের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণা করা হয় তাকে রসায়ন পরীক্ষাগার বা রসায়ন গবেষণাগার (Chemistry Laboratory) বলে। বুঝতেই পারছ রসায়ন গবেষণাগারে থাকবে বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য। অনেক রাসায়নিক দ্রব্যই আমাদের জন্য অথবা পরিবেশের জন্য কম-বেশি ক্ষতিকর। কোনো রাসায়নিক দ্রব্য বিস্ফোরক জাতীয়, কোনোটি

দাহ্য (সহজেই যাতে আগুন ধরে যায়), কোনোটি আমাদের শরীরের সরাসরি ক্ষতি করে আবার কোনোটি পরিবেশের ক্ষতি করে। রসায়ন পরীক্ষাগারে যে যন্ত্রপাতি বা পাত্র ব্যবহার করা হয় তার বেশির ভাগই কাচের তৈরি। তাই এ রসায়ন পরীক্ষাগারে ঢোকা থেকে শুরু করে বের হওয়া পর্যন্ত প্রতিটি পদক্ষেপে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে হয়। একটু অসতর্ক হলেই যেকোনো ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। যেমন– এসিড গায়ে পড়লে শরীরে ক্ষতের সৃষ্টি হতে পারে। পোশাকে পড়লে পোশাকটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এছাড়া রসায়ন গবেষণাগারে অগ্নিকান্ড ও বিস্ফোরণসহ নানা ধরনের ছোট-বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাই শরীরকে রক্ষা করতে পরতে হবে নিরাপদ পোশাক বা অ্যাপ্রোন (apron)। রসায়ন গবেষণাগারে ব্যবহৃত অ্যাপ্রোনের হাতা হবে হাতের কবজি পর্যন্ত আর লম্বায় হাঁটুর নিচ পর্যন্ত। এটি সাধারণত সাদা রঙের হয়। হাতের সুরক্ষার জন্য ব্যবহার করতে হয় হ্যান্ড গ্লাভস। চোখকে রক্ষা করার জন্য ব্যবহার করতে হয় সেফটি গগলস ইত্যাদি।

রসায়ন পরীক্ষাগারে নিজের সেফটির (Safety) জন্য ব্যবহার করতে হয় এরকম কয়েকটি জিনিসের ছবি নিচে দেওয়া হলো।

চিত্র ১.০৩: অ্যাপ্রোন, সেফটি গগলস, হ্যান্ড গ্লাভস এবং মাস্ক

একটি রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারের আগেই জেনে নিতে হবে রাসায়নিক দ্রব্যটি কোন প্রকৃতির। সেটি কি বিস্ফোরক অথবা দাহ্য নাকি তেজস্ক্রিয়? সেটি বোঝানোর জন্য রাসায়নিক পদার্থের বোতল বা কৌটার লেবেলে এক ধরনের সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচী এ সংক্রান্ত একটি সর্বজনীন নিয়ম প্রবর্তন করে যা 'গ্লোবালি হারমোনাইজড সিস্টেম' (Globally Harmonized System) নামে পরিচিত। গ্লোবালি হারমোনাইজড সিস্টেম-এ বিভিন্ন পদার্থের ঝুঁকি ও ঝুকির মাত্রা বোঝানোর জন্য সুনির্দিষ্ট পিকটোগ্রাম বা সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়।

নিচের তালিকায় এ ধরনের কিছু সাংকেতিক চিহ্ন, সাংকেতিক চিহ্নবিশিষ্ট পদার্থ এবং সেগুলো ব্যবহারে ঝুঁকি, ঝুঁকির মাত্রা ও কী সাবধানতা নিতে হয় তা উল্লেখ করা হলো।

২০২৩

টেবিল ১.০৪: সাংকেতিক চিহ্ন ও সাংকেতিক চিহ্নবিশিষ্ট পদার্থের ঝুঁকি

সাংকেতিক চিহ্ন	ব্যবহারে ঝুঁকি, ঝুঁকির মাত্রা ও সাবধানতা
বিস্ফোরক পদার্থ (Explosive substance)	এ চিহ্নবিশিষ্ট পদার্থ থেকে খুব সাবধান থাকতে হবে। এসব পদার্থ ব্যবহারের সময় মনে রাখতে হবে এসব পদার্থে আগুন লাগলে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হতে পারে, যার জন্য শরীরের এবং গবেষণাগারের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। তাই এ দ্রব্যগুলো খুব সাবধানে নাড়াচাড়া করতে হয়। টিএনটি, পার-অক্সাইড, নাইট্রোগ্লিসারিন ইত্যাদি এ ধরনের বিস্ফোরক পদার্থ।
দাহ্য পদার্থ (Flammable substance)	অ্যালকোহল, ইথার ইত্যাদি দাহ্য পদার্থ। এসব পদার্থে দ্রুত আগুন ধরে যেতে পারে। তাই এদের আগুন বা তাপ থেকে সব সময় দূরে রাখতে হবে।
বিষাক্ত পদার্থ (Toxic substance)	এ চিহ্নধারী পদার্থ বিষাক্ত প্রকৃতির। তাই শরীরে লাগলে বা শ্বাস-প্রশ্বাস অথবা ক্ষতের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করলে শরীরের নানা ধরনের ক্ষতি হতে পারে। বেনজিন, ক্লোরোবেনজিন, মিথানল এ ধরনের পদার্থ। এ ধরনের পদার্থ ব্যবহারের সময় অ্যাপ্রোন, হ্যান্ড গ্লাভস, সেফটি গগলস, মাস্ক ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে।
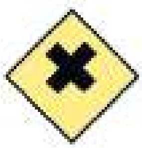 উত্তেজক পদার্থ (Irritant substance)	ডাস্ট, লঘু এসিড, ক্ষার, নাইট্রাস অক্সাইড ইত্যাদি উত্তেজক পদার্থ। এগুলো ত্বক, চোখ, শ্বাসতন্ত্র ইত্যাদির ক্ষতি করে। তাই এ ধরনের পদার্থ ব্যবহারের সময় অ্যাপ্রোন, হ্যান্ড গ্লাভস, সেফটি গগলস ব্যবহার করতে হবে।
স্বাস্থ্য ঝুঁকিপূর্ণ পদার্থ (Health risk substance)	এ ধরনের পদার্থ ত্বকে লাগলে বা শ্বাসপ্রশ্বাসের সাথে শরীরের ভেতরে গেলে তা শরীরের স্বল্পমেয়াদি বা দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতিসাধন করে। এগুলো শরীরে প্রবেশ করলে ক্যানসারের মতো কঠিন রোগ কিংবা শ্বাসতন্ত্রের ক্ষতি হতে পারে। বেনজিন, টলুইন, জাইলিন ইত্যাদি এ ধরনের পদার্থ। তাই এগুলোকে সতর্কভাবে রাখতে হবে এবং ব্যবহারের সময় অ্যাপ্রোন, হ্যান্ড গ্লাভস, সেফটি গগলস ও মাস্ক পরে নিতে হবে।

তেজস্ক্রিয় পদার্থ (Radioactive substance)	এসব পদার্থ থেকে ক্ষতিকারক রশ্মি বের হয় যা ক্যানসারের মতো মরণব্যাধি সৃষ্টি করতে পারে কিংবা একজনকে বিকলাঙ্গ করে দিতে পারে। তাই এসব পদার্থ ব্যবহারের সময় বিশেষ সতর্ক থাকা প্রয়োজন। ইউরেনিয়াম, রেডিয়াম ইত্যাদি তেজস্ক্রিয় পদার্থ।
পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর (Dangerous for environment)	এ পদার্থগুলো পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। এ ধরনের পদার্থের উদাহরণ হলো লেড, মার্কারি ইত্যাদি। তাই এগুলোকে ব্যবহার করার সময় যথেষ্ট সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। ব্যবহারের পরে এগুলো যেখানে-সেখানে না ফেলে একটি নির্দিষ্ট স্থানে রাখতে হবে। এসব পদার্থকে যথাসম্ভব পুনরুদ্ধার করে আবার ব্যবহার করার চেষ্টা করতে হবে। তাহলে এগুলো সহজে পরিবেশে ছড়িয়ে পড়তে পারবে না।
ক্ষত সৃষ্টিকারী (Corrosive)	এ পদার্থগুলো শরীরে লাগলে শরীরে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে গ্রহণ করলে তা শরীরের ভেতরের অঙ্গেরও ক্ষতিসাধন করতে পারে। হাইড্রোক্লোরিক এসিড, সালফিউরিক এসিড, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের ঘন দ্রবণ এ জাতীয় পদার্থের উদাহরণ।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. তেজস্ক্রিয় মৌল কোনটি?

(ক) রেডিয়াম (খ) সিলভার

(গ) কপার (ঘ) জিংক

২. নিচের সাংকেতিক চিহ্নটি কী প্রকাশ করে?

(ক) বিস্ফোরক পদার্থ (খ) দাহ্য পদার্থ

(গ) তেজস্ক্রিয় রশ্মি (ঘ) আগুনের শিখা

৩. কোন চিহ্নটি তেজস্ক্রিয় রশ্মি নির্দেশ করে?

(ক) (খ) 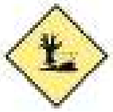

(গ) (ঘ) 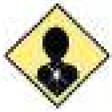

৪. কপারের সাথে অন্য কোন ধাতুকে গলিয়ে ব্রোঞ্জ তৈরি করা হয়?

(ক) লোহা (খ) জিংক
(গ) টিন (ঘ) লেড

৫. **রসায়নের গবেষণা প্রক্রিয়ায়-**

i) পঞ্চম ধাপে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়
ii) চতুর্থ ধাপে পরীক্ষণ করা হয়
iii) প্রথম ধাপে বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.

A

B

চিত্র A: ওষুধ সেবনের ছবি **চিত্র B:** সবজিক্ষেতে কীটনাশক ছিটানোর ছবি

(ক) গবেষণা কী?
(খ) পাকা আম খেতে মিষ্টি লাগে কেন?
(গ) উদ্দীপকের A নং চিত্রে রসায়ন কীভাবে সম্পর্কিত—ব্যাখ্যা করো।
(ঘ) উদ্দীপকের কোনটির অতিরিক্ত ব্যবহার পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর— যুক্তিসহ লেখো।

২.

দৃশ্যকল্প-১: সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া

দৃশ্যকল্প-২: সবজিক্ষেতে কীটনাশক ছিটানো হচ্ছে

(ক) রসায়ন গবেষণা প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় ধাপটি কী?

(খ) পেটের এসিডিটি সমস্যা কীভাবে দূর করা হয়? ব্যাখ্যা করো।

(গ) দৃশ্যকল্প-১ কীভাবে রসায়নকে জীববিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত করেছে? ব্যাখ্যা করো।

(ঘ) দৃশ্যকল্প-২ 'খাদ্য উৎপাদনে সহায়ক হলেও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর' যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করো।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. কাগজ তৈরিতে আখের ছোবড়া ব্যবহার করা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো।

২. রাসায়নিক পদার্থের বোতল বা কৌটার লেবেলে গ্লোবালি হারমোনাইজড সিস্টেম এর সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো।

দ্বিতীয় অধ্যায়
পদার্থের অবস্থা
(States of Matter)

পদার্থের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো– এগুলোর ভর আছে এবং এরা স্থান দখল করে। যেমন– চেয়ার, টেবিল, খাতা, কলম, বরফ, পানি, বাতাস ইত্যাদি। একটি পদার্থ কঠিন, তরল ও গ্যাসীয়–এ তিন অবস্থাতেই থাকতে পারে। এ তিন অবস্থাতেই প্রত্যেক পদার্থের নিজস্ব কিছু ধর্ম ও বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এ বিষয়গুলোই এ অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- কণার গতিতত্ত্বের সাহায্যে পদার্থের ভৌত অবস্থা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- কণার গতিতত্ত্বের সাহায্যে ব্যাপন ও নিঃসরণ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পদার্থের ভৌত অবস্থা ও তাপের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারব।
- তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে ব্যাপন হার বৃদ্ধি পরীক্ষার মাধ্যমে দেখাতে পারব।
- কঠিন পদার্থের গলন ও ঊর্ধ্বপাতন এবং তরল পদার্থের স্ফুটন প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারব।
- কঠিন পদার্থের গলন ও ঊর্ধ্বপাতন এবং তরল পদার্থের স্ফুটন প্রক্রিয়া পরীক্ষার মাধ্যমে দেখাতে পারব।
- প্রকৃতিতে সংঘটিত বাস্তব ঘটনা রসায়নের দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করতে পারব।
- রাসায়নিক দ্রব্য ও থার্মোমিটার সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারব।

২.১ পদার্থ ও পদার্থের অবস্থা (Matter and States of Matter)

যে বস্তুর নির্দিষ্ট ভর আছে এবং জায়গা দখল করে তাকে পদার্থ বলে। কক্ষ তাপমাত্রায় কোনো কোনো পদার্থ কঠিন, কোনো কোনো পদার্থ তরল আবার কোনো কোনো পদার্থ গ্যাসীয় অবস্থায় থাকে। যেমন– কক্ষ তাপমাত্রায় চিনি, খাদ্য লবণ, মার্বেল ইত্যাদি কঠিন অবস্থায়; পানি, তেল, কেরোসিন ইত্যাদি তরল অবস্থায় এবং নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি গ্যাসীয় অবস্থায় থাকে। তাপমাত্রা পরিবর্তন করে একই পদার্থকে কঠিন, তরল এবং গ্যাসীয় অবস্থায় রূপান্তর করা যায়। নিচে কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের কিছু ধর্ম এবং বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হলো।

২.১.১ কঠিন পদার্থ (Solids)

কঠিন পদার্থের নির্দিষ্ট ভর, নির্দিষ্ট আকার এবং নির্দিষ্ট আয়তন থাকে। সব পদার্থের কণাগুলোর মধ্যেই এক ধরনের আকর্ষণ বল থাকে। একে আন্তঃকণা আকর্ষণ বল বলা হয়। কঠিন পদার্থের কণাগুলোর মধ্যে আন্তঃকণা আকর্ষণ বল সবচেয়ে বেশি। এ কারণে কঠিন পদার্থের কণাগুলো খুব কাছাকাছি এবং নির্দিষ্ট অবস্থানে থাকে, ফলে কঠিন পদার্থের নির্দিষ্ট আকার হয়। কঠিন পদার্থের উপর চাপ প্রয়োগ করলে এরা সংকুচিত হয় না। আবার, তাপমাত্রা বাড়ালে কঠিন পদার্থের আয়তন খুবই কম পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। কঠিন পদার্থের কণাগুলো চলাচল বা স্থান ত্যাগ করতে পারেনা। তবে নিজস্ব স্থানে কম্পন সৃষ্টি করতে পারে।

২.১.২ তরল পদার্থ (Liquids)

তরল পদার্থের নির্দিষ্ট ভর ও নির্দিষ্ট আয়তন আছে কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো আকার নেই। তরল পদার্থকে যে পাত্রে রাখা হয় সেই পাত্রের আকার ধারণ করে। তরল পদার্থের কণাগুলো কঠিন পদার্থের কণাগুলোর চেয়ে তুলনামূলকভাবে বেশি দূরত্বে থাকায় এদের মধ্যে আন্তঃকণা আকর্ষণ বল কঠিন পদার্থের চেয়ে কম হয়। তরল পদার্থে চাপ প্রয়োগ করলে আয়তন হ্রাস পায় না। তবে তাপ প্রয়োগ করলে তরল পদার্থের আয়তন বৃদ্ধি পায়। এই আয়তন বৃদ্ধির পরিমাণ কঠিন পদার্থের চেয়ে বেশি।

২.১.৩ গ্যাসীয় বা বায়বীয় পদার্থ (Gases)

গ্যাসীয় পদার্থের নিদিষ্ট ভর আছে কিন্তু নির্দিষ্ট আকার বা আয়তন নেই। যেকোনো পরিমাণ গ্যাসীয় পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন আয়তনের পাত্রে রাখলে পদার্থটি ধারক পাত্রের পুরো আয়তন দখল করে। গ্যাসীয় পদার্থের কণাগুলো কঠিন ও তরল পদাথের্র চেয়ে অনেক বেশি দূরে দূরে অবস্থান করে। তাই এদের আন্তঃকণা

আকর্ষণ বল খুবই কম। চাপ প্রয়োগ করলে গ্যাসীয় পদার্থের আয়তন অনেক কমে যায়। আবার, তাপ প্রয়োগ করলে গ্যাসীয় পদার্থের আয়তন অনেক বেড়ে যায়।

২.২ কণার গতিতত্ত্ব (Kinetic Theory of Particles)

সকল পদার্থই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা দ্বারা গঠিত। এই কণাগুলো একে অপরকে আকর্ষণ করে যাকে আন্তঃকণা আকর্ষণ শক্তি বলে। আবার কণাগুলোর গতিশক্তিও রয়েছে। আন্তঃকণা আকর্ষণ শক্তি এবং কণাগুলোর গতিশক্তি দিয়ে পদার্থের কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় অবস্থা ব্যাখ্যা করার তত্ত্বকেই কণার গতিতত্ত্ব বলা হয়। যখন কোনো পদার্থের আন্তঃকণা আকর্ষণ শক্তি খুব বেশি থাকে তখন কণাগুলো খুব কাছাকাছি অবস্থান করে এবং নিজেদের অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে না। এই অবস্থা হলো পদার্থটির কঠিন

চিত্র ২.০১: কণার গতিতত্ত্ব

অবস্থা। কঠিন পদার্থে তাপ দেওয়া হলে পদার্থের কণাগুলো তাপশক্তি গ্রহণ করে কাঁপতে থাকে। ফলে আন্তঃকণা আকর্ষণ শক্তি কমে যায় এবং কণাগুলো কিছুটা গতিশক্তি প্রাপ্ত হয়। পদার্থের এই অবস্থাকে তরল অবস্থা বলে। তরল পদার্থের নির্দিষ্ট আয়তন থাকলেও নির্দিষ্ট আকার থাকে না। তরল অবস্থায় পদার্থে আরো বেশি তাপ দেওয়া হলে কণাগুলো তাপশক্তি নিয়ে গতিশক্তি বৃদ্ধি করতে থাকে এবং এক সময় গতিশক্তি এত বেড়ে যায় যে কণাগুলো আন্তঃকণা আকর্ষণ শক্তি থেকে প্রায় মুক্ত হয়ে বিক্ষিপ্তভাবে ছুটতে থাকে। পদার্থের এই অবস্থাকে গ্যাসীয় অবস্থা বলে। গ্যাসীয় অবস্থায় পদার্থের কোনো নির্দিষ্ট আয়তন থাকে না। তাকে যে আয়তনের পাত্রে রাখা হবে কণাগুলো সেই আয়তনেই ছোটাছুটি করতে থাকে। এজন্য গ্যাসীয় পদার্থের নির্দিষ্ট কোনো আয়তন নাই। যে পাত্রে রাখা হয় সে পাত্রের আয়তনই গ্যাসের আয়তন এতে পরিমাণ যাই হোক না কেন। গ্যাসীয় অবস্থায় পৌঁছানোর পর যদি আরও তাপ দেওয়া হয় তখন কণাগুলো আরও জোরে ছুটতে থাকবে অর্থাৎ গতিশক্তি আরও বেড়ে যাবে।

২.৩ ব্যাপন (Diffusion)

কঠিন, তরল ও বায়বীয় মাধ্যমে কোন পদার্থের কণাসমূহের স্বতঃস্ফূর্ত ও সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ার প্রক্রিয়াকে ব্যাপন বলে। ব্যাপন প্রক্রিয়ায় কণাসমূহ উচ্চ ঘনমাত্রার স্থান থেকে নিম্ন ঘনমাত্রার স্থানের দিকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ছড়িয়ে পড়ে। যেমন- ঘরের এক কোণে কোনো একটি সুগন্ধির শিশির মুখ খুলে রাখলে কিছুক্ষণের মধ্যে সারা ঘরে সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। এটি ব্যাপন প্রক্রিয়ার উদাহরণ। যে মাধ্যমে কণাগুলি ছড়িয়ে পড়তে কম সময় লাগে, সে মাধ্যমে ব্যাপন হার বেশি এবং যে মাধ্যমে কণাগুলি ছড়িয়ে পড়তে বেশি সময় লাগে, সে মাধ্যমে ব্যাপন হার কম। যেমন বায়বীয় মাধ্যমে ব্যাপন হার তরল মাধ্যম হতে বেশি। একইভাবে তরল মাধ্যমে ব্যাপনের হার কঠিন মাধ্যম হতে বেশি। আবার একই মাধ্যমে যে পদার্থের আণবিক ভর বেশি সে পদার্থের কণাগুলির ব্যাপনের হার কম হবে।

নিচের পরীক্ষাগুলোর মাধ্যমে এ বিষয়ে আরও পরিষ্কার ধারণা নিতে পারবে।

একক কাজ

পরীক্ষা নং: ১

কক্ষ তাপমাত্রায় একটি কাচের পাত্রে কিছু বিশুদ্ধ পানি নাও। এ পানিতে সামান্য গোলাপি বর্ণের কঠিন পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ($KMnO_4$) ছেড়ে দাও। লক্ষ করো? কিছুক্ষণ পর দেখবে $KMnO_4$ এর দানাগুলো দ্রবীভূত হয়ে গোলাপি দ্রবণে পরিণত হচ্ছে এবং পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের কণাগুলো পানির মধ্যে এদিক-সেদিক ছড়িয়ে পড়ছে। ফলে কিছু সময় পর দেখা যাবে পুরো পাত্রেই গোলাপি রং ছড়িয়ে পড়েছে। এক্ষেত্রে পানিতে তথা তরল মাধ্যমে $KMnO_4$ এর কণা ব্যাপিত হয়েছে। এ ব্যাপন সংঘটিত হতে কয়েক মিনিট থেকে প্রায় ঘণ্টা খানেক সময় লাগতে পারে। তবে এক্ষেত্রে তাপ প্রয়োগ করা হলে ব্যাপন হার বৃদ্ধি পায়।

যেমন-গরম পানিতে $KMnO_4$ এর ব্যাপনের পরীক্ষাটি সম্পন্ন করা হলে দেখা যাবে ঠান্ডা পানির চেয়ে গরম পানিতে $KMnO_4$ কণাগুলো দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র পানিকে গোলাপি বর্ণে পরিণত করছে।

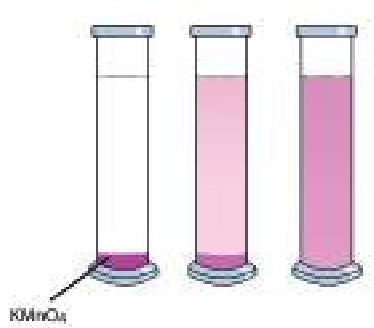

চিত্র ২.০২: পানিতে $KMnO_4$ এর ব্যাপন

একক কাজ

পরীক্ষা নং: ২

কক্ষ তাপমাত্রায় একটি বিকারে কিছু পরিমাণ বিশুদ্ধ পানি নিয়ে এতে সামান্য পরিমাণ তরল নীলের দ্রবণ যোগ করো। কিছুক্ষণের মধ্যে দেখবে বিকারের সমস্ত পানি নীল রং ধারণ করেছে। অর্থাৎ নীলের দ্রবণের কণাগুলো সমস্ত পানিতে ছড়িয়ে পড়েছে। এক্ষেত্রে পানিতে তরল পদার্থ (নীলের দ্রবণ) ব্যাপিত হয়েছে। কক্ষ তাপমাত্রায় কঠিন $KMnO_4$-এর ব্যাপনের চেয়ে তরল নীলের দ্রবণের ব্যাপনের সময় অনেক কম লেগেছে। অর্থাৎ তরল মাধ্যমে কঠিন পদার্থের ব্যাপন হার-এর চেয়ে তরল মাধ্যমে তরল পদার্থের ব্যাপন হার বেশি। তাপের প্রভাবে এই ব্যাপন হার আরও বেশি হয়।

কঠিন এবং তরল পদার্থের ন্যায় গ্যাসীয় পদার্থ তরল মাধ্যমে ব্যাপিত হয়। তবে একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় তরল মাধ্যমে কঠিন এবং তরল পদার্থের চেয়ে গ্যাসীয় পদার্থের ব্যাপন হার বেশি।

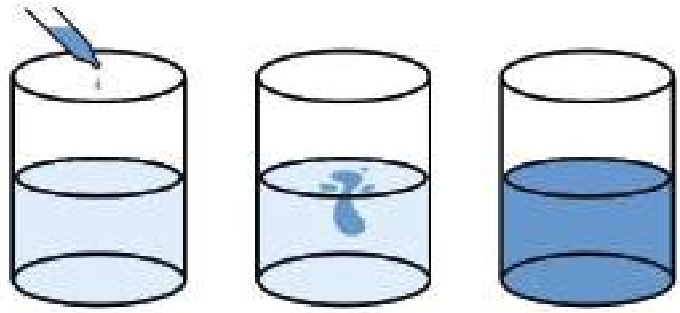

চিত্র ২.০৩: তরল (পানি) মাধ্যমে তরল পদার্থ (নীলের দ্রবণ)

একক কাজ

পরীক্ষা নং: ৩

দুটি গ্যাসের ব্যাপন হার

এই পরীক্ষার জন্য দুই মুখ খোলা একটি লম্বা কাচনল ও দুই খণ্ড তুলা নাও। এক খণ্ড তুলাকে ঘন হাইড্রোক্লোরিক এসিড (HCl) দ্রবণে ভিজাও এবং অপর খণ্ড তুলাকে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড (NH_4OH) দ্রবণে ভিজাও। এবার ঐ লম্বা কাচনলটির এক মুখে

২০২৫

হাইড্রোক্লোরিক এসিড দ্রবণে সিক্ত তুলা এবং অপর মুখে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্রবণে সিক্ত তুলা দিয়ে বন্ধ করো। এখানে হাইড্রোক্লোরিক এসিড দ্রবণ থেকে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস এবং অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্রবণ থেকে অ্যামোনিয়া (NH_3) গ্যাস টিউবের ভিতরের বাতাসের মধ্য দিয়ে ব্যাপিত হবে। বাতাস একটি বায়বীয় বা গ্যাসীয় মাধ্যম।

কিছুক্ষণের মধ্যে দেখতে পাবে কাচনলের ভিতরে একটি নির্দিষ্ট স্থানে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস ও অ্যামোনিয়া গ্যাস পরস্পরের সাথে বিক্রিয়া করে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের (NH_4Cl) সাদা ধোঁয়ার সৃষ্টি করেছে। এ সাদা ধোঁয়া তৈরিতে এক মিনিটেরও কম সময় লাগে। সাদা ধোঁয়ার অবস্থান কাচনলের ঠিক মাঝামাঝি হবে না। এটি হাইড্রোক্লোরিক এসিড দ্রবণের কাছে এবং অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্রবণ থেকে দূরে অবস্থান করবে। অর্থাৎ একই সময়ে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস কম দূরত্ব এবং অ্যামোনিয়া গ্যাস বেশি দূরত্ব অতিক্রম করেছে। এ পরীক্ষা থেকে বোঝা যায় যে, অ্যামোনিয়া গ্যাস হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস থেকে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে বা বেশি দূরত্ব অতিক্রম করে অর্থাৎ অ্যামোনিয়া গ্যাসের ব্যাপন হার হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাসের ব্যাপন হারের চেয়ে বেশি। এর কারণ মূলত এদের আণবিক ভর। যে গ্যাসের আণবিক ভর যত কম তার ব্যাপন হার তত বেশি। এখানে অ্যামোনিয়া গ্যাসের আণবিক ভর (17) হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাসের আণবিক ভর (36.5) এর চেয়ে কম। তাই NH_3 গ্যাস HCl গ্যাসের চেয়ে দ্রুত ব্যাপিত হয়েছে অর্থাৎ বেশি দূরত্ব অতিক্রম করেছে। H_2, He, N_2, O_2 এবং CO_2 গ্যাসগুলোর আণবিক ভর যথাক্রমে 2, 4, 28, 32 এবং 44। এই গ্যাসগুলোর মধ্যে H_2 এর আণবিক ভর সবচেয়ে কম।

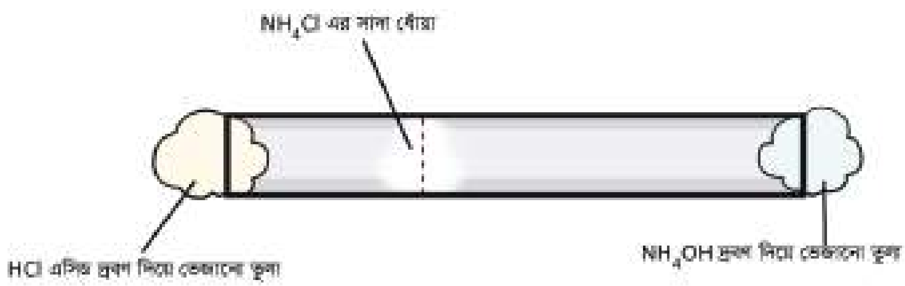

চিত্র ২.০৪: দুটি গ্যাসের ব্যাপন

তাই H_2 এর ব্যাপন হার সবচেয়ে বেশি হবে এবং CO_2 এর আণবিক ভর সবচেয়ে বেশি, কাজেই CO_2 এর ব্যাপন হার সবচেয়ে কম হবে। আমরা দেখলাম তরল মাধ্যম থেকে বায়বীয় মাধ্যমে পদার্থের ব্যাপনের হার বেশি যা ৫০ থেকে ১০০ গুণ পর্যন্ত হতে পারে।

২০২৫

২.৪ নিঃসরণ (Effusion)

নিঃসরণ হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে গ্যাসের কণাগুলো খুব ছোট একটি ছিদ্র দিয়ে পারস্পরিক সংঘর্ষ ছাড়াই একে একে বের হয়ে যায়। যেমন বেলুনের ছোট ছিদ্র দিয়ে গ্যাস নির্গমন। বেলুনে যদি অতি ক্ষুদ্র বা মাইক্রোস্কোপিক ছিদ্র থাকে, তাহলে কিছু সময় পর সেটি ধীরে ধীরে হাওয়া ছেড়ে সঙ্কুচিত হয়ে যায়। এটি হয় কারণ গ্যাসের কণাগুলো একটি একটি করে সেই ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। এই ধরণের ধীর গ্যাস নির্গমনকে নিঃসরণ (Effusion) বলা হয়।

এছাড়া যদি কোনো টায়ার খুব ছোট একটি ছিদ্র থাকে, তবে সেই ছিদ্র দিয়ে গ্যাস ধীরে ধীরে কণার আকারে বের হয়ে যায়। এটি জোরে বের হওয়া বা হঠাৎ বিস্ফোরণের মতো নয়। এই ধরণের ধীর গতিতে ও ধাপে ধাপে নির্গমনই নিঃসরণ বা Effusion।

নিঃসরণের ব্যবহারিক প্রয়োগ (Practical Uses of Effusion)

গ্যাস সিলিন্ডার ও পাইপলাইনে লিক শনাক্তকরণ

গ্যাস সিলিন্ডার বা পাইপলাইনে ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়ে ধীরে ধীরে গ্যাস নির্গমন হলে তা নিঃসরণের মাধ্যমে ঘটে। এই ধীর গ্যাস নির্গমন পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে লিক বা ত্রুটি শনাক্ত করা যায়। সাবান পানি দিয়ে এল পি জি সিলিন্ডার এর ভাল্‌ভ ও লাইনে নিয়মিত লিক টেস্ট করা যায়। যেমন গ্যাস সিলিন্ডার বা পাইপলাইন সাবান পানিতে ঢেকে ফেলা হয়। যদি ছোট ছোট বুদবুদের মতো কিছু দেখা যায়, তাহলে বুঝা যায় সিলিন্ডারে বা পাইপলাইনে ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে যা দিয়ে effusion হচ্ছে।

সাবান পানি ব্যবহার করে লিক টেস্ট

গ্যাসের মোলার ভর নির্ণয়

দুটি অজানা গ্যাসের effusion হার নিণয় করে গবেষকরা তাদের মোলার ভরের তুলনা করেন। হালকা গ্যাস দ্রুত বের হয়, ভারী গ্যাস ধীরে, আর এভাবেই জানা যায় কোন গ্যাস কতটা ভারী।

২.৫ মোমবাতির প্রজ্বলন এবং মোমের তিন অবস্থা (Burning of a Candle and the Three States of Wax)

চিত্র ২.০৫: মোমবাতির জ্বলন

মোম হলো বিভিন্ন হাইড্রোকার্বনের মিশ্রণ। হাইড্রোজেন এবং কার্বন মিলে গঠিত জৈব যৌগই হলো হাইড্রোকার্বন। মোমের প্রজ্বলনে আমরা মোমের কঠিন, তরল এবং গ্যাসীয় এই তিনটি অবস্থাই দেখতে পাই। মোমবাতিতে মোমের মধ্যে একটি সুতা থাকে। এ সুতাতে আগুন জ্বালালে সুতার চারদিকে হাইড্রোকার্বন অণুগুলো তাপে গলে তরলে পরিণত হয়। অর্থাৎ কঠিন অবস্থা থেকে তরল অবস্থায় পরিণত হয়।

ঐ তরল মোম আগুনের তাপে প্রথমে বাষ্পে পরিণত হয়। অতপর ঐ বাষ্পীয় মোম বাতাসের অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে কার্বন ডাই-অক্সাইড, জলীয় বাষ্প, আলো এবং তাপ উৎপন্ন করে। তরল মোমের কিছু অংশ ঠান্ডা হলে তা কঠিন মোমে পরিণত হয়। অর্থাৎ তাপের প্রভাবে মোমের কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় এই তিন অবস্থারই অস্তিত্ব পাওয়া যায়।

২.৬ গলন ও স্ফুটন (Melting and Boiling)

তাপ প্রয়োগে কোনো পদার্থের কঠিন অবস্থা থেকে তরল অবস্থায় রূপান্তর করার প্রক্রিয়াকে গলন বলে। 1.0 বায়ুমণ্ডলীয় চাপে তাপ প্রয়োগের ফলে যে তাপমাত্রায় কোনো কঠিন পদার্থ তরলে পরিণত হয় সেই তাপমাত্রাকে উক্ত কঠিন পদার্থের গলনাঙ্ক বলে। প্রত্যেক বিশুদ্ধ কঠিন পদার্থের একটি নির্দিষ্ট গলনাঙ্ক থাকে। যেমন– 1.0 বায়ুমণ্ডলীয় চাপে বরফের গলনাঙ্ক 0°C।

তাপ প্রয়োগ করে তরলকে গ্যাসে রূপান্তর করার প্রক্রিয়াকে স্ফুটন বলে। 1.0 বায়ুমণ্ডলীয় চাপে তাপ প্রয়োগের ফলে যে তাপমাত্রায় কোনো তরল পদার্থ গ্যাসীয় পদার্থে পরিণত হয় সেই তাপমাত্রাকে উক্ত তরল পদার্থের স্ফুটনাঙ্ক বলে। প্রত্যেক বিশুদ্ধ তরলের একটি নির্দিষ্ট স্ফুটনাঙ্ক থাকে। যেমন– 1.0 বায়ুমণ্ডলীয় চাপে পানির স্ফুটনাঙ্ক 100°C। স্ফুটনের বিপরীত প্রক্রিয়াটির নাম ঘনীভবন। স্ফুটনের জন্য তাপ দিতে হয়, ঘনীভবনের সময় তাপ সরিয়ে নিতে হয়।

একক কাজ

পরীক্ষা নং: ৪

কঠিন পদার্থের গলনাঙ্ক নির্ণয় পদ্ধতি

ধরা যাক, আমরা একটি বিশুদ্ধ কঠিন পদার্থ/ইউরিয়া সারের গলনাঙ্ক নির্ণয় করতে চাই। এক্ষেত্রে প্রথমে একটি ত্রিপদী স্ট্যান্ডের উপর তারজালি রেখে তার উপর একটি ওয়াচ গ্লাস রাখতে হবে। এবার ঐ ওয়াচ গ্লাসের উপর কিছু পরিমাণ ইউরিয়া সার রাখতে হবে। এবার একটি স্ট্যান্ডের সাথে সুতা দিয়ে থার্মোমিটারকে বেঁধে থার্মোমিটারের বাল্বকে ইউরিয়ার মধ্যে প্রবেশ করাতে হবে। এবার একটি বার্নার দিয়ে ইউরিয়াকে তাপ দিতে হবে। তাপ দেওয়ার এক পর্যায়ে দেখা যাবে 133°C তাপমাত্রায় ইউরিয়া সার গলতে শুরু করেছে এবং ঐ তাপমাত্রায় সকল ইউরিয়া সার গলে যাবে। এই 133°C তাপমাত্রাই ইউরিয়ার গলনাঙ্ক।

চিত্র ২.০৬: ইউরিয়ার গলনাঙ্ক নির্ণয়

আবার ধরা যাক, আমরা একটি অবিশুদ্ধ পদার্থ মোমের গলনাঙ্ক বের করতে চাই। মোম কিছু পদার্থের মিশ্রণ। মোমের গলনাঙ্ক নির্ণয় করতে হলে প্রথমে মোমকে চূর্ণ করে পাউডার বা গুঁড়ায় পরিণত করতে হবে। এরপর মোমের গুঁড়াকে একটি এক মুখ বন্ধ কাচনলে নিয়ে ২.০৭ চিত্রের মতো করে সেখানে একটি থার্মোমিটার রাখতে হবে। এবারে কাচনলটি বিকারের পানিতে এমনভাবে ডুবাতে হবে যেন কাচনলের খোলা মুখে পানি প্রবেশ না করে। এখন বিকারটিতে ধীরে ধীরে তাপ প্রয়োগ করতে হবে। এক পর্যায়ে দেখা যাবে একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় মোম না গলে তাপমাত্রার একটি পরিসরে (range) মোম গলতে থাকে এবং তাপমাত্রার এই পরিসরই হলো মোমের গলনাঙ্ক।

অবিশুদ্ধ পদার্থের গলনাঙ্ক বিশুদ্ধ পদার্থ থেকে কম এবং স্ফুটনাঙ্ক বেশি হয়। মিশ্র পদার্থের সুনির্দিষ্ট গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক থাকে না।

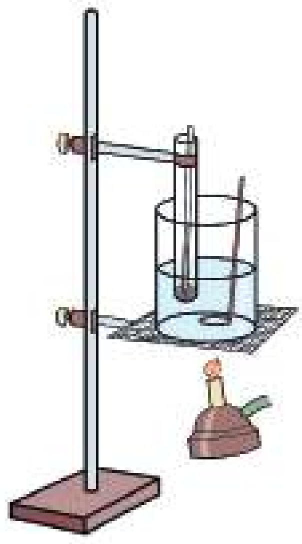

চিত্র ২.০৭: মোমের গলনাঙ্ক নির্ণয়

যেহেতু প্রত্যেক বিশুদ্ধ কঠিন পদার্থের একটি নির্দিষ্ট গলনাঙ্ক থাকে সেহেতু কঠিন পদার্থ একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় গলে থাকে। যদি দেখা যায় কোনো কঠিন পদার্থ তার নির্দিষ্ট গলনাঙ্ক ছাড়া অন্য কোনো তাপমাত্রায় গলছে সেক্ষেত্রে ধরে নিতে হবে কঠিন পদার্থটি বিশুদ্ধ নয়। আবার যদি দেখা যায় কঠিন পদার্থটি একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রার পরিসরে গলতে থাকে তাহলেও ধরে নিতে হবে কঠিন পদার্থটি বিশুদ্ধ নয়। যেমন– 1.0 বায়ুমণ্ডলীয় চাপে বিশুদ্ধ সালফারের গলনাঙ্ক 115°C। কিন্তু কোনো একটি সালফার নমুনার গলনাঙ্ক নির্ণয় করার সময় যদি দেখা যায় ঐ সালফার নমুনা 115°C অপেক্ষা কম তাপমাত্রায় গলছে, তবে বুঝতে হবে ঐ নমুনা সালফার বিশুদ্ধ নয়। এটি ভেজাল যুক্ত সালফার। গলনাঙ্ক নির্ণয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোনো কঠিন পদার্থের বিশুদ্ধতা নির্ণয় করা যায়।

একক কাজ

পরীক্ষা নং: ৫

তরল পদার্থের স্ফুটনাঙ্ক নির্ণয়ের পদ্ধতি

যে তরল পদার্থের স্ফুটনাঙ্ক নির্ণয় করতে হবে ঐ তরল পদার্থের (যেমন– পানি) কিছু পরিমাণ একটি বিকারে নেওয়া হয়। এই বিকারের মধ্যে একটি থার্মোমিটার রাখা হয়। এখন সতর্কতার সাথে বুনসেন বার্নার দিয়ে বিকারটিকে উত্তপ্ত করা হয়। এক পর্যায়ে সমস্ত পানি একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় বাষ্পে পরিণত হবে। এই তাপমাত্রাই পানির স্ফুটনাঙ্ক। যেমন- পানিকে বিকারে নিয়ে উত্তপ্ত করলে 100°C তাপমাত্রায় সমস্ত পানি বাষ্পে পরিণত হয়। অর্থাৎ পানির স্ফুটনাঙ্ক 100°C (1 atm চাপে)। যেহেতু প্রত্যেক বিশুদ্ধ তরলের স্ফুটনাঙ্ক নির্দিষ্ট সেহেতু একাধিক তরলের একই স্ফুটনাঙ্ক হতে পারে না। আবার, কোনো তরলে ভেজাল মিশ্রিত থাকলে সেটি তার নির্দিষ্ট স্ফুটনাঙ্ক ব্যতীত ভিন্ন তাপমাত্রায় ফুটতে থাকে।

যেমন–পানিতে সামান্য পরিমাণ অ্যালকোহল যোগ করলে পানির স্ফুটনাঙ্ক 100°C তাপমাত্রা না হয়ে অন্য কোনো তাপমাত্রায় হবে। স্ফুটনাঙ্কের মাধ্যমে কোনো তরল পদার্থ বিশুদ্ধ নাকি অবিশুদ্ধ তা নির্ণয় করা যায়।

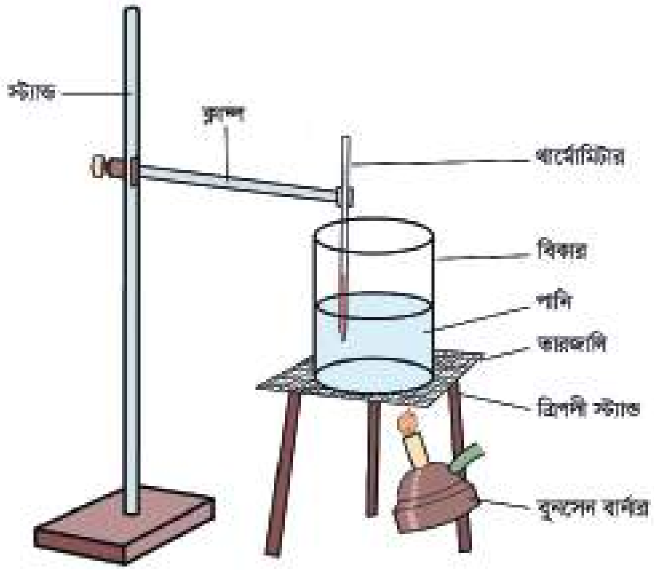

চিত্র ২.০৮: পানির স্ফুটনাঙ্ক নির্ণয়

ইতোমধ্যে তোমরা জানতে পেরেছ একটি বিশুদ্ধ পদার্থের গলন এবং স্ফুটনের সময় তাপ দেওয়া হলেও তাপমাত্রার পরিবর্তন হয় না। এই সময় যে তাপ দেওয়া হয় সেই তাপটুকু অবশিষ্ট পদার্থ শোষণ করে কঠিন থেকে তরল কিংবা তরল থেকে গ্যাসে পরিণত হয়।

আমরা যদি তাপ প্রয়োগ করে একটি কঠিন পদার্থকে প্রথমে তরল পরে তরলকে বাষ্পে পরিণত করি তাহলে তাপমাত্রার কী ঘটবে? নিচের পরীক্ষাটি দেখে আমরা সেটি বুঝতে পারি।

একক কাজ

পরীক্ষা নং: ৬

কয়েক টুকরা বরফকে একটি বিকারে নিয়ে সেটিতে ধীরে ধীরে তাপ প্রদান করা হলো এবং তাপ প্রয়োগের পুরো সময় একটি থার্মোমিটারের সাহায্যে সারাক্ষণ এর তাপমাত্রা পরিমাপ করা হলো। ধরা যাক, কঠিন বরফ খণ্ডগুলোর প্রাথমিক তাপমাত্রা ছিল -40°C (২.০৯ চিত্রটি দেখো)।

২০২৩

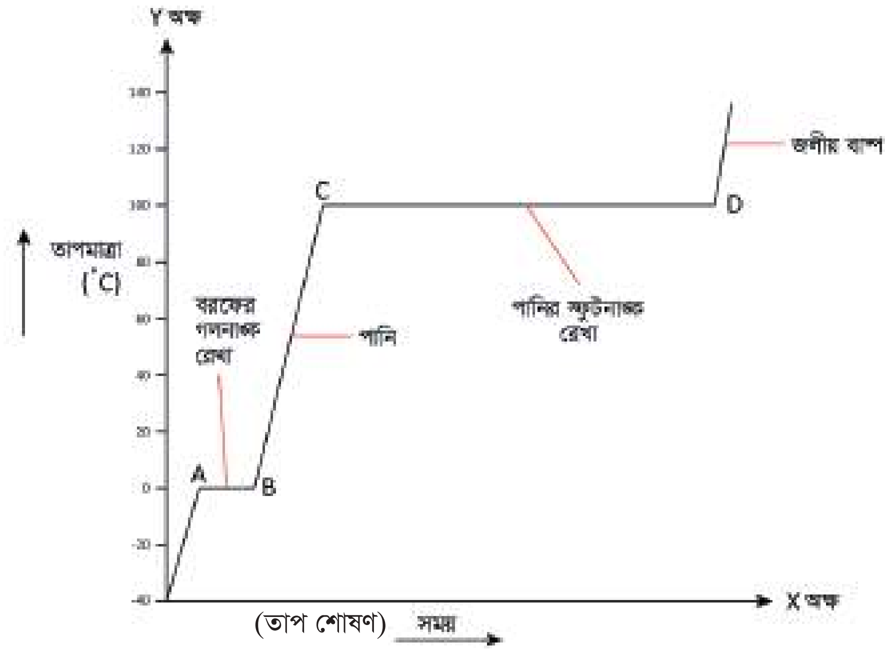

চিত্র ২.০৯: বরফে তাপ প্রদানের লেখচিত্র

তাপ প্রয়োগের সাথে সাথে কঠিন অবস্থার বরফের তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে এবং বাড়তে বাড়তে যখন 0°C তাপমাত্রায় পৌঁছায়, তখন কঠিন বরফ গলনের মাধ্যমে তরল পানিতে পরিণত হয়। কঠিন বরফের গলনের পুরো সময় তাপমাত্রা 0°C তাপমাত্রায় স্থির থাকে এবং এই 0°C তাপমাত্রায়ই সমস্ত বরফ পানিতে পরিণত হয়। অর্থাৎ 0°C তাপমাত্রা হলো বরফের গলনাঙ্ক। গলনাঙ্কের তাপমাত্রায় যে সরলরেখা পাওয়া যায় তাকে গলনাঙ্ক রেখা বলা হয়।২.০৯ চিত্রে AB রেখা বরফের গলনাঙ্ক রেখা। এই রেখা বরাবর বরফ ও পানি উভয়ই অবস্থান করে। এরপরও তাপ দিতে থাকলে তরল পানির তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে এবং পানির তাপমাত্রা যখন 100°C এ পৌঁছে তখন পানিতে তাপ প্রদান করলেও তরল পানির তাপমাত্রা আর বাড়ে না। ঐ তাপমাত্রায় পানি ফুটতে থাকে। এই 100°C তাপমাত্রায়ই সমস্ত পানি জলীয় বাষ্পে পরিণত হয়। এরপরও তাপ প্রয়োগ করা হলে জলীয় বাষ্পের তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। পানির স্ফুটনাঙ্ক 100°C। চিত্রে CD রেখা পানির স্ফুটনাঙ্ক রেখা। এই রেখা বরাবর পানি এবং জলীয়বাষ্প উভয়ই একসাথে অবস্থান করে।

বিপরীতক্রমে জলীয় বাষ্পকে ক্রমান্বয়ে শীতল করা হলে প্রাপ্ত ফলাফল একটি গ্রাফ পেপারের X অক্ষে সময় এবং Y অক্ষে তাপমাত্রা নিয়ে লেখচিত্র অঙ্কন করলে নিম্নরূপ রেখা পাওয়া যাবে:

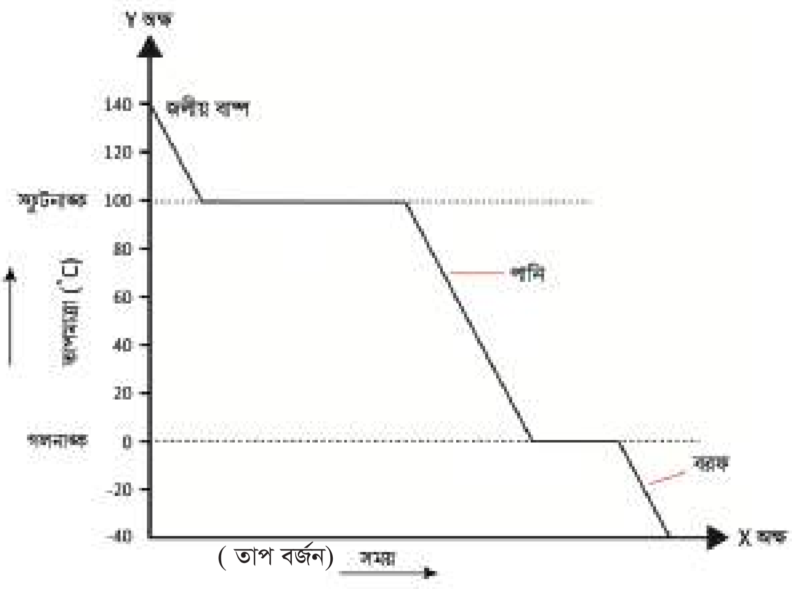

চিত্র ২.১০: জলীয় বাষ্পকে শীতলকরণের লেখচিত্র

লেখচিত্র থেকে দেখা যায়, শুরুতে জলীয় বাষ্পের তাপমাত্রা 140°C। এই জলীয় বাষ্পকে ধীরে ধীরে শীতল বা ঠান্ডা করে যখন তাপমাত্রা 140°C থেকে কমিয়ে 100°C এ নিয়ে যাওয়া হয় তখন জলীয় বাষ্প পানিতে পরিণত হতে শুরু করে। যতক্ষণ জলীয় বাষ্প পানিতে পরিণত হতে থাকে ততক্ষণ পানির তাপমাত্রা 100°C তে স্থির থাকে। এরপরও পানিকে আরো ঠান্ডা করা হলে পানির তাপমাত্রা কমতে থাকে। ঠান্ডা করতে করতে যখন পানির তাপমাত্রা 0°C তাপমাত্রায় পৌঁছে তখন তরল পানি কঠিন বরফে পরিণত হতে শুরু করে। এর পরেও পানিকে ঠান্ডা করলে পানির তাপমাত্রা আর কমে না। সমস্ত তরল পানি কঠিন বরফে পরিণত হওয়ার পর আরও ঠান্ডা করা হলে বরফের তাপমাত্রা 0°C থেকে কমতে থাকে। চিত্রে –40°C তাপমাত্রা পর্যন্ত বরফের তাপমাত্রা কমানো দেখানো হয়েছে।

২.৭ পাতন এবং ঊর্ধ্বপাতন (Distillation and Sublimation)

তাপ প্রয়োগের দ্বারা একটি তরল পদার্থকে বাষ্পে পরিণত করার প্রক্রিয়াকে বাষ্পীভবন বলে। যেমন– একটি পাত্রে পানিসহ চা-এ তাপ প্রয়োগ করা হলে ঐ গরম চা থেকে পানি বাষ্পাকারে উড়ে যায়। এটি বাষ্পীভবনের উদাহরণ। আবার, উক্ত বাষ্পকে শীতল করলে তা তরলে পরিণত হয় যাকে ঘনীভবন বলে। যেমন– জলীয় বাষ্প তাপশক্তি নির্গত করে ঠান্ডা হয়ে পানিতে পরিণত হয়। এটি ঘনীভবন প্রক্রিয়ার উদাহরণ। কোনো তরলকে তাপ প্রয়োগের মাধ্যমে বাষ্পে পরিণত করে তাকে পুনরায় শীতলীকরণের মাধ্যমে তরলে পরিণত করার পদ্ধতিকে পাতন বলে। অর্থাৎ পাতন হলো বাষ্পীভবন এবং ঘনীভবন প্রক্রিয়াদ্বয়ের সম্মিলিত একটি প্রক্রিয়া।

পাতন = বাষ্পীভবন + ঘনীভবন (Distillation = Vaporization + Condensation)

২.১১ নং চিত্রে তাপ প্রয়োগে একটি উদ্বায়ী পদার্থের অবস্থার পরিবর্তন দেখানো হলো।

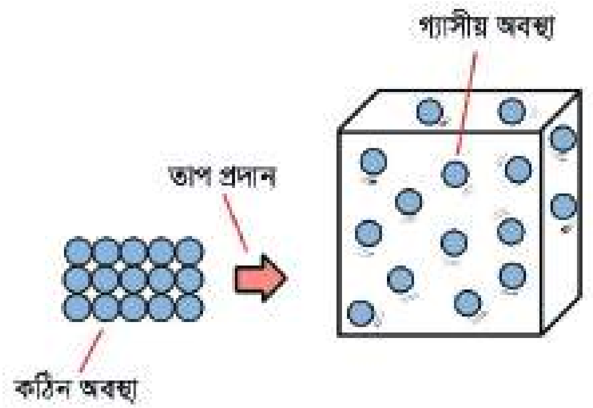

চিত্র ২.১১: উদ্বায়ী পদার্থের ঊর্ধ্বপাতন

যে প্রক্রিয়ায় কোনো কঠিন পদার্থে তাপ প্রয়োগ করা হলে কঠিন পদার্থটি তরলে পরিণত না হয়ে সরাসরি বাষ্পে পরিণত হয়, সেই প্রক্রিয়াকে ঊর্ধ্বপাতন বলে। নিশাদল (NH_4Cl), কর্পূর ($C_{10}H_{16}O$), ন্যাপথলিন ($C_{10}H_8$), কঠিন কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2), আয়োডিন (I_2), অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড ($AlCl_3$) ইত্যাদি পদার্থগুলোতে তাপ প্রয়োগ করা হলে সেগুলো তরলে পরিণত না হয়ে সরাসরি বাষ্পে পরিণত হয়। এই পদার্থগুলোকে উদ্বায়ী পদার্থ বলা হয়।

২০২৫

পরীক্ষা নং: ৭

২.১২ নং চিত্রের ন্যায় একটি বিকারে কিছু পরিমাণ কঠিন অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড ($AlCl_3$) লবণ নাও। বিকারের খোলা মুখ একটি কাচের ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দাও। কাচের ঢাকনার উপর কিছু বরফ রাখো। এরপর ধীরে ধীরে বিকারটিতে তাপ প্রয়োগ করো। তাপ প্রয়োগে দেখা যাবে কঠিন $AlCl_3$ গ্যাসীয় $AlCl_3$ এ পরিণত হচ্ছে। সেটি উপরে উঠে ঢাকনায় গিয়ে শীতল হয়ে কঠিন $AlCl_3$ হিসেবে ঢাকনার নিচে জমা হয়েছে।

চিত্র ২.১২: $AlCl_3$ এর ঊর্ধ্বপাতন

ঊর্ধ্বপাতন প্রক্রিয়ার প্রয়োগ

কোনো কঠিন পদার্থের মিশ্রণের মধ্যে একটি উদ্বায়ী পদার্থ মিশ্রিত থাকলে ঐ উদ্বায়ী পদার্থকে মিশ্রণ থেকে সহজে পৃথক করা যায়, যেমন- নিশাদল বা অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড (NH_4Cl) এর সাথে খাদ্য লবণ ($NaCl$) মিশ্রিত থাকলে ঊর্ধ্বপাতন পদ্ধতির মাধ্যমে নিশাদলকে পৃথক করা যাবে।

কঠিন অবস্থায় ঊর্ধ্বপাতিত পদার্থে তাপ প্রয়োগ করতে থাকলে ঊর্ধ্বপাতিত পদার্থ সহজেই বাষ্পীভূত হয়। আয়োডিনমিশ্রিত খাদ্যলবণের মধ্যে আয়োডিন একটি ঊর্ধ্বপাতিত পদার্থ। কাজেই ঐ আয়োডিন মিশ্রিত খাদ্যলবণের মিশ্রণকে তাপ দিলে আয়োডিন সহজেই বাষ্পীভূত হয়। ঐ বাষ্পকে ঠান্ডা করে কঠিন আয়োডিনে পরিণত করা যায়। বালি এবং গ্লুকোজের মিশ্রণের মধ্যে কোনো উদ্বায়ী পদার্থ নেই। কাজেই তাপ প্রয়োগ করে বালি এবং গ্লুকোজের মিশ্রণ থেকে বালি বা গ্লুকোজকে আলাদা করা যায় না।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কাপে গরম চা রাখলে নিচের কোন প্রক্রিয়াটি ঘটে?

(ক) বাষ্পীভবন (খ) ঊর্ধ্বপাতন

(গ) ব্যাপন (ঘ) নিঃসরণ

২. জলীয় বাষ্পকে ঘনীভবন করার পর কণাসমূহের ক্ষেত্রে কী ঘটবে?

(ক) আকার সংকুচিত হবে (খ) আন্তঃকণা আকর্ষণ হ্রাস পায়

(গ) একই অবস্থানে থেকে কাঁপতে থাকবে (ঘ) গতি শক্তি হ্রাস পাবে

৩. নিচের কোন চিত্রটি ঊর্ধ্বপাতনের জন্য প্রযোজ্য?

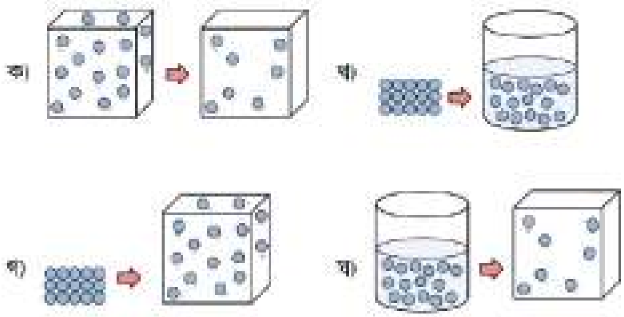

৪. অজানা কঠিন বস্তু Z-এর তাপীয় বক্ররেখা চিত্র হতে বোঝা যায়–

i. Z বস্তুটির গলনাঙ্ক 154°C

ii. Z বস্তুটি উদ্বায়ী

iii. AB ও CD রেখা বস্তুটির গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক বোঝায়

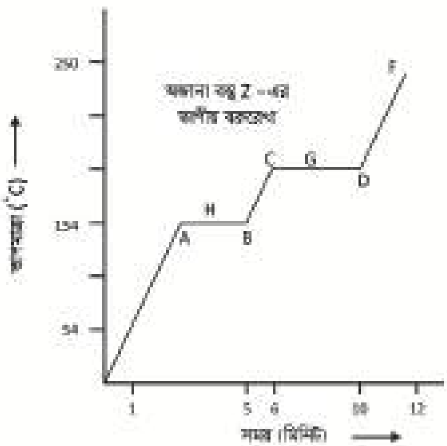

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii

(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৫. কোনটির ব্যাপনের হার বেশি?

(ক) CO_2 (খ) NH_3

(গ) HCl (ঘ) H_2SO_4

৬. কোনটি ঊর্ধ্বপাতিত হয়?

(ক) আয়োডিন (খ) খাদ্যলবণ

(গ) তুঁতে (ঘ) সোডা অ্যাস

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.

(A) (B)

(ক) ব্যাপন কাকে বলে?

(খ) 'গ্যাস সিলিন্ডারের মুখ খুললে ব্যাপন ও নিঃসরণ উভয়ই ঘটে'-ব্যাখ্যা করো।

(গ) তাপমাত্রা বাড়াতে থাকলে উদ্দীপকের কোন পদার্থটি সবার আগে বাষ্পীভূত হবে? ব্যাখ্যা করো।

(ঘ) একই পদ্ধতিতে A ও B পাত্রের উপাদানগুলো পৃথকীকরণের সম্ভাব্যতা যাচাই করো।

২.

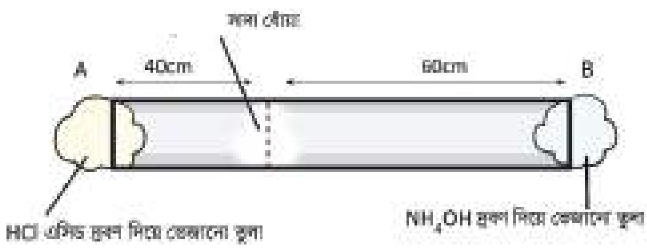

(ক) নিঃসরণ কাকে বলে?

(খ) একই পদার্থের গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক ভিন্ন কেন? ব্যাখ্যা করো।

(গ) উদ্দীপকে সাদা ধোঁয়া তৈরির প্রক্রিয়া সমীকরণসহ ব্যাখ্যা করো।

(ঘ) সাদা ধোঁয়া A প্রান্তের কাছাকাছি উৎপন্ন হওয়ার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করো।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. আয়োডিনকে তরল অবস্থায় পাওয়া যায় না কেন? ব্যাখ্যা করো।

২. NH_3 এর ব্যাপনের হার HCl থেকে বেশি কেন? ব্যাখ্যা করো।

৩. 'পানির স্ফুটনাংক 100° C' বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো।

তৃতীয় অধ্যায়

পদার্থের গঠন

(Structure of Matter)

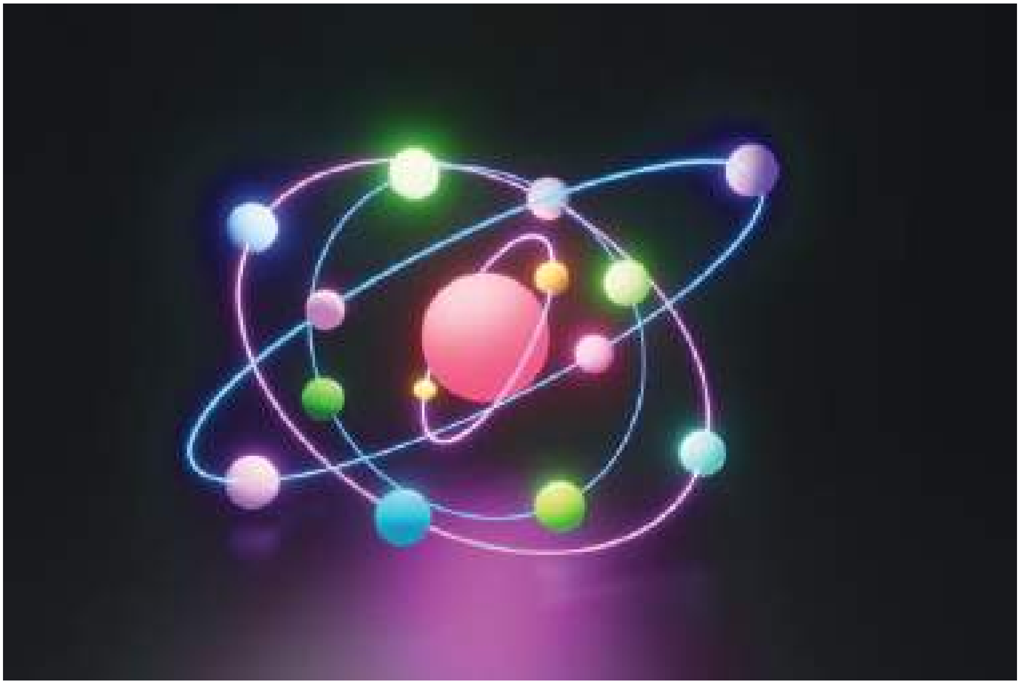

হাইড্রোজেন পরমাণুর বিভিন্ন শক্তিস্তরে ইলেকট্রনের বিন্যাস

কৌতূহলী মানুষের স্বাভাবিক চিন্তা হলো, আমাদের চারপাশের জিনিসগুলো কী দিয়ে তৈরি? আমাদের শরীরই বা কী দিয়ে তৈরি? হ্যাঁ, আমাদের মতো প্রাচীন দার্শনিকেরাও এ নিয়ে বহু চিন্তাভাবনা করেছেন। প্রাচীন গ্রিক দার্শনিকেরা ভাবতেন মাটি, পানি, বায়ু এবং আগুন ইত্যাদি মৌলিক পদার্থ আর অন্য সকল বস্তু এদের মিশ্রণে তৈরি।

গ্রিসের দার্শনিক ডেমোক্রিটাস প্রথম বলেছিলেন, প্রত্যেক পদার্থের একক আছে যা অতি ক্ষুদ্র আর অবিভাজ্য। তিনি এর নাম দেন এটম। কোনো বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দিয়ে এটি প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি এবং সে সময়ের সবচেয়ে বড় বিজ্ঞানী এরিস্টটল এর বিরোধিতা করেছিলেন। তাই এটি কোনো গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। প্রায় 2500 বছর পর 1803 সালে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী জন ডাল্টন বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফলের উপর ভিত্তি করে ডেমোক্রিটাসের ধারণাপ্রসুত পরমাণু সম্পর্কে একটি মতবাদ দেন। এই মতবাদ অনুসারে প্রতিটি পদার্থ অজস্র ক্ষুদ্র এবং অবিভাজ্য কণার সমন্বয়ে গঠিত। তিনি দার্শনিক ডেমোক্রিটাসের সম্মানে এ একক ক্ষুদ্র কণার নাম দেন Atom, যার অর্থ পরমাণু। পরে

প্রমাণিত হয় যে, পরমাণু অবিভাজ্য নয়। এদের ভাঙলে পরমাণুর চেয়েও ক্ষুদ্র কণিকা ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন ইত্যাদি পাওয়া যায়। অর্থাৎ পরমাণু কতকগুলো ক্ষুদ্রতর কণার সমন্বয়ে গঠিত। পরমাণুর গঠন সম্পর্কিত বিভিন্ন মডেল, পরমাণুর সাংগঠনিক কণাসমূহ, পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাস ইত্যাদি এ অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- মৌলের ইংরেজি ও ল্যাটিন নাম থেকে তাদের প্রতীক লিখতে পারব।
- মৌলিক ও স্থায়ী কণিকাগুলোর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারব।
- পারমাণবিক সংখ্যা, ভর সংখ্যা, আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর থেকে আপেক্ষিক আণবিক ভর হিসাব করতে পারব।
- পরমাণুর ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন সংখ্যা হিসাব করতে পারব।
- আইসোটোপের ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরমাণুর গঠন সম্পর্কে রাদারফোর্ড ও বোর পরমাণু মডেলের বর্ণনা করতে পারব।
- রাদারফোর্ড ও বোর পরমাণু মডেলের মধ্যে কোনটি বেশি গ্রহণযোগ্য তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরমাণুর বিভিন্ন কক্ষপথে এবং কক্ষপথের বিভিন্ন উপস্তরে পরমাণুর ইলেকট্রনসমূহকে বিন্যাস করতে পারব।

৩.১ মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ (Elements and Compounds)

মৌলিক পদার্থ

সোনা, রুপা বা লোহা ইত্যাদি বিশুদ্ধ পদার্থকে তুমি যতই ভাঙ না কেন সেখানে তাদের ক্ষুদ্রতর কণা ছাড়া আর কিছু পাবে না। যে পদার্থকে ভাঙলে সেই পদার্থ ছাড়া অন্য কোনো পদার্থ পাওয়া যায় না তাকে মৌলিক পদার্থ বা মৌল বলে। এরকম আরও কিছু মৌলের উদাহরণ হলো নাইট্রোজেন, ফসফরাস, কার্বন, অক্সিজেন, হিলিয়াম, ক্যালসিয়াম, আর্গন, ম্যাগনেসিয়াম, সালফার ইত্যাদি। এ পর্যন্ত 118টি মৌল আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে 98টি মৌল প্রকৃতিতে পাওয়া যায়। বাকি মৌলগুলো গবেষণাগারে তৈরি করা হয়েছে। এগুলোকে কৃত্রিম মৌল বলে। তুমি কি জানো মানব শরীরে মোট 26 ধরনের ভিন্ন ভিন্ন মৌল আছে?

যৌগিক পদার্থ

ইতিমধ্যে তোমরা জেনেছ যে, মৌলিক পদার্থকে ভাঙলে শুধু ঐ পদার্থই পাওয়া যাবে। কিন্তু পানিকে যদি ভাঙা হয় (অর্থাৎ রাসায়নিকভাবে বিশ্লেষণ করা যায়) তবে কিন্তু দুটি ভিন্ন মৌল হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পাওয়া যাবে। আবার, লেখার চককে যদি ভাঙা যায় তাহলে সেখানে ক্যালসিয়াম, কার্বন ও অক্সিজেন এ তিনটি মৌল পাওয়া যাবে। যে সকল পদার্থকে ভাঙলে দুই বা দুইয়ের অধিক মৌল পাওয়া যায় তাদেরকে যৌগ বা যৌগিক পদার্থ বলে। যৌগের মধ্যে মৌলসমূহের সংখ্যার অনুপাত সব সময় একই থাকে। যেমন– যেখান থেকেই পানির নমুনা সংগ্রহ করা হোক না কেন রাসায়নিকভাবে বিশ্লেষণ করা হলে সব সময় দুই ভাগ হাইড্রোজেন এবং এক ভাগ অক্সিজেন পাওয়া যাবে অর্থাৎ পানিতে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের পরমাণুর সংখ্যার অনুপাত $2:1$। যৌগের ধর্ম কিন্তু মৌলসমূহের ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। যেমন– সাধারণ তাপমাত্রায় হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাসীয় কিন্তু এদের থেকে উৎপন্ন যৌগ পানি সাধারণ তাপমাত্রায় তরল।

৩.২ পরমাণু ও অণু (Atoms and Molecules)

পরমাণু হলো মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা যার মধ্যে মৌলের গুণাগুণ বর্তমান থাকে। যেমন– নাইট্রোজেনের পরমাণুতে নাইট্রোজেনের ধর্ম বিদ্যমান আর অক্সিজেনের পরমাণুতে অক্সিজেনের ধর্ম বিদ্যমান থাকে।

দুই বা দুইয়ের অধিক সংখ্যক পরমাণু পরস্পরের সাথে রাসায়নিক বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত থাকলে তাকে অণু বলে। রাসায়নিক বন্ধন সম্পর্কে তোমরা পঞ্চম অধ্যায়ে বিস্তারিত জানবে। দুটি অক্সিজেন পরমাণু (O) পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে অক্সিজেন অণু (O_2) গঠিত হয়। আবার, একটি কার্বন পরমাণু (C) দুটি

অক্সিজেন পরমাণুর (O) সাথে যুক্ত হয়ে একটি কার্বন ডাই-অক্সাইড অণু (CO_2) গঠিত হয়। একই মৌলের একাধিক পরমাণু পরস্পরের সাথে যুক্ত হলে তাকে মৌলের অণু বলে। যেমন–O_2। ভিন্ন ভিন্ন মৌলের পরমাণু পরস্পর যুক্ত হলে তাকে যৌগের অণু বলে। যেমন–CO_2।

৩.৩ মৌলের প্রতীক (Symbols of Elements)

কোনো মৌলের ইংরেজি বা ল্যাটিন নামের সংক্ষিপ্ত রূপকে প্রতীক বলে। প্রত্যেকটি মৌলকে সংক্ষেপে প্রকাশ করতে তাদের আলাদা আলাদা প্রতীক ব্যবহার করা হয়। মৌলের প্রতীক লিখতে কিছু নিয়ম অনুসরণ করতে হয়।

টেবিল ৩.০১: মৌলের নামকরণ

মৌল	ইংরেজি নাম	প্রতীক
হাইড্রোজেন	Hydrogen	H
অক্সিজেন	Oxygen	O
নাইট্রোজেন	Nitrogen	N

(a) প্রথমত মৌলের ইংরেজি নামের প্রথম অক্ষর দিয়ে প্রতীক লেখা হয় এবং তা ইংরেজি বর্ণমালার বড় হাতের অক্ষর দিয়ে প্রকাশ করা হয়। যেমন- হাইড্রোজেন (Hydrogen) এর প্রতীক (H), কার্বন (Carbon) এর প্রতীক (C), অক্সিজেনের প্রতীক (O) ইত্যাদি।

(b) যদি দুই বা দুইয়ের অধিক মৌলের ইংরেজি নামের প্রথম অক্ষর একই হয় তবে একটি মৌলকে নামের প্রথম অক্ষর (ইংরেজি বর্ণমালার বড় হাতের) দিয়ে প্রকাশ করা হয়। অন্যগুলোর ক্ষেত্রে প্রতীকটি দুই অক্ষরে লেখা হয়। নামের প্রথম অক্ষরটি ইংরেজি বর্ণমালার বড় হাতের অক্ষর এবং নামের অন্য একটি অক্ষর ছোট হাতের অক্ষর দিয়ে লেখা হয়। যেমন-

টেবিল ৩.০২: মৌলের নামকরণ (প্রথম অক্ষর এক)

মৌল	ইংরেজি নাম	প্রতীক
কার্বন	Carbon	C
ক্লোরিন	Chlorine	Cl
ক্যালসিয়াম	Calcium	Ca

মৌল	ইংরেজি নাম	প্রতীক
কোবাল্ট	Cobalt	Co
ক্যাডমিয়াম	Cadmium	Cd
ক্রোমিয়াম	Chromium	Cr

(c) কিছু মৌলের প্রতীক তাদের ল্যাটিন নাম থেকে নেওয়া হয়েছে। যেমন-

টেবিল ৩.০৩: মৌলের নামকরণ (ল্যাটিন নাম)

মৌল	ল্যাটিন নাম	প্রতীক
সোডিয়াম	Natrium	Na
কপার	Cuprum	Cu
পটাশিয়াম	Kalium	K
সিলভার	Argentum	Ag
টিন	Stannum	Sn
এন্টিমনি	Stibium	Sb

মৌল	ল্যাটিন নাম	প্রতীক
গোল্ড	Aurum	Au
লেড	Plumbum	Pb
টাংস্টেন	Wolfram	W
আয়রন	Ferrum	Fe
মারকারি	Hydrurgyrum	Hg

একক কাজ

কাজ: চতুর্থ অধ্যায়ের পর্যায় সারণি থেকে কিছু মৌলের নাম ও প্রতীক সংগ্রহ করে তোমার রসায়ন শিক্ষককে দেখাও।

৩.৪ সংকেত (Formula)

হাইড্রোজেনের একটি অণুকে প্রকাশ করতে H_2 ব্যবহার করা হয়। যার অর্থ হলো একটি হাইড্রোজেনের অণুতে দুটি হাইড্রোজেনের পরমাণু (H) আছে। আবার, পানির একটি অণুকে প্রকাশ করতে H_2O ব্যবহার করা হয়। এর অর্থ হচ্ছে পানির একটি অণুতে দুটি হাইড্রোজেন (H) এবং একটি অক্সিজেন পরমাণু (O) থাকে। পাশের তালিকায় সাধারণ কয়েকটি অণুর সংকেত দেখানো হলো।

টেবিল ৩.০৪: অণুর সংকেত

অণুর নাম	সংকেত
নাইট্রোজেন	N_2
অ্যামোনিয়া	NH_3
ক্লোরিন	Cl_2
সালফিউরিক এসিড	H_2SO_4
হাইড্রোক্লোরিক এসিড	HCl

৩.৫ পরমাণুর সাংগঠনিক কণা (The fundamental particles of an atom)

একমাত্র হাইড্রোজেন ছাড়া সকল পদার্থের পরমাণু তিনটি কণা দিয়ে তৈরি। সেগুলো হচ্ছে ইলেকট্রন, প্রোটন এবং নিউট্রন। এই কণাগুলোকে পরমাণুর সাংগঠনিক (fundmental) বা মৌলিক কণা বলে। পরমাণুর কেন্দ্রে বা নিউক্লিয়াসে প্রোটন ও নিউট্রন থাকে এবং ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসকে ঘিরে ঘুরতে থাকে।

ইলেকট্রন: ইলেকট্রন হলো পরমাণুর একটি মৌলিক কণিকা যার আধান বা চার্জ ঋণাত্মক (নেগেটিভ)। এ আধানের পরিমাণ -1.60×10^{-19} কুলম্ব। একে e প্রতীক দিয়ে প্রকাশ করা হয়। একটি ইলেকট্রনের ভর 9.11×10^{-28} g। ইলেকট্রনের আপেক্ষিক আধান –1 ধরা হয় এবং এর ভর প্রোটন ও নিউট্রনের ভরের তুলনায় 1840 গুণ কম। তাই এর আপেক্ষিক ভরকে শূন্য ধরা হয়।

প্রোটন: প্রোটন হলো পরমাণুর অপর একটি মৌলিক কণিকা যার চার্জ বা আধান ধনাত্মক (পজেটিভ)। এ আধানের পরিমাণ $+1.60 \times 10^{-19}$ কুলম্ব। একে p প্রতীক দিয়ে প্রকাশ করা হয়। একটি প্রোটনের ভর 1.67×10^{-24} g। প্রোটনের আপেক্ষিক আধান +1 এবং আপেক্ষিক ভর 1 ধরা হয়।

নিউট্রন: নিউট্রন হলো পরমাণুর আরেকটি মৌলিক কণিকা যার কোনো আধান বা চার্জ নেই। হাইড্রোজেন ছাড়া সকল মৌলের পরমাণুতেই নিউট্রন রয়েছে। একে n প্রতীক দিয়ে প্রকাশ করা হয়। এর ভর প্রোটনের ভরের চেয়ে সামান্য বেশি। নিউট্রনের আপেক্ষিক আধান 0 আর আপেক্ষিক ভর 1 ধরা হয়।

পরমাণুর সাংগঠনিক বা মৌলিক কণাসমূহের বৈশিষ্ট্যমূলক ধর্মাবলি নিচের তালিকায় উপস্থাপন করা হলো।

টেবিল ৩.০৫: মৌলিক কণিকা

মৌলিক কণিকার নাম	প্রতীক	প্রকৃত আধান বা চার্জ	প্রকৃত ভর	আপেক্ষিক আধান	আপেক্ষিক ভর
ইলেকট্রন	e	-1.60×10^{-19} কুলম্ব।	9.11×10^{-28} g	−1	0
প্রোটন	p	$+1.60 \times 10^{-19}$ কুলম্ব।	1.67×10^{-24} g	+1	1
নিউট্রন	n	0	1.67×10^{-24} g	0	1

৩.৫.১ পারমাণবিক সংখ্যা (Atomic Number)

কোনো মৌলের একটি পরমাণুর নিউক্লিয়াসে উপস্থিত প্রোটনের সংখ্যাকে ঐ মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা বলা হয়। যেমন– হিলিয়াম (He) এর একটি পরমাণুর নিউক্লিয়াসে দুটি প্রোটন থাকে। তাই হিলিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা হলো দুই। আবার, অক্সিজেন (O) পরমাণুর নিউক্লিয়াসে আটটি প্রোটন থাকে। তাই অক্সিজেনের পারমাণবিক সংখ্যা হলো আট। কোনো পরমাণুর পারমাণবিক সংখ্যা দ্বারা ঐ পরমাণুকে চেনা যায়। তাই পরমাণবিক সংখ্যাকে একটি মৌলের আইডি নাম্বারও বলা যায়। পারমাণবিক সংখ্যা 1 হলে ঐ পরমাণুটি হাইড্রোজেন, পারমাণবিক সংখ্যা 2 হলে ঐ পরমাণুটি হিলিয়াম। পারমাণবিক সংখ্যা 9 হলে ঐ পরমাণুটি ফ্লোরিন। অর্থাৎ পারমাণবিক সংখ্যাই কোনো পরমাণুর আসল পরিচয়। প্রোটন সংখ্যা বা পারমাণবিক সংখ্যাকে Z দিয়ে প্রকাশ করা হয়। যেহেতু প্রত্যেকটা পরমাণুই চার্জ নিরপেক্ষ অর্থাৎ মোট চার্জ বা আধান শূন্য তাই পরমাণুর নিউক্লিয়াসে যতটি প্রোটন থাকে নিউক্লিয়াসের বাইরে ঠিক ততটি ইলেকট্রন থাকে।

৩.৫.২ ভরসংখ্যা (Mass Number)

কোনো পরমাণুর নিউক্লিয়াসে উপস্থিত প্রোটন ও নিউট্রন সংখ্যার যোগফলকে ঐ পরমাণুর ভরসংখ্যা বলে। ভরসংখ্যাকে A দিয়ে প্রকাশ করা হয়। যেহেতু ভরসংখ্যা হলো প্রোটন সংখ্যা ও নিউট্রন সংখ্যার যোগফল, কাজেই ভরসংখ্যা থেকে প্রোটন সংখ্যা বিয়োগ করলে নিউট্রন সংখ্যা পাওয়া যায়। যেমন- সোডিয়ামের (Na) ভরসংখ্যা হলো 23, এর প্রোটন সংখ্যা 11, ফলে এর নিউট্রন সংখ্যা হচ্ছে 23 −11 = 12

কোনো পরমাণুর পারমাণবিক সংখ্যা পরমাণুর প্রতীকের নিচে বাম পাশে লেখা হয়, পরমাণুর ভরসংখ্যা প্রতীকের বাম পাশে উপরের দিকে লেখা হয়। যেমন– সোডিয়াম পরমাণুর প্রতীক Na, এর পারমাণবিক সংখ্যা 11 এবং ভরসংখ্যা 23। এটাকে নিম্নোক্তভাবে প্রকাশ করা যায়:

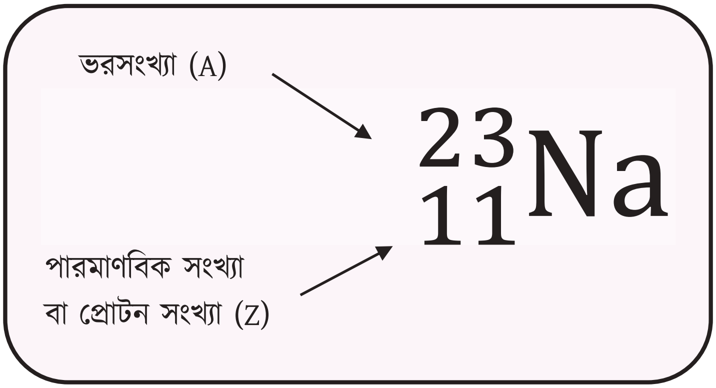

টেবিল ৩.০৬: মৌলের সংক্ষিপ্ত প্রকাশ

মৌলের প্রতীক	পারমাণবিক সংখ্যা বা প্রোটন সংখ্যা Z	ভরসংখ্যা A	ইলেকট্রন সংখ্যা	নিউট্রন সংখ্যা A - Z	সংক্ষিপ্ত প্রকাশ
H	1	1	1	0	$^{1}_{1}H$
He	2	4	2	2	$^{4}_{2}He$

একক কাজ

শিক্ষার্থীর কাজ: $^{7}_{3}Li$ এবং $^{9}_{4}Be$ মৌলের ভর সংখ্যা, প্রোটন সংখ্যা এবং ইলেকট্রন সংখ্যা গণনা করো।

৩.৬ পরমাণুর মডেল (Atomic Model)

৩.৬.১ রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেল

1911 খ্রিষ্টাব্দে বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড পরমাণুর গঠন সম্পর্কে একটি মডেল প্রদান করেন। এ মডেল অনুসারে-

(a) প্রত্যেকটি পরমাণুর একটি কেন্দ্র আছে। এই কেন্দ্রের নাম নিউক্লিয়াস। নিউক্লিয়াসের ভেতরে প্রোটন ও নিউট্রন এবং নিউক্লিয়াসের বাইরে ইলেকট্রন অবস্থান করে। যেহেতু আপেক্ষিকভাবে ইলেকট্রনের ভর শূন্য ধরা হয় কাজেই নিউক্লিয়াসের ভেতরে অবস্থিত প্রোটন এবং নিউট্রনের ভরই পরমাণুর ভর হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

(b) নিউক্লিয়াস অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং নিউক্লিয়াসের বাইরে ও পরমাণুর ভেতরে বেশির ভাগ জায়গাই ফাঁকা।

(c) সৌরজগতে সূর্যকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন কক্ষপথে যেমন গ্রহগুলো ঘুরে তেমনি নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন কক্ষপথে ইলেকট্রনগুলো ঘুরছে। কোনো পরমাণুর নিউক্লিয়াসে যে কয়টি প্রোটন থাকে নিউক্লিয়াসের বাইরে ঠিক সেই কয়টি ইলেকট্রন থাকে। যেহেতু প্রোটন এবং ইলেকট্রনের চার্জ একে অপরের সমান ও বিপরীত চিহ্নের, তাই পরমাণু সামগ্রিকভাবে চার্জ শূন্য।

(d) ধনাত্মক চার্জবাহী নিউক্লিয়াসের প্রতি ঋণাত্মক চার্জবাহী ইলেকট্রন এক ধরনের আকর্ষণ বল অনুভব করে। এই আকর্ষণ বল কেন্দ্রমুখী। এই কেন্দ্রমুখী বল এবং আবর্তনশীল ইলেক্ট্রনের কেন্দ্রবিমুখী বল পরস্পর সমান ও বিপরীতমুখী।

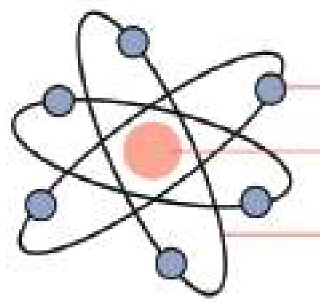

চিত্র ৩.০১: রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেল

রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেলকে সৌরজগতের সাথে তুলনা করা হয়েছে বলে এ মডেলটিকে সোলার সিস্টেম মডেল বা সৌর মডেল বলে। আবার, এ মডেলের মাধ্যমে বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড সর্বপ্রথম নিউক্লিয়াস সম্পর্কে ধারণা দেন বলে এ মডেলটিকে নিউক্লিয়ার মডেলও বলা হয়।

রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেলের সীমাবদ্ধতা

রাদারফোর্ডই সর্বপ্রথম নিউক্লিয়াস এবং ইলেকট্রনের কক্ষপথ সম্বন্ধে ধারণা দেন। তিনিই সর্বপ্রথম একটি গ্রহণযোগ্য পরমাণু মডেল প্রদান করলেও তার পরমাণু মডেলের কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল। সেগুলো হলো:

(a) এই মডেল ইলেকট্রনের কক্ষপথের আকার (ব্যাসার্ধ) ও আকৃতি সম্বন্ধে কোনো ধারণা দিতে পারেনি।

(b) সৌরজগতের সূর্য ও গ্রহগুলোর সামগ্রিকভাবে কোনো আধান বা চার্জ নেই কিন্তু পরমাণুতে ইলেকট্রন এবং নিউক্লিয়াসের আধান বা চার্জ আছে। কাজেই চার্জহীন সূর্য এবং গ্রহগুলোর সাথে চার্জযুক্ত নিউক্লিয়াস এবং ইলেকট্রনের তুলনা করা সঠিক নয়।

(c) একের অধিক ইলেকট্রনবিশিষ্ট পরমাণুতে ইলেকট্রনগুলো কীভাবে নিউক্লিয়াসের চারদিকে পরিভ্রমণ করে তার কোনো ধারণা এ মডেলে দেওয়া হয়নি।

(d) ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্বানুসারে ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণনের সময় ক্রমাগত শক্তি হারাতে থাকবে। ফলে ইলেকট্রনের ঘূর্ণন পথও ছোট হতে থাকবে এবং এক সময় ইলেকট্রনটি নিউক্লিয়াসে পতিত হবে। অর্থাৎ পরমাণুর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে। কিন্তু বাস্তবে সেটা ঘটে না অর্থাৎ ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্বানুসারে রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেল সঠিক নয়।

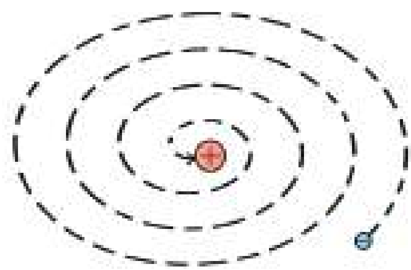

চিত্র ৩.০২: ইলেকট্রন শক্তি হারিয়ে নিউক্লিয়াসে পতিত হচ্ছে

৩.৬.২ বোর পরমাণু মডেল

রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেলের ত্রুটিগুলোকে সংশোধন করে 1913 খ্রিষ্টাব্দে বিজ্ঞানী নীল্‌স বোর পরমাণুর একটি মডেল প্রদান করেন। এই মডেলকে বোরের পরমাণু মডেল বলা হয়। বোর পরমাণু মডেলের মতবাদগুলো এরকম–

(a) পরমাণুতে যে সকল ইলেকট্রন থাকে সেগুলো নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ইচ্ছামতো যেকোনো কক্ষপথে ঘুরতে পারে না। শুধু নির্দিষ্ট ব্যাসার্ধের কতগুলো অনুমোদিত বৃত্তাকার কক্ষপথে ঘুরে। এই নির্দিষ্ট ব্যাসার্ধের অনুমোদিত বৃত্তাকার কক্ষপথগুলোকে প্রধান শক্তিস্তর বা শেল বা অরবিট বা স্থির কক্ষপথ বলে। স্থির কক্ষপথে ঘুরার সময় ইলেকট্রনগুলো কোনোরূপ শক্তি শোষণ বা বিকিরণ করে না। স্থির কক্ষপথকে n দ্বারা প্রকাশ করা হয়। $n = 1, 2, 3, 4$ ইত্যাদি। অন্যভাবে বলা যায়, $n = 1$ হলে K প্রধান শক্তিস্তর, $n = 2$ হলে L প্রধান শক্তিস্তর, $n = 3$ হলে M প্রধান শক্তিস্তর, $n = 4$ হলে N প্রধান শক্তিস্তর ইত্যাদি।

(b) বোর মডেল অনুসারে কোনো শক্তিস্তরে ইলেকট্রনের কৌণিক ভরবেগ

$$mvr = \frac{nh}{2\pi}$$

এখানে,

m হচ্ছে ইলেকট্রনের ভর (9.11×10^{-31} kg)

r হচ্ছে ইলেকট্রন যে কক্ষপথ বা শক্তিস্তরে ঘুরবে তার ব্যাসার্ধ

v হচ্ছে ইলেকট্রন যে কক্ষপথ বা শক্তিস্তরে ঘুরবে সেই কক্ষপথে ইলেকট্রনের বেগ

h হচ্ছে প্লাংক ধ্রুবক ($h = 6.626 \times 10^{-34}\ m^2\ kg/s$)

n হচ্ছে প্রধান শক্তিস্তর বা প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা (n = 1, 2, 3 ...... ইত্যাদি।)

এখানে যে শক্তিস্তরের n এর মান কম সেই শক্তিস্তর নিম্ন শক্তিস্তর এবং যে শক্তিস্তরের n এর মান বেশি সেই শক্তিস্তর উচ্চ শক্তিস্তর হিসেবে পরিচিত।

চিত্র ৩.০৩: বোরের পরমাণু মডেল

(c) কোনো প্রধান শক্তিস্তরে ঘূর্ণনের সময় ইলেকট্রন কোনো শক্তি শোষণ বা বিকিরণ করে না, তবে ইলেকট্রন যখন নিম্ন শক্তিস্তর থেকে উচ্চ শক্তিস্তর এ যায় তখন শক্তি শোষণ করে। আবার, ইলেকট্রন যখন উচ্চ শক্তিস্তর থেকে নিম্ন শক্তিস্তর এ যায় তখন শক্তি বিকিরণ হয়।

এই শোষিত বা বিকিরিত শক্তির পরিমাণ

$$h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

এখানে, c হচ্ছে আলোর বেগ ($3 \times 10^{8}\ ms^{-1}$)

ν হচ্ছে শোষিত বা বিকিরিত শক্তির কম্পাঙ্ক (একক s^{-1} বা Hz)

λ হচ্ছে শোষিত বা বিকিরিত শক্তির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য (একক m)

ইলেকট্রন উচ্চ শক্তিস্তর থেকে নিম্ন শক্তিস্তরে যাবার সময় যে আলো বিকিরণ করে তাকে প্রিজমের মধ্য দিয়ে Pass করালে পারমাণবিক বর্ণালির (atomic spectra) সৃষ্টি হয়।

বোরের পরমাণু মডেলের সাফল্য

(a) রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেল অনুসারে সৌরজগতে সূর্যকে কেন্দ্র করে গ্রহ-উপগ্রহগুলো যেমন ঘুরছে, পরমাণুতে ইলেকট্রনগুলোও তেমন নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। এখানে ইলেকট্রনের শক্তিস্তরের আকার সম্পর্কে কোনো কথা বলা হয়নি কিন্তু বোরের পারমাণবিক মডেলে পরমাণুর শক্তিস্তরের আকার বৃত্তাকার বলা হয়েছে।

(b) রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেলে পরমাণু শক্তি শোষণ করলে বা শক্তি বিকিরণ করলে পরমাণুর গঠনে কী ধরনের পরিবর্তন ঘটে সে কথা বলা হয়নি কিন্তু বোর পরমাণু মডেলে বলা হয়েছে পরমাণু শক্তি শোষণ করলে ইলেকট্রন নিম্ন শক্তিস্তর থেকে উচ্চ শক্তিস্তরে ওঠে। আবার, পরমাণু শক্তি বিকিরণ করলে ইলেকট্রন উচ্চ শক্তিস্তর থেকে নিম্ন শক্তিস্তরে নেমে আসে।

(c) রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেল অনুসারে কোনো মৌলের পারমাণবিক বর্ণালি ব্যাখ্যা করা যায় না কিন্তু বোরের পরমাণু মডেল অনুসারে এক ইলেকট্রন বিশিষ্ট পরমাণু, হাইড্রোজেন (H) এর বর্ণালি ব্যাখ্যা করা যায়।

বোরের পরমাণু মডেলের সীমাবদ্ধতা

বোর মডেলেরও কিছু সীমাবদ্ধতা বা ত্রুটি লক্ষ করা যায়। সেগুলো হচ্ছে:

(a) বোর মডেলের সাহায্যে এক ইলেকট্রন বিশিষ্ট পরমাণুর পারমাণবিক বর্ণালি ব্যাখ্যা করা যায় সত্যি কিন্তু একাধিক ইলেকট্রন বিশিষ্ট পরমাণুর পারমাণবিক বর্ণালি ব্যাখ্যা করা যায় না।

(b) বোরের পারমাণবিক মডেল অনুসারে এক শক্তিস্তর থেকে ইলেকট্রন অন্য শক্তিস্তরে গমন করলে পারমাণবিক বর্ণালিতে একটিমাত্র রেখা পাবার কথা। কিন্তু শক্তিশালী যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করলে দেখা যায় প্রতিটি রেখা অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখার সমষ্টি। প্রতিটি রেখা কেন অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখার সমষ্টি হয় বোর মতবাদ অনুসারে তার ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না।

(c) বোরের পরমাণুর মডেল অনুসারে পরমাণুতে শুধু বৃত্তাকার কক্ষপথ বিদ্যমান। কিন্তু পরে প্রমাণিত হয়েছে পরমাণুতে ইলেকট্রন শুধু বৃত্তাকার কক্ষপথেই নয় উপবৃত্তাকার কক্ষপথেও ঘুরে।

৩.৭ পরমাণুর শক্তিস্তরে ইলেকট্রন বিন্যাস (Orbital Electronic Configuration of Atoms)

বোরের মডেলে যে শক্তিস্তরের কথা বলা হয়েছে তাকে প্রধান শক্তিস্তর বলা হয়। প্রতিটি প্রধান শক্তিস্তরের সর্বোচ্চ ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা $2n^2$ যেখানে $n = 1, 2, 3, 4$ ইত্যাদি। অতএব এ সূত্রানুসারে:

K শক্তিস্তরের জন্য $n = 1$ অতএব

K শক্তিস্তরে সর্বোচ্চ ইলেকট্রন থাকতে পারে $2n^2 = (2 \times 1^2)$ টি = 2টি

L শক্তিস্তরের জন্য $n = 2$ অতএব

L শক্তিস্তরে সর্বোচ্চ ইলেকট্রন থাকতে পারে $2n^2 = (2 \times 2^2)$ টি = 8টি

M শক্তিস্তরের জন্য $n = 3$ অতএব

M শক্তিস্তরে সর্বোচ্চ ইলেকট্রন থাকতে পারে $2n^2 = (2 \times 3^2)$ টি = 18টি

N শক্তিস্তরের জন্য $n = 4$ অতএব

N শক্তিস্তরে সর্বোচ্চ ইলেকট্রন থাকতে পারে $2n^2 = (2 \times 4^2)$ টি = 32টি

টেবিল ৩.০৭: মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস [H(1) থেকে Zn(30) পর্যন্ত]

পারমাণবিক সংখ্যা	মৌল	K	L	M	N
1	H	1			
2	He	2			
3	Li	2	1		
4	Be	2	2		
5	B	2	3		
6	C	2	4		
7	N	2	5		
8	O	2	6		
9	F	2	7		
10	Ne	2	8		
11	Na	2	8	1	
12	Mg	2	8	2	
13	Al	2	8	3	
14	Si	2	8	4	
15	P	2	8	5	

পারমাণবিক সংখ্যা	মৌল	K	L	M	N
16	S	2	8	6	
17	Cl	2	8	7	
18	Ar	2	8	8	
19	K	2	8	8	1
20	Ca	2	8	8	2
21	Sc	2	8	9	2
22	Ti	2	8	10	2
23	V	2	8	11	2
24	Cr	2	8	13	1
25	Mn	2	8	13	2
26	Fe	2	8	14	2
27	Co	2	8	15	2
28	Ni	2	8	16	2
29	Cu	2	8	18	1
30	Zn	2	8	18	2

হাইড্রোজেনের (H) পারমাণবিক সংখ্যা 1। ফলে এর ইলেকট্রন সংখ্যাও 1। তাই একটি ইলেকট্রন প্রথম শক্তিস্তর K-তে প্রবেশ করবে।

হিলিয়ামের (He) পারমাণবিক সংখ্যা 2। অতএব এর ইলেকট্রন সংখ্যাও 2 এবং এই ইলেকট্রন দুটি প্রথম শক্তিস্তর K-তে প্রবেশ করবে। লিথিয়ামের (Li) পারমাণবিক সংখ্যা 3। অতএব এর ইলেকট্রন সংখ্যাও 3 এবং ইলেকট্রন তিনটির প্রথম 2টি শক্তিস্তর K-তে প্রবেশ করবে। যেহেতু K প্রধান শক্তিস্তরে দুটির বেশি ইলেকট্রন থাকতে পারে না তাই এর তৃতীয় ইলেকট্রনটি দ্বিতীয় শক্তিস্তর L এতে প্রবেশ করবে।

অনুরূপভাবে, সোডিয়ামের (Na) পারমাণবিক সংখ্যা 11। তাই এর ইলেকট্রন সংখ্যাও 11, এই ইলেকট্রনগুলো 2টি K শক্তিস্তরে, 8টি L প্রধান শক্তিস্তরে এবং বাকি 1টি ইলেকট্রন M শক্তিস্তরে প্রবেশ করবে।

৩.০৭ নং তালিকায় উপস্থাপিত ইলেকট্রন বিন্যাস ভালোভাবে খেয়াল করলে দেখতে পাবে হাইড্রোজেন (H) থেকে আর্গন (Ar) পর্যন্ত ইলেকট্রন বিন্যাস উপরে যে নিয়ম বর্ণনা করা হয়েছে সেই নিয়ম অনুসারে হয়েছে। কিন্তু নিয়মটির ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায় পটাশিয়াম (K) থেকে পরবর্তী মৌলগুলোতে।

আমরা জানি তৃতীয় শক্তিস্তর (M) এর সর্বোচ্চ ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা 18টি। কিন্তু পটাশিয়ামের 19তম ইলেকট্রন এবং ক্যালসিয়ামের (Ca) 19তম ও 20তম ইলেকট্রন তৃতীয় শক্তিস্তর (M) কে অপূর্ণ রেখে চতুর্থ (N) শক্তিস্তরে প্রবেশ করেছে।

স্ক্যানডিয়ামের (Sc) ক্ষেত্রে 19তম ও 20তম ইলেকট্রন দুটি চতুর্থ শক্তিস্তরে যাবার পর 21তম ইলেকট্রনটি আবার তৃতীয় শক্তিস্তরে প্রবেশ করেছে। পারমাণবিক সংখ্যা 19 থেকে পরবর্তী মৌলগুলোতে আগে চতুর্থ প্রধান শক্তিস্তর N এ দুটি ইলেকট্রন প্রবেশ করার পর ইলেকট্রন তৃতীয় প্রধান শক্তিস্তর M এ প্রবেশ করে।

এরপরও Cr এর ইলেকট্রন বিন্যাসে বিশেষ ব্যতিক্রম লক্ষ করা যাচ্ছে। এই বিষয়টি বোঝার জন্য আমাদের উপশক্তিস্তরের ধারণা থাকতে হবে।

৩.৭.১ উপশক্তিস্তরের ধারণা

আমরা দেখেছি প্রতিটি প্রধান শক্তিস্তরকে n দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। এই শক্তিস্তরগুলো আবার কতগুলো উপশক্তিস্তরে বিভক্ত থাকে এবং এই উপশক্তিস্তরকে l দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। l এর মান হয় 0 থেকে n -1 পর্যন্ত হয়। উপশক্তিস্তরগুলোকে অরবিটাল বলা হয়। এই উপশক্তিস্তর বা অরবিটালগুলোকে s, p, d, f ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করা হয়। বিভিন্ন উপশক্তিস্তরের জন্য সম্ভাব্য l এর মান নিচে দেখানো হলো-

n = 1 হলে l = 0 এবং অরবিটালের সংখ্যা একটি: 1s

n = 2 হলে l = 0, 1 এক্ষেত্রে অরবিটালের সংখ্যা দুটি: 2s, 2p

n = 3 হলে l = 0, 1, 2 অতএব এক্ষেত্রে অরবিটালের সংখ্যা তিনটি: 3s, 3p, 3d

n = 4 হলে l = 0, 1, 2, 3 অর্থাৎ এক্ষেত্রে অরবিটালের সংখ্যা চারটি: 4s, 4p, 4d, 4f

n = 5 হলে l = 0, 1, 2, 3, 4 অর্থাৎ এখানে অরবিটাল থাকার কথা পাঁচটি কিন্তু 4s, 4p, 4d, 4f

এই প্রথম চারটি অরবিটালেই সবগুলো ইলেকট্রনের বিন্যাস করা সম্ভব বলে পরবর্তী অরবিটালের আর প্রয়োজন হয় না। n = 6, 7 এবং 8 এর ক্ষেত্রেও এ নিয়মে ইলেকট্রন বিন্যাস ঘটে।
প্রতিটি অরবিটালে ইলেকট্রন সংখ্যা হচ্ছে: $2(2l + 1)$।

আমরা এর মাঝে জেনে গেছি প্রতিটি পূর্ণ শক্তিস্তরে ইলেকট্রনের সংখ্যা হচ্ছে $2n^2$।
এবার তোমরা দেখবে সবগুলো অরবিটালের ইলেকট্রনের সংখ্যা যোগ করে আমরা $2n^2$ সংখ্যক ইলেকট্রন পাই কি না নিচের তালিকায় সেটি দেখানো হলো।

টেবিল ৩.০৮: শক্তিস্তরে ইলেকট্রন বিন্যাস (n = 1 থেকে 4 পর্যন্ত)

শক্তিস্তর n	শক্তিস্তর অনুযায়ী উপশক্তিস্তর l-এর মান	l অনুযায়ী অরবিটালের নাম	অরবিটালের প্রতীক	অরবিটালে মোট ইলেকট্রন সংখ্যা $2(2l + 1)$	শক্তিস্তরে মোট ইলেকট্রন সংখ্যা $2n^2$
1	0	s	1s	2	2
2	0	s	2s	2	2 + 6 = 8
	1	p	2p	6	
3	0	s	3s	2	2 + 6 + 10 = 18
	1	p	3p	6	
	2	d	3d	10	
4	0	s	4s	2	2 + 6 + 10 + 14 = 32
	1	p	4p	6	
	2	d	4d	10	
	3	f	4f	14	

৩.৭.২ পরমাণুতে ইলেকট্রন বিন্যাসের নীতি

পরমাণুতে ইলেকট্রন বিন্যাসের তিনটি নীতি আছে। এগুলো হলো : ১) পাওলির বর্জন নীতি, ২) আউফ-বাউ নীতি এবং ৩) হুন্ডস এর সূত্র। এই নীতিগুলোর আলোচনা তোমরা উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির রসায়ন বই এ পাবে। এখানে এই নীতিগুলোর মূল ধারণা নিয়ে পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাস সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

পরমাণুতে ইলেকট্রন প্রথমে সর্বনিম্ন শক্তির অরবিটালে প্রবেশ করে এবং পরে ক্রমান্বয়ে উচ্চশক্তির অরবিটালে প্রবেশ করে। অর্থাৎ যে অরবিটালের শক্তি কম সেই অরবিটালে ইলেকট্রন আগে প্রবেশ করবে এবং যে অরবিটালের শক্তি বেশি সেই অরবিটালে ইলেকট্রন পরে প্রবেশ করবে। অরবিটালের মধ্যে কোনোটির শক্তি কম আর কোনোটির শক্তি বেশি তা অরবিটাল দুটির প্রধান শক্তিস্তরের মান (n) এবং উপশক্তিস্তরের মান (l) এর যোগফলের উপর নির্ভর করে। যে অরবিটালের $(n + l)$ এর মান কম সেই অরবিটালের শক্তি কম এবং সেই অরবিটালেই ইলেকট্রন আগে প্রবেশ করবে। অপরদিকে $(n + l)$ এর মান যে অরবিটালের বেশি তার শক্তিও বেশি এবং সেই অরবিটালেই ইলেকট্রন পরে প্রবেশ করবে।

3d অরবিটালের জন্য $n = 3$ এবং $l = 2$ অতএব $n + l$ এর মান $3 + 2 = 5$ আবার 4s অরবিটালের জন্য $n = 4$, $l = 0$ অতএব $n + l$ এর মান $4 + 0 = 4$

কাজেই 3d অরবিটালের চেয়ে 4s অরবিটাল কম শক্তিসম্পন্ন। তাই ইলেকট্রন প্রথমে 4s অরবিটালে এবং পরে 3d অরবিটালে প্রবেশ করবে। আবার, দুটি অরবিটালের $(n + l)$ এর মান যদি সমান হয় তাহলে যে অরবিটালটিতে n এর মান কম সেই অরবিটালের শক্তি কম হবে এবং সেই অরবিটালে ইলেকট্রন আগে প্রবেশ করবে।

যেমন- 3d ও 4p এর $n + l$ এর মান যথাক্রমে $3 + 2 = 5$ এবং $4 + 1 = 5$ কিন্তু যেহেতু 3d অরবিটালে n এর মান কম, তাই এ অরবিটালের শক্তি কম এবং এ অরবিটালে ইলেকট্রন আগে প্রবেশ করবে। অপরদিকে 4p অরবিটালে n এর মান বেশি হওয়ায় এর শক্তি 3d এর চেয়ে বেশি। তাই এ অরবিটালে ইলেকট্রন পরে প্রবেশ করবে।

এ হিসাব অনুযায়ী পরমাণুর অরবিটালের ক্রমবর্ধমান শক্তি হবে এরকম :

$$1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p < 5s < 4d < 5p$$
$$< 6s < 4f < 5d < 6p < 7s < 5f < 6d < 7p < 8s$$

উপস্তরগুলোর শক্তির ক্রমগুলো মনে রাখার জন্য ৩.০৪ নং চিত্রে উপস্থাপিত ছকটির সাহায্য নেওয়া যায়:

আমরা দেখেছি s উপশক্তিস্তরে সর্বোচ্চ 2টি ইলেকট্রন, p উপশক্তিস্তরে সর্বোচ্চ 6টি ইলেকট্রন, d উপশক্তিস্তরে সর্বোচ্চ 10টি ইলেকট্রন এবং f উপশক্তিস্তরে সর্বোচ্চ 14টি ইলেকট্রন থাকতে পারে।

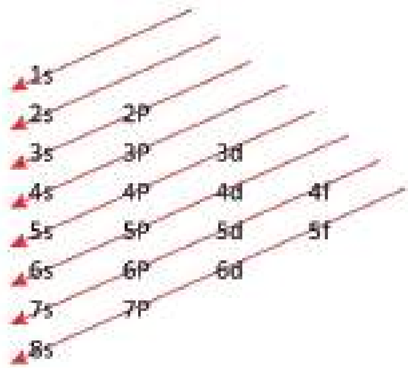

চিত্র ৩.০৪: অরবিটালের শক্তিক্রম

এই নীতি অনুসারে আমরা নিম্নের মৌলগুলোর ইলেকট্রন বিন্যাস বিশ্লেষণ করতে পারব।

$K(19) \rightarrow 1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^1$

$Ca(20) \rightarrow 1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2$

$Sc(21) \rightarrow 1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^1\ 4s^2$

$Ti(22) \rightarrow 1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^2\ 4s^2$

যেহেতু 4s অরবিটালের শক্তি 3d অরবিটালের শক্তির চেয়ে কম, তাই পটাশিয়ামের সর্বশেষ 19তম ইলেকট্রনটি 3d অরবিটালে প্রবেশ না করে 4s অরবিটালে প্রবেশ করে। আবার, স্ক্যান্ডিয়ামের ক্ষেত্রে

19তম ও 20তম ইলেকট্রন দুটি 4s অরবিটাল পূর্ণ করে 21তম ইলেকট্রনটি পরবর্তী উচ্চ শক্তি সম্পন্ন (3d) অরবিটালে প্রবেশ করে।

বিশেষ করে মনে রাখতে হবে যে যখন ইলেকট্রন বিন্যাস লিখবে তখন একই প্রধান শক্তিস্তরের সকল উপশক্তিস্তর পাশাপাশি লিখবে। তা না হলে ইলেকট্রনের বিন্যাস লেখার সময় ভুল হয়ে যেতে পারে। যেমন Fe(26) এর জন্য:

	n = 1	n = 2	n = 3	n = 4
Fe(26)→	$1s^2$	$2s^2\ 2p^6$	$3s^2\ 3p^6\ 3d^6$	$4s^2$

$$Fe(26) \rightarrow 1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^6\ 4s^2$$

যদিও এক্ষেত্রে 4s অরবিটালে ইলেকট্রন 3d অরবিটালের আগে প্রবেশ করে।

৩.৭.৩ ইলেকট্রন বিন্যাসের সাধারণ নিয়মের কিছু ব্যতিক্রম

সাধারণভাবে দেখা যায় যে, একই উপশক্তিস্তর p ও d এর অরবিটালগুলো অর্ধেক পূর্ণ (p^3, d^5) বা সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ (p^6, d^{10}) হলে সে ইলেকট্রন বিন্যাস সুস্থিত হয়। তাই Cr(24) এর ইলেকট্রন বিন্যাস স্বাভাবিকভাবে হওয়ার কথা: Cr(24)→ $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^4\ 4s^2$ কিন্তু $3d^5$ অরবিটাল সুস্থিত অর্ধপূর্ণ হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় 4s অরবিটাল হতে একটি ইলেকট্রন 3d অরবিটালে আসে। ফলে ক্রোমিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস হয় এরকম: Cr(24) →$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6 3d^5\ 4s^1$

একক কাজ

নিজে করো: Cu(29) এর ইলেকট্রন বিন্যাস স্বাভাবিকভাবে হওয়ার কথা: Cu(29) →$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^9\ 4s^2$ কিন্তু কপারের ইলেকট্রন বিন্যাস হয় এরকম: Cu(29) →$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6 3d^{10}\ 4s^1$, কারণটি ব্যাখ্যা করো।

৩.৮ আইসোটোপ (Isotopes)

যে সকল পরমাণুর প্রোটন সংখ্যা সমান কিন্তু ভরসংখ্যা ও নিউট্রন সংখ্যা ভিন্ন তাদেরকে একে অপরের আইসোটোপ বলে। ৩.০৯ নং টেবিলে দেখানো তিনটি H পরমাণুরই প্রোটন সংখ্যা সমান। কাজেই তারা একে অপরের আইসোটোপ। হাইড্রোজেনের সাতটি আইসোটোপ (^1H, ^2H, ^3H, ^4H, ^5H, ^6H এবং ^7H) আছে। এর মধ্যে শুধু তিনটি প্রকৃতিতে পাওয়া যায়, অন্যগুলোকে ল্যাবরেটরিতে প্রস্তুত করা হয়।

টেবিল ৩.০৯: হাইড্রোজেনের তিনটি প্রাকৃতিক আইসোটোপ

নাম	প্রতীক	প্রোটন সংখ্যা Z	ভর সংখ্যা A	নিউট্রন সংখ্যা A - Z
হাইড্রোজেন বা প্রোটিয়াম	${}^{1}_{1}H$	1	1	0
ডিউটেরিয়াম	${}^{2}_{1}D$	1	2	1
টিট্রিয়াম	${}^{3}_{1}T$	1	3	2

এখানে ডিউটেরিয়াম ও ট্রিটিয়াম হাইড্রেজেন পরমাণুর আইসোটোপ।

৩.৯ পারমাণবিক ভর বা আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর (Atomic Mass or Relative Atomic Mass)

আমরা আগেই জেনেছি যে, কোনো মৌলের পরমাণুর ভরসংখ্যা হলো পরমাণুর নিউক্লিয়াসে উপস্থিত প্রোটন ও নিউট্রন সংখ্যার যোগফল। তাহলে ভরসংখ্যা নিশ্চয়ই হবে একটি পূর্ণসংখ্যা। কিন্তু তুমি যদি কপারের পারমাণবিক ভর দেখো তাহলে দেখবে সেটি হচ্ছে 63.5 আর ক্লোরিনের পারমাণবিক ভর হলো 35.5। এটা কীভাবে সম্ভব? আসলে এটি হলো আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর। সেটি কী বা তার দরকারই বা কী? নিচে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর আলোচনা করা হলো।

ফ্লোরিনের একটি পরমাণুর ভর হলো 3.16×10^{-23} গ্রাম।
অ্যালুমিনিয়ামের একটি পরমাণুর ভর 4.482×10^{-23} গ্রাম।

কার্যক্ষেত্রে এত কম ভর ব্যবহার করা অনেক সমস্যা। সেজন্য একটি কার্বন 12 আইসোটোপের ভরের $\frac{1}{12}$ অংশকে একক হিসেবে ধরে তার সাপেক্ষে পরমাণুর ভর মাপা হয়।

কার্বন 12 আইসোটোপের পারমাণবিক ভরের $\frac{1}{12}$ অংশ হচ্ছে 1.66×10^{-24} গ্রাম

কাজেই কোনো মৌলের আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর হচ্ছে:

$$\frac{\text{মৌলের একটি পরমাণুর ভর}}{\text{একটি কার্বন 12 আইসোটোপের পারমাণবিক ভরের } \frac{1}{12} \text{ অংশ}}$$

কোনো মৌলের একটি পরমাণুর প্রকৃত ভর জানা থাকলে আমরা আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর বের করতে পারব। এক্ষেত্রে ঐ মৌলের একটি পরমাণুর প্রকৃত ভরকে 1.66×10^{-24} গ্রাম দ্বারা ভাগ করে আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর বের করা যায়।

একক কাজ:

নিজে করো: Al এর 1টি পরমাণুর ভর 4.482×10^{-23} গ্রাম। Al পরমাণুর আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর গণনা করে দেখাও।

প্রশ্ন অনুসারে Al এর একটি পরমাণুর ভর = 4.482×10^{-23} গ্রাম। আমরা জানি, কার্বন-12 আইসোটোপে পারমাণবিক ভরের $\frac{1}{12}$ অংশ হলো, 1.66×10^{-24}g

কাজেই Al মৌলের আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর = $\frac{4.482 \times 10^{-23}\text{গ্রাম}}{1.66 \times 10^{-24}\text{গ্রাম}} = 27$

কোনো মৌলের আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর হলো দুটি ভরের অনুপাত, সেজন্য আপেক্ষিক পারমাণবিক ভরের কোনো একক থাকে না।

৩.৯.১ আইসোটোপের শতকরা হার থেকে মৌলের গড় আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর

প্রকৃতিতে বেশির ভাগ মৌলেরই একাধিক আইসোটোপ রয়েছে। তাই যে মৌলের একাধিক আইসোটোপ আছে সেই মৌলের সকল আইসোটোপের প্রকৃতিতে প্রাপ্ত শতকরা হার থেকে মৌলের গড় আপেক্ষিক ভর এর মান গণনা করতে নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করা হয়।

ধাপ 1: প্রথমে কোনো মৌলের প্রত্যেকটি আইসোটোপের ভরসংখ্যা এবং প্রকৃতিতে প্রাপ্ত ঐ আইসোটোপের শতকরা পরিমাণ গুণ দিতে হবে।

ধাপ 2: প্রাপ্ত গুণফলগুলোকে যোগ করতে হবে।

ধাপ 3: প্রাপ্ত যোগফলকে 100 দ্বারা ভাগ করলেই ঐ মৌলের গড় আপেক্ষিক ভর পাওয়া যাবে।

যেমন- ধরা যাক একটি মৌল A এর দুটি আইসোটোপ আছে। একটি আইসোটোপের ভরসংখ্যা p, প্রকৃতিতে প্রাপ্ত ঐ আইসোটোপের শতকরা পরিমাণ m, অপর আইসোটোপের ভরসংখ্যা q এবং প্রকৃতিতে প্রাপ্ত ঐ আইসোটোপের শতকরা পরিমাণ n তাহলে

মৌল A এর গড় আপেক্ষিক পরমাণবিক ভর = $\frac{p \times m + q \times n}{100}$

উদাহরণ: প্রকৃতিতে ক্লোরিনের 2টি আইসোটোপ আছে ^{35}Cl এবং ^{37}Cl।

প্রকৃতিতে প্রাপ্ত ^{35}Cl এর শতকরা পরিমাণ 75% এবং
প্রকৃতিতে প্রাপ্ত ^{37}Cl এর শতকরা পরিমাণ 25%

অতএব, ক্লোরিনের গড় আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর = $\frac{35 \times 75 + 37 \times 25}{100}$ = 35.5

এখানে উল্লেখ্য, পর্যায় সারণিতেও ক্লোরিনের গড় আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর 35.5 লেখা আছে। পর্যায় সারণিতে যে পারমাণবিক ভর লেখা আছে তা মূলত গড় আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর।

মৌলের গড় আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর নির্ণয়ের প্রয়োগ

মৌলের গড় আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর থেকে আইসোটোপের শতকরা পরিমাণ নির্ণয়: প্রকৃতিতে যদি কোনো মৌলের দুটি আইসোটোপ থাকে তাহলে সেই মৌলের গড় আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর থেকে ঐ মৌলের বিভিন্ন আইসোটোপের প্রকৃতিতে প্রাপ্ত শতকরা পরিমাণ নির্ণয় করা যায়।

উদাহরণ:

প্রকৃতিতে কপারের দুটি আইসোটোপ আছে ^{63}Cu এবং ^{65}Cu। কপারের গড় পারমাণবিক আপেক্ষিক ভর 63.5।

ধরা যাক, প্রকৃতিতে প্রাপ্ত ^{63}Cu এর শতকরা পরিমাণ $x\%$ এবং প্রকৃতিতে প্রাপ্ত ^{65}Cu এর শতকরা পরিমাণ $(100 - x)\%$

এখানে, কপারের গড় আপেক্ষিক পরমাণবিক ভর = $\dfrac{x \times 63 + (100 - x) \times 65}{100} = 63.5$

বা, $x = 75\%$

প্রকৃতিতে প্রাপ্ত ^{63}Cu এর শতকরা পরিমাণ = 75 % এবং

প্রকৃতিতে প্রাপ্ত ^{65}Cu এর শতকরা পরিমাণ (100-75)% = 25%

৩.৯.২ আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর থেকে আপেক্ষিক আণবিক ভর নির্ণয়

কোনো মৌলিক বা যৌগিক পদার্থের অণুতে যে পরমাণুগুলো থাকে তাদের আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর নিজ নিজ পরমাণু সংখ্যা দিয়ে গুণ করে যোগ করলে প্রাপ্ত যোগফলই হলো ঐ অণুর আপেক্ষিক আণবিক ভর। আপেক্ষিক পারমাণবিক ভরকে পারমাণবিক ভর এবং আপেক্ষিক আণবিক ভরকে সাধারণভাবে আণবিক ভর হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

উদাহরণ - ১

H_2 অণুতে হাইড্রোজেন (H) পরমাণুর আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর হলো 1 এবং পরমাণুর সংখ্যা– 2 তাই H_2 অণুর আপেক্ষিক আণবিক ভর হবে: $1 \times 2 = 2$

উদাহরণ - ২

H_2SO_4 অণুতে উপস্থিত হাইড্রোজেন (H) এর আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর 1 এবং পরমাণু সংখ্যা 2, সালফার (S) পরমাণুর আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর 32 এবং পরমাণুর সংখ্যা 1 এবং অক্সিজেন পরমাণুর আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর 16 এবং পরমাণুর সংখ্যা 4। অতএব, H_2SO_4 এর আপেক্ষিক আণবিক ভর হবে $1 \times 2 + 32 \times 1 + 16 \times 4 = 98$

২০২৬

৩.১০ তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ও তাদের ব্যবহার (Radioactive Isotopes and Their Uses)

এই অধ্যায়ে আমরা আইসোটোপ সম্পর্কে জেনেছি। কিছু কিছু আইসোটোপ আছে যাদের নিউক্লিয়াস স্বতঃস্ফূর্তভাবে (নিজে নিজেই) ভেঙে আলফা, বিটা, গামা ইত্যাদি তেজস্ক্রিয় রশ্মি নির্গত করে। একটি মৌলের যে সকল আইসোটোপ তেজস্ক্রিয় রশ্মি নিঃসরণ করে তাদেরকে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ বলে। এখন পর্যন্ত এ ধরনের আইসোটোপের সংখ্যা 3000 থেকে বেশি। এদের মধ্যে কিছু প্রকৃতিতে পাওয়া গেছে, অন্যগুলো গবেষণাগারে তৈরি করা হয়েছে। বিভিন্ন আইসোটোপ এবং তাদের তেজস্ক্রিয়তা নিয়ে তোমাদের পদার্থবিজ্ঞান বইয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তাই এখানে শুধু তাদের কিছু ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করা হলো।

তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ এর নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার দিয়ে মানুষ অনেক কিছু করতে পারে যেটি অন্যভাবে করা দুঃসাধ্য ছিল। বর্তমানে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ চিকিৎসাক্ষেত্রে, কৃষিক্ষেত্রে, খাদ্য ও বীজ সংরক্ষণে, বিদ্যুৎ উৎপাদনে, কোনো কিছুর বয়স নির্ণয়সহ আরও অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।

৩.১০.১ চিকিৎসাক্ষেত্রে

চিকিৎসাক্ষেত্রে বর্তমানে বিভিন্ন প্রয়োজনে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহার করা হচ্ছে। যেমন:

রোগ নির্ণয়ে

আইসোটোপ ব্যবহার করে একজন রোগীর রোগাক্রান্ত স্থানের ছবি তোলা সম্ভব। এ পদ্ধতিতে ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ টেকনিশিয়াম-99 (^{99}Tc) কে শরীরের ভেতরে প্রবেশ করানো হয়। এই আইসোটোপ যখন শরীরের নির্দিষ্ট স্থানে জমা হয় তখন ঐ তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ গামা রশ্মি বিকিরণ করে, তখন বাইরে থেকে গামা রশ্মি শনাক্তকরণ ক্যামেরা দিয়ে সেই স্থানের ছবি তোলা সম্ভব। এই তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ টেকনিশিয়াম-99 এর লাইফটাইম 6 ঘণ্টা। তাই সামান্য সময়েই এর তেজস্ক্রিয়তা শেষ হয়ে যায় বলে এটি অনেক নিরাপদ।

রোগ নিরাময়ে

সর্বপ্রথম থাইরয়েড ক্যানসার নিরাময়ে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহার করা হয়। রোগীকে পরিমাণমতো তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ^{131}I সমৃদ্ধ দ্রবণ পান করানো হয়। এই আইসোটোপ থাইরয়েডে পৌঁছায়। এ আইসোটোপ থেকে বিটা রশ্মি নির্গত হয় এবং থাইরয়েডের ক্যানসার কোষকে ধ্বংস করে। এছাড়া ইরিডিয়াম আইসোটোপ ব্রেইন ক্যানসার নিরাময়ে ব্যবহার করা হয়। টিউমারের উপস্থিতি নির্ণয় ও নিরাময়ে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ^{60}Co ব্যবহার করা হয়। ^{60}Co থেকে নির্গত গামা রশ্মি ক্যানসারের কোষকলাকে ধ্বংস করে। রক্তের লিউকোমিয়া রোগের চিকিৎসায় ^{32}P এর ফসফেট ব্যবহার করা হয়।

৩.১০.২ কৃষিক্ষেত্রে

ফসলের পুষ্টিতে

ফসলের পুষ্টির জন্য জমিতে পরিমাণমতো সার ব্যবহার করতে হয়। সার মূল্যবান বস্তু। তাই অতিরিক্ত ব্যবহার করা আর্থিক ক্ষতির কারণ। একদিকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সার ব্যবহার পরিবেশের ক্ষতির কারণ, অপরদিকে প্রয়োজনের চেয়ে কম পরিমাণ সার ব্যবহার করা হলে ফসলের উৎপাদন কম হয়। তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহার করে জমিতে কী পরিমাণ নাইট্রোজেন ও ফসফরাস আছে তা জানা যায়। আর তা জেনে জমিতে আরও কী পরিমাণ নাইট্রোজেন ও ফসফরাস দিতে হবে তারও হিসাব করা যায়। উদ্ভিদ মূলের মাধ্যমে তেজস্ক্রিয় নাইট্রোজেন ও তেজস্ক্রিয় ফসফরাস গ্রহণ করে এবং তা উদ্ভিদের শরীরের বিভিন্ন অংশে শোষিত হয়। এসব তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ থেকে তেজস্ক্রিয় রশ্মি নির্গত হয়। গাইগার মুলার কাউন্টার ব্যবহার করে এ তেজস্ক্রিয় রশ্মি শনাক্ত ও পরিমাপ করা হয়।

ক্ষতিকারক পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণ করতে

ফসলের জন্য ক্ষতিকারক পোকামাকড় সব সময়ই মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। এগুলো যেমন ফসলের উৎপাদন কমায় তেমনই এদের মাধ্যমে রোগজীবাণুও উদ্ভিদে প্রবেশ করে। এসব পোকামাকড় ধ্বংস করার জন্য ফসলে এবং জমিতে কীটনাশক দেওয়া হয়। এ কীটনাশক পরিবেশ ও আমাদের শরীরের জন্য ক্ষতিকর। শুধু তাই নয়, এ কীটনাশক ক্ষতিকারক পোকামাকড়ের সাথে সাথে অনেক উপকারী পোকামাকড়ও ধ্বংস করে। তেজস্ক্রিয় আইসোটোপসমৃদ্ধ কীটনাশক ব্যবহারের মাধ্যমে জানা সম্ভব হয়েছে সর্বনিম্ন কতটুকু পরিমাণ কীটনাশক একটি ফসলের জন্য ব্যবহার করা যাবে।

ফসলের মানোন্নয়নে

বিভিন্ন ধরনের তেজস্ক্রিয় রশ্মির নিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের মাধ্যমে উদ্ভিদ কোষের জিনগত পরিবর্তন ঘটিয়ে উন্নত মানের ফসল উৎপাদন করা হয়।

৩.১০.৩ বিদ্যুৎ উৎপাদনে

কিছু কিছু পরমাণুকে ভেঙে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরমাণুতে পরিণত করলে অর্থাৎ ফিশান বিক্রিয়া ঘটালে প্রচুর পরিমাণে তাপশক্তি নির্গত হয়। এই তাপশক্তি ব্যবহার করে জেনারেটর দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়। আমরা সেটিকে নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎকেন্দ্র বলি। তোমাদের পদার্থবিজ্ঞান বইয়ের চতুর্থ অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

বাংলাদেশে পাবনা জেলার রূপপুরে বাংলাদেশ সরকার পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করেছে। এ পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে দুই হাজার চারশ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব।

চিত্র ৩.০৫: পাবনার রূপপুর নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎকেন্দ্র

৩.১০.৪ তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের ক্ষতিকর প্রভাব

তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ আমাদের অনেক উপকারে আসে সে কথা সত্যি কিন্তু এটি আমাদের জন্য ক্ষতির কারণও হতে পারে। তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ থেকে যে আলফা, বেটা ও গামা রশ্মি নির্গত হয় তা কোষের জিনগত পরিবর্তন ঘটাতে পারে যার ফলাফল হিসেবে ক্যানসারের মতো রোগ হতে পারে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটেছিল, তার জন্য কয়েক লক্ষ জীবন ধ্বংস হয়েছে। 1986 সালে রাশিয়ার চেরোনোবিলে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে যে দুর্ঘটনা ঘটেছিল তার ফলে অনেকে প্রাণ হারিয়েছে এবং ঐ এলাকায় পরিবেশ দূষণ ঘটেছে।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. পরমাণুর N শেলে কয়টি উপশক্তিস্তর থাকে?

(ক) ১ (খ) ২

(গ) ৩ (ঘ) 8

২. Sc এর M শেলে কয়টি ইলেকট্রন থাকে?

(ক) 8 (খ) 9

(গ) 10 (ঘ) 11

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৩ ও 8 নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

আইসোটোপ	পর্যাপ্ততার শতকরা পরিমাণ
^{146}X	25
^{154}X	75

এখানে X প্রতীকী অর্থে, প্রচলিত কোনো মৌলের প্রতীক নয়

৩. X এর পারমাণবিক সংখ্যা 63 হলে ^{146}X এর নিউট্রন সংখ্যা কত?

(ক) 83 (খ) 91

(গ) 90 (ঘ) 93

8. 'X' মৌলটির আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর কত?

(ক) 148 (খ) 150

(গ) 152 (ঘ) 153

৫. কোনো মৌলের একটি পরমাণুর প্রকৃত ভর 4.482×10^{-23} গ্রাম হলে এর আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর কত?

(ক) 25 (খ) 40

(গ) 29 (ঘ) 27

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.

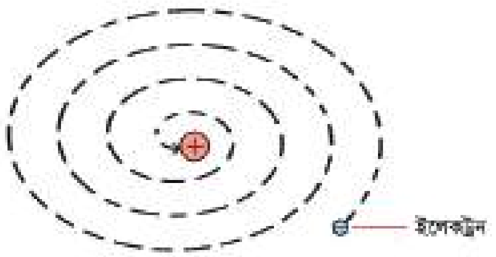

দৃশ্যকল্প- ১

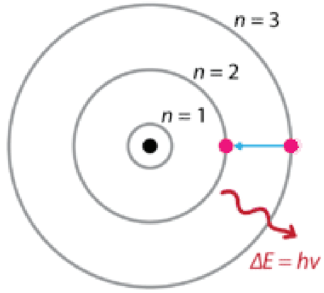

দৃশ্যকল্প- ২

(ক) পারমাণবিক সংখ্যা কাকে বলে?

(খ) পরমাণু চার্জ নিরপেক্ষ কেন? ব্যাখ্যা করো।

(গ) দৃশ্যকল্প- ১ পরমাণুর কোন মডেলের সীমাবদ্ধতা নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো।

(ঘ) কোন দৃশ্যকল্পের তথ্যের সাহায্যে পারমাণবিক বর্ণালি ব্যাখ্যা করা যায়? বিশ্লেষণ করো।

২. নিচের উদ্দীপকের আলোকে প্রশ্নের উত্তর দাও :

আইসোটোপ	প্রকৃতিতে প্রাপ্তির শতকরা পরিমাণ
^{20}X	90.92
^{21}X	0.25
^{22}X	8.82
Y (পারমাণবিক সংখ্যা-11)	

(ক) মৌলিক পদার্থ কাকে বলে?

(খ) পটাসিয়ামের 19তম ইলেকট্রনটি 3d তে না গিয়ে 4s এ যায় কেন? ব্যাখ্যা করো।

(গ) উদ্দীপকের X এর আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর নির্ণয় করো।

(ঘ) X ও Y এর সর্বশেষ শক্তিস্তরের ইলেকট্রনের কৌণিক ভরবেগের তুলনা করো।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. 'Al এর ভরসংখ্যা 27' - ব্যাখ্যা করো।

২. পরমাণুতে কখন বর্ণালির সৃষ্টি হয়? ব্যাখ্যা করো।

৩. ইলেকট্রনের আপেক্ষিক ভরকে শূন্য ধরা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো।

চতুর্থ অধ্যায়
পর্যায় সারণি
(Periodic Table)

একটি ভিন্ন ধরনের পর্যায় সারণি

2016 সাল পর্যন্ত পৃথিবীতে মোট 118টি মৌলিক পদার্থ আবিষ্কৃত হয়েছে। রসায়ন অধ্যয়ন ও গবেষণার জন্য সব কয়টি মৌলের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন। মৌলিক পদার্থগুলোর মধ্যে কিছু মৌলিক পদার্থ একই রকম ধর্ম প্রদর্শন করে। যে সকল মৌলিক পদার্থ একই রকম ধর্ম প্রদর্শন করে তাদেরকে একই গ্রুপে রেখে সমগ্র মৌলিক পদার্থের জন্য একটি ছক তৈরি করার চেষ্টা দীর্ঘদিন থেকেই চলছিল। কয়েক শ বছর ধরে বিভিন্ন বিজ্ঞানীর প্রচেষ্টা, অনেক পরিবর্তন, পরিবর্ধনের ফলে আমরা মৌলগুলো সাজানোর এই ছকটি পেয়েছি, যেটা পর্যায় সারণি বা Periodic table নামে পরিচিত। এ পর্যায় সারণি রসায়নের জগতে বিজ্ঞানীদের এক অসামান্য অবদান। এ পর্যায় সারণি এবং তার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কারও ভালো ধারণা থাকলে শুধু এই 118টি মৌলের বিভিন্ন ধর্ম নয় বরং এ সকল মৌল দ্বারা গঠিত অসংখ্য যৌগের ধর্মাবলি সম্পর্কে সাধারণ ধারণা জন্মে। এই অধ্যায়ে পর্যায়

২০২৩

সারণি এবং পর্যায় সারণিতে অবস্থিত মৌলসমূহের বিভিন্ন ধর্ম ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- পর্যায় সারণি বিকাশের পটভূমি বর্ণনা করতে পারব।
- মৌলের সর্ববহিঃস্তর শক্তিস্তরের ইলেকট্রন বিন্যাসের সাথে পর্যায় সারণির প্রধান গ্রুপগুলোর সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারব (প্রথম 30টি মৌল)।
- একটি মৌলের পর্যায় শনাক্ত করতে পারব।
- পর্যায় সারণিতে কোনো মৌলের অবস্থান জেনে এর ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম সম্পর্কে ধারণা করতে পারব।
- মৌলসমূহের বিশেষ নামকরণের কারণ বলতে পারব।
- পর্যায় সারণির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পর্যায় সারণির একই গ্রুপের মৌল দ্বারা গঠিত যৌগের একই ধরনের ধর্ম প্রদর্শন করতে পারব।
- পরীক্ষণের সময় কাচের যন্ত্রপাতির সঠিক ব্যবহার করতে পারব।
- পরীক্ষণ কাজে সতর্কতা অবলম্বন করতে পারব।
- পর্যায় সারণি অনুসরণ করে মৌলসমূহের ধর্ম অনুমানে আগ্রহ প্রদর্শন করতে পারব।

৪.১ পর্যায় সারণির পটভূমি (Background of Periodic Table)

মানুষ প্রাচীনকাল থেকে বিক্ষিপ্তভাবে পদার্থ এবং তাদের ধর্ম সম্পর্কে যে সকল ধারণা অর্জন করেছিল পর্যায় সারণি হচ্ছে তার একটি সম্মিলিত রূপ। পর্যায় সারণি একজন বিজ্ঞানীর একদিনের পরিশ্রমের ফলে তৈরি হয়নি। অনেক বিজ্ঞানীর অনেক দিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আজকের এই আধুনিক পর্যায় সারণি তৈরি হয়েছে।

1789 সালে ল্যাভয়সিয়ে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন, ফসফরাস, মার্কারি, জিংক এবং সালফার ইত্যাদি মৌলিক পদার্থসমূহকে ধাতু ও অধাতু এই দুই ভাগে ভাগ করেন। ল্যাভয়সিয়ের সময় থেকেই মৌলগুলোকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করার চিন্তাভাবনা শুরু হয় যেন একই ধরনের মৌলিক পদার্থগুলো একটি নির্দিষ্ট ভাগে থাকে।

1829 সালে বিজ্ঞানী ডোবেরাইনার লক্ষ করেন তিনটি করে মৌলিক পদার্থ একই রকমের ধর্ম প্রদর্শন করে। তিনি প্রথমে পারমাণবিক ভর অনুসারে তিনটি করে মৌল সাজান। এরপর তিনি লক্ষ করেন দ্বিতীয় মৌলের পারমাণবিক ভর প্রথম ও তৃতীয় মৌলের পারমাণবিক ভরের যোগফলের অর্ধেক বা তার কাছাকাছি, একে ডোবেরাইনারের ত্রয়ীসূত্র বলে। বিজ্ঞানী ডোবেরাইনার ক্লোরিন, ব্রোমিন ও আয়োডিনকে প্রথম ত্রয়ী মৌল হিসেবে চিহ্নিত করেন।

1864 সাল পর্যন্ত আবিষ্কৃত মৌলসমূহের জন্য নিউল্যান্ড অষ্টক সূত্র নামে একটি সূত্র প্রদান করেন। এই সূত্র অনুযায়ী মৌলসমূহকে যদি পারমাণবিক ভরের ছোট থেকে বড় অনুযায়ী সাজানো যায় তবে যেকোনো একটি মৌলের ধর্ম তার অষ্টম মৌলের ধর্মের সাথে মিলে যায়।

1869 সালে রাশিয়ান বিজ্ঞানী মেন্ডেলিফ সকল মৌলের ধর্ম পর্যালোচনা করে একটি পর্যায় সূত্র প্রদান করেন। সূত্রটি হলো: "মৌলসমূহের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মাবলি তাদের পারমাণবিক ভর বৃদ্ধির সাথে পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হয়।"

এ সূত্র অনুসারে তিনি তখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত 63টি মৌলকে 12টি আনুভূমিক সারি আর ৪টি খাড়া কলামের একটি ছকে পারমাণবিক ভর বৃদ্ধি অনুসারে সাজিয়ে দেখান যে, একই কলাম বরাবর সকল মৌলের ধর্ম একই রকমের এবং একটি সারির প্রথম মৌল থেকে শেষ মৌল পর্যন্ত মৌলগুলোর ধর্মের ক্রমান্বয়ে পরিবর্তন ঘটে। এই ছকের নাম দেওয়া হয় পর্যায় সারণি (Periodic Table)।

মেন্ডেলিফের পর্যায় সারণির আরেকটি সাফল্য হচ্ছে কিছু মৌলিক পদার্থের অস্তিত্ব সম্পর্কে সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী। সে সময় মাত্র 63টি মৌল আবিষ্কৃত হওয়ার কারণে পর্যায় সারণির কিছু ঘর ফাঁকা থেকে যায়। মেন্ডেলিফ এই ফাঁকা ঘরগুলোর জন্য যে মৌলের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন পরবর্তীকালে সেগুলো সত্য প্রমাণিত হয়।

	Legend
গ্রুপ সংখ্যা	6
পারমাণবিক সংখ্যা	24
পারমাণবিক ভর	52
প্রতীক	Cr
মৌলের নাম	Chromium ক্রোমিয়াম
পর্যায় সংখ্যা	4

পর্যায়	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 1 **H** Hydrogen হাইড্রোজেন								
2	3 7 **Li** Lithium লিথিয়াম	4 9 **Be** Beryllium বেরিলিয়াম							
3	11 23 **Na** Sodium সোডিয়াম	12 24 **Mg** Magnesium ম্যাগনেসিয়াম							
4	19 39 **K** Potassium পটাশিয়াম	20 40 **Ca** Calcium ক্যালসিয়াম	21 45 **Sc** Scandium স্ক্যানডিয়াম	22 48 **Ti** Titanium টাইটানিয়াম	23 51 **V** Vanadium ভ্যানাডিয়াম	24 52 **Cr** Chromium ক্রোমিয়াম	25 55 **Mn** Manganese ম্যাঙ্গানিজ	26 56 **Fe** Iron আয়রন	27 58 **Co** Cobalt কোবাল্ট
5	37 85.5 **Rb** Rubidium রুবিডিয়াম	38 88 **Sr** Strontium স্ট্রোনসিয়াম	39 89 **Y** Yttrium ইট্রিয়াম	40 91 **Zr** Zirconium জিরকোনিয়াম	41 93 **Nb** Niobium নিওবিয়াম	42 96 **Mo** Molybdenum মলিবডেনাম	43 98 **Tc** Technetium টেকনেসিয়াম	44 101 **Ru** Ruthenium রুথেনিয়াম	45 103 **Rh** Rhodium রোডিয়াম
6	55 133 **Cs** Caesium সিজিয়াম	56 137 **Ba** Barium বেরিয়াম	পারমাণবিক সংখ্যা 57 থেকে 71	72 178.5 **Hf** Hafnium হাফনিয়াম	73 181 **Ta** Tantalum ট্যান্টালাম	74 184 **W** Tungsten ট্যাংস্টেন	75 186 **Re** Rhenium রেনিয়াম	76 190 **Os** Osmium অসমিয়াম	77 192 **Ir** Iridium ইরিডিয়াম
7	87 223 **Fr** Francium ফ্রানসিয়াম	88 226 **Ra** Radium রেডিয়াম	পারমাণবিক সংখ্যা 89 থেকে 103	104 261 **Rf** Rutherfordium রাদারফোর্ডিয়াম	105 262 **Db** Dubnium ডুবনিয়াম	106 263 **Sg** Seaborgium সিয়াবর্গিয়াম	107 262 **Bh** Bohrium বোরিয়াম	108 265 **Hs** Hassium হাসিয়াম	109 266 **Mt** Metrenium মিটরেনিয়াম

ল্যানথানাইড সারির মৌল	57 139 **La** Lanthanum ল্যান্থানাম	58 140 **Ce** Cerium সিরিয়াম	59 141 **Pr** Praseodymium প্রাসিওডিমিয়াম	60 144 **Nd** Neodymium নিওডিমিয়াম	61 145 **Pm** Promethium প্রোমেথিয়াম	62 150 **Sm** Samarium সামারিয়াম	63 152 **Eu** Europium ইউরোপিয়াম
অ্যাকটিনাইড সারির মৌল	89 227 **Ac** Actinium অ্যাকটিনিয়াম	90 232 **Th** Thorium থোরিয়াম	91 231 **Pa** Protactinium প্রোটেকটিনিয়াম	92 238 **U** Uranium ইউরেনিয়াম	93 237 **Np** Neptunium নেপচুনিয়াম	94 244 **Pu** Plutonium প্লুটোনিয়াম	95 243 **Am** Americium আমেরিসিয়াম

আধুনিক পর্যায় সারণি

10	11	12	13	14	15	16	17	18
								2 4 **He** Helium হিলিয়াম
			5 11 **B** Boron বোরন	6 12 **C** Carbon কার্বন	7 14 **N** Nitrogen নাইট্রোজেন	8 16 **O** Oxygen অক্সিজেন	9 19 **F** Fluorine ফ্লোরিন	10 20 **Ne** Neon নিয়ন
			13 27 **Al** Aluminium অ্যালুমিনিয়াম	14 28 **Si** Silicon সিলিকন	15 31 **P** Phosphorus ফসফরাস	16 32 **S** Sulfur সালফার	17 35.5 **Cl** Cholorine ক্লোরিন	18 40 **Ar** Argon আর্গন
28 59 **Ni** Nickel নিকেল	29 63.5 **Cu** Copper কপার	30 65 **Zn** Zinc জিংক	31 70 **Ga** Gallium গ্যালিয়াম	32 73 **Ge** Germenium জার্মেনিয়াম	33 75 **As** Arsenic আর্সেনিক	34 79 **Se** Selenium সেলেনিয়াম	35 80 **Br** Bromine ব্রোমিন	36 84 **Kr** Krypton ক্রিপটন
46 106 **Pd** Palladium প্যালাডিয়াম	47 108 **Ag** Silver সিলভার	48 112 **Cd** Cadmium ক্যাডমিয়াম	49 115 **In** Indium ইন্ডিয়াম	50 119 **Sn** Tin টিন	51 122 **Sb** Antimony এন্টিমনি	52 128 **Te** Tellurium টেলুরিয়াম	53 127 **I** Iodine আয়োডিন	54 131 **Xe** Xenon জেনন
78 195 **Pt** Platinum প্লাটিয়াম	79 197 **Au** Gold গোল্ড	80 201 **Hg** Mercury মার্কারি	81 204 **Tl** Thallium থ্যালিয়াম	82 207 **Pb** Lead লেড	83 209 **Bi** Bismuth বিসমাথ	84 209 **Po** Polonium পোলোনিয়াম	85 210 **At** Astatine অ্যাস্টাটিন	86 222 **Rn** Radon রেডন
110 269 **Ds** Darmstadtium ডার্মস্টেডসিয়াম	111 272 **Rg** Roentgenium রন্টজেনিয়াম	112 285 **Cn** Copernicium কোপারনেসিয়াম	113 284 **Nh** Nihonium নিহোনিয়াম	114 285 **Fl** Flerovium ফ্লেরেভিয়াম	115 288 **Mc** Moscovium মস্কোভিয়াম	116 293 **Lv** Livermorium লিভারমোরিয়াম	117 294 **Ts** Tennessine টেনেসিন	118 294 **Og** Oganesson ওগানেসন

64 157 **Gd** Gadolinium গ্যাডোলিনিয়াম	65 159 **Tb** Terbium টার্বিয়াম	66 163 **Dy** Dysprosium ডিসপ্রোসিয়াম	67 165 **Ho** Holmium হলমিয়াম	68 167 **Er** Erbium আর্বিয়াম	69 169 **Tm** Thulium থুলিয়াম	70 173 **Yb** Ytterbium ইটারবিয়াম	71 175 **Lu** Lutetium লুটেসিয়াম
96 247 **Cm** Curium কুরিয়াম	97 247 **Bk** Berkelium বার্কেলিয়াম	98 251 **Cf** Californium ক্যালিফোর্নিয়াম	99 252 **Es** Einsteinium আইনস্টেনিয়াম	100 257 **Fm** Fermium ফার্মিয়াম	101 258 **Md** Mendelevium মেন্ডেলেভিয়াম	102 259 **No** Nobelium নোবেলিয়াম	103 262 **Lr** Lawrencium লরেনসিয়াম

মেন্ডেলিফের পর্যায় সারণির কিছু ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। মেন্ডেলিফ তার পর্যায় সারণিতে যে নিয়মানুযায়ী মৌলগুলো বসিয়েছিলেন সেই নিয়মানুযায়ী যে পরমাণুর পারমাণবিক ভর কম থাকবে সেই পরমাণু পর্যায় সারণিতে আগে বসবে এবং যে পরমাণুর পারমাণবিক ভর বেশি থাকবে সেই পরমাণু পর্যায় সারণিতে পরে বসবে। কিন্তু দেখা যায় মেন্ডেলিফের পর্যায় সারণিতে আর্গনের পারমাণবিক ভর 40 এবং পটাশিয়াম এর পারমাণবিক ভর 39 হওয়া সত্ত্বেও একই গ্রুপের মৌলসমূহের ধর্মের মিল করানোর জন্য আর্গনকে পটাশিয়ামের আগে বসানো হয়েছিল। এরকম আরও অনেক মৌলের ক্ষেত্রে দেখা যায় পারমাণবিক ভর বেশি হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে কোনো কোনো মৌলের আগে পর্যায় সারণিতে বসানো হয়েছিল। এটি ছিল পর্যায় সারণির ত্রুটি। এরকম আরও অনেক ত্রুটি মেন্ডেলিফের পর্যায় সারণিতে লক্ষ করা যায়।

1913 সালে মোসলে পারমাণবিক ভরের পরিবর্তে **পারমাণবিক সংখ্যা** অনুযায়ী মৌলগুলোকে পর্যায় সারণিতে সাজানোর প্রস্তাব দেন। মৌলসমূহের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মাবলি তাদের পারমাণবিক সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হয়।

পারমাণবিক সংখ্যা অনুসারে পর্যায় সারণিতে মৌলের স্থান দেওয়া হলে মেন্ডেলিফের পর্যায় সারণিতে আর্গনের পারমাণবিক সংখ্যা 18 এবং পটাশিয়াম এর পারমাণবিক সংখ্যা 19। কাজেই আর্গন পটাশিয়ামের আগে বসবে। কাজেই পারমাণবিক সংখ্যা অনুসারে পর্যায় সারণিতে মৌলের স্থান দেওয়া হলে এ রকম ত্রুটিগুলো সংশোধিত হয়।

আন্তর্জাতিক রসায়ন ও ফলিত রসায়ন সংস্থা (International Union of Pure and Applied Chemistry বা সংক্ষেপে IUPAC) এখন পর্যন্ত 118টি মৌলিক পদার্থকে শনাক্ত করেছে। IUPAC সংস্থাটি আন্তর্জাতিকভাবে রসায়ন ও ফলিত রসায়নের বিভিন্ন নিয়মকানুন, ক্রমবর্ধমান পরিবর্তনের কোনটি গ্রহণ করা যায় এবং কোনটি বর্জন করা উচিত এই বিষয়গুলো দেখাশোনা এবং নিয়ন্ত্রণ করে। 118টি মৌলের মধ্যে বেশির ভাগ মৌলই প্রকৃতিতে পাওয়া যায় এবং বাকি কিছু মৌল ল্যাবরেটরিতে তৈরি করা হয়েছে।

ল্যাভয়সিয়ে মাত্র 33টি মৌল নিয়ে ছক তৈরির কাজ শুরু করেছিলেন। মেন্ডেলিফ 63টি আবিষ্কৃত মৌল এবং 4টি অনাবিষ্কৃত মৌল নিয়ে পর্যায় সারণি নামে যে ছকটি তৈরি করেছিলেন, বর্তমানে সেটি 118টি মৌলের আধুনিক পর্যায় সারণি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

৪.২ পর্যায় সারণির বৈশিষ্ট্য (Characteristics of the Periodic Table)

পর্যায় সারণি মূলত একটি ছক বা টেবিল। টেবিলে যেমন সারি (Row) এবং কলাম (Column) থাকে পর্যায় সারণিতেও তেমনি সারি ও কলাম আছে। পর্যায় সারণির বাম থেকে ডান পর্যন্ত বিস্তৃত

২০২৬

সারিগুলোকে পর্যায় এবং খাড়া কলামগুলোকে গ্রুপ বা শ্রেণি বলে। আধুনিক পর্যায় সারণির বর্গাকার ঘরগুলোতে মোট 118টি মৌল আছে। পর্যায় সারণিটি এই অধ্যায়ের শুরুতে দেখানো হয়েছে।

আধুনিক পর্যায় সারণির অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। পর্যায় সারণির দিকে লক্ষ রাখলে এই বৈশিষ্ট্যগুলো খুঁজে পাওয়া যাবে।

(a) পর্যায় সারণিতে 7টি পর্যায় (Period) বা অনুভূমিক সারি এবং 18টি গ্রুপ বা খাড়া স্তম্ভ রয়েছে।

(b) প্রতিটি পর্যায় বামদিকে গ্রুপ 1 থেকে শুরু করে ডানদিকে গ্রুপ 18 পর্যন্ত বিস্তৃত।

(c) মূল পর্যায় সারণির নিচে আলাদাভাবে ল্যান্থানাইড ও অ্যাকটিনাইড সারির মৌল হিসেবে দেখানো হলেও এগুলো যথাক্রমে 6 এবং 7 পর্যায়ের অংশ।

(d) (i) পর্যায় 1 এ শুধু 2টি মৌল রয়েছে।
(ii) পর্যায় 2 এবং পর্যায় 3 এ 8টি করে মৌল রয়েছে।
(iii) পর্যায় 4 এবং পর্যায় 5 এ 18টি করে মৌল রয়েছে।
(iv) পর্যায় 6 এবং পর্যায় 7 এ 32টি করে মৌল রয়েছে।

(e) (i) গ্রুপ 1 এ 7টি মৌল রয়েছে।
(ii) গ্রুপ 2 এ 6টি মৌল রয়েছে।
(iii) গ্রুপ 3 এ 32টি মৌল রয়েছে।
(iv) গ্রুপ 4 থেকে গ্রুপ 12 পর্যন্ত প্রত্যেকটি গ্রুপে 4টি করে মৌল রয়েছে।
(v) গ্রুপ 13 থেকে গ্রুপ 17 পর্যন্ত প্রত্যেকটিতে 6টি করে মৌল রয়েছে।
(vi) গ্রুপ 18 এ 7টি মৌল রয়েছে।

যে সকল মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা 57 থেকে 71 পর্যন্ত এরকম 15টি মৌলকে ল্যান্থানাইড সারির মৌল বলা হয়। যে সকল মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা 89 থেকে 103 পর্যন্ত এরকম 15টি মৌলকে অ্যাকটিনাইড সারির মৌল বলা হয়। ল্যান্থানাইড সারির মৌলগুলোর ধর্ম এত কাছাকাছি এবং অ্যাকটিনাইড সারির মৌলসমূহের ধর্ম এত কাছাকাছি যে তাদেরকে পর্যায় সারণির নিচে ল্যান্থানাইড সারির মৌল এবং অ্যাকটিনাইড সারির মৌল হিসেবে আলাদাভাবে রাখা হয়েছে।

যদি মৌলগুলোর ধর্মের ভিত্তিতে বিবেচনা করা হয় তাহলে নিচের বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ করা যায়:

১. একই পর্যায়ের বাম থেকে ডানের দিকে গেলে মৌলসমূহের ধর্ম ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত হয়।
২. একই গ্রুপের মৌলগুলোর ভৌত এবং রাসায়নিক ধর্ম প্রায় একই রকমের হয়।

৪.৩ ইলেকট্রন বিন্যাস থেকে পর্যায় সারণিতে মৌলের অবস্থান নির্ণয় (Determination of the Position of Elements in the Periodic Table from Their Electronic Configuration)

আমরা কোনো একটি মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস থেকে সহজেই মৌলটি কোন গ্রুপ এবং কোন পর্যায়ে রয়েছে সেটি বের করতে পারি। নিচে পর্যায় সারণিতে কোনো মৌলের অবস্থান নির্ণয়ের পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো।

পর্যায় নম্বর বের করার নিয়ম

কোনো মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাসের সবচেয়ে বাইরের প্রধান শক্তিস্তরের নম্বরই ঐ মৌলের পর্যায় নম্বর। যেমন– Li এর ইলেকট্রন বিন্যাস হলো: $Li(3) \rightarrow 1s^2 2s^1$। যেহেতু লিথিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাসে সবচেয়ে বাইরের শক্তিস্তর 2, তাই লিথিয়াম 2 নম্বর পর্যায়ের মৌল।

K এর ইলেকট্রন বিন্যাস হলো: $K(19) \rightarrow 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$। যেহেতু পটাশিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাসে সবচেয়ে বাইরের শক্তিস্তর 4, তাই পটাশিয়াম 4 নম্বর পর্যায়ের মৌল।

গ্রুপ নম্বর বের করার নিয়ম

কোনো মৌলের গ্রুপ নম্বর বের করার কয়েকটি নিয়ম আছে।

নিয়ম 1: কোনো মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাসের বাইরের প্রধান শক্তিস্তরে যদি শুধু s অরবিটাল থাকে তবে ঐ s অরবিটালের মোট ইলেকট্রন সংখ্যাই ঐ মৌলের গ্রুপ নম্বর। যেমন- হাইড্রোজেন, H(1) মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস $1s^1$। এখানে s অরবিটালে 1টি ইলেকট্রন আছে। কাজেই হাইড্রোজেন এর গ্রুপ বা শ্রেণি নম্বর 1।

নিয়ম 2: কোনো মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাসের বাইরের প্রধান শক্তিস্তর যদি শুধু s ও p অরবিটাল থাকে তবে ঐ s ও p অরবিটালের মোট ইলেকট্রন সংখ্যার সাথে 10 যোগ করলে যে সংখ্যা পাওয়া যায় সেই সংখ্যাই ঐ মৌলের গ্রুপ নম্বর। যেমন: বোরন B(5) মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস $1s^2\ 2s^2\ 2p^1$। এখানে বোরনের বাইরের শেলে s অরবিটালে 2টি ইলেকট্রন ও p অরবিটালে 1টি ইলেকট্রন আছে। কাজেই বোরনের গ্রুপ নম্বর 2 + 1 + 10 = 13

নিয়ম 3: কোনো মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাসে সবচেয়ে বাইরের প্রধান শক্তিস্তরে যদি s অরবিটাল থাকে এবং আগের প্রধান শক্তিস্তরে যদি d অরবিটাল থাকে তবে s অরবিটাল ও d অরবিটালের ইলেকট্রন সংখ্যা যোগ করলেই গ্রুপ নম্বর পাওয়া যায়। যেমন: Fe(26) মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^6\ 4s^2$। এখানে আয়রন এর বাইরের শক্তিস্তরে s অরবিটাল আছে এবং তার আগের শক্তিস্তরে

d অরবিটাল আছে। এখানে d অরবিটালে 6টি এবং s অরবিটালে 2টি ইলেকট্রন আছে। কাজেই আয়রনের গ্রুপ নম্বর 6 + 2 = 8।

বোঝার সুবিধার জন্য মৌলের সবচেয়ে বাইরের স্তরের ইলেকট্রন বিন্যাসকে লাল রং দিয়ে দেখানো হয়েছে।

টেবিল ৪.০১: মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস ও গ্রুপ নম্বর

মৌল	মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস	পর্যায় নম্বর	গ্রুপ বা শ্রেণি নম্বর
H(1)	$1s^1$	1	1 (নিয়ম 1)
He(2)	$1s^2$	1	18 (ব্যতিক্রম)
Li(3)			
Be(4)			
B(5)	$1s^2\ 2s^2\ 2p^1$	2	2 + 1 + 10 = 13 (নিয়ম 2)
C(6)			
N(7)	$1s^2\ 2s^2\ 2p^3$	2	2 + 3 + 10 = 15 (নিয়ম 2)
O(8)	$1s^2\ 2s^2\ 2p^4$	2	2 + 4 + 10 = 16 (নিয়ম 2)
F(9)	$1s^2\ 2s^2\ 2p^5$	2	2 + 5 + 10 = 17 (নিয়ম 2)
Ne(10)	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6$	2	2 + 6 + 10 = 18 (নিয়ম 2)
Na(11)			
Mg(12)	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2$	3	2 (নিয়ম 1)
Al(13)			
Si(14)	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^2$	3	2 + 2 + 10 = 14 (নিয়ম 2)
P(15)	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^3$	3	2 + 3 + 10 = 15 (নিয়ম 2)
S(16)			
Cl(17)	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^5$	3	2 + 5 + 10 = 17 (নিয়ম 2)
Ar(18)	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6$	3	2 + 6 + 10 = 18 (নিয়ম 2)
K(19)	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6 4s^1$	4	1 (নিয়ম 1)
Ca(20)	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6 4s^2$	4	2 (নিয়ম 1)
Sc(21)			
Ti(22)	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^2\ 4s^2$	4	2 + 2 = 4 (নিয়ম 3)
V(23)	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^3\ 4s^2$	4	2 + 3 = 5 (নিয়ম 3)

Cr(24)	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^5\ 4s^1$	4	1 + 5 = 6 (নিয়ম 3)
Mn(25)	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^5\ 4s^2$	4	2 + 5 = 7 (নিয়ম 3)
Fe(26)			
Co(27)	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^7\ 4s^2$	4	2 + 7 = 9 (নিয়ম 3)
Ni(28)	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^8\ 4s^2$	4	2 + 8 = 10 (নিয়ম 3)
Cu(29)	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^{10}\ 4s^1$	4	1 + 10 = 11 (নিয়ম 3)
Zn(30)	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^{10}\ 4s^2$	4	2 + 10 = 12 (নিয়ম 3)

শিক্ষার্থীর কাজ: উপরের ছকে পারমাণবিক সংখ্যা 3, 4, 6, 11, 13, 16, 21, 26 বিশিষ্ট মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস লেখো এবং ইলেকট্রন বিন্যাস থেকে পর্যায় সারণিতে সেগুলোর অবস্থান নির্ণয় করো।

৪.৪ ইলেকট্রন বিন্যাসই পর্যায় সারণির মূল ভিত্তি

(Electronic Configurations of Elements are the Main Basis of the Periodic Table)

ইলেকট্রন বিন্যাসের মাধ্যমে কোনো মৌল কত নম্বর পর্যায় এবং কত নম্বর গ্রুপে অবস্থান করে তা বের করা যায়। আবার, যে সকল মৌলের বাইরের প্রধান শক্তিস্তরের ইলেকট্রন বিন্যাস একই রকম সে সকল মৌল একই গ্রুপে অবস্থান করে। অপরদিকে যে সকল মৌলের বাইরের প্রধান শক্তিস্তরের ইলেকট্রন বিন্যাস ভিন্ন রকম সে সকল মৌল ভিন্ন গ্রুপে অবস্থান করে।

টেবিল ৪.০২: মৌল ও ইলেকট্রন বিন্যাস

গ্রুপ-1	
মৌল	ইলেকট্রন বিন্যাস
H(1)	$1s^1$
Li(3)	$1s^2 2s^1$
Na(11)	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$
K(19)	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$

গ্রুপ-2	
মৌল	ইলেকট্রন বিন্যাস
He(2)	$1s^2$
Be(4)	$1s^2 2s^2$
Mg(12)	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$
Ca(20)	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$

২০২৫

যে সকল মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাসে বাইরের শক্তিস্তরে মোট ইলেকট্রন সংখ্যা 1টি সে সকল মৌল সাধারণত ইলেকট্রন দান করে ধনাত্মক আয়নে পরিণত হওয়ার প্রবণতা দেখায়। যেমন- সোডিয়ামের বাইরের শক্তিস্তরে 1টি ইলেকট্রন আছে। তাই সোডিয়াম ঐ 1টি ইলেকট্রন ত্যাগ করে ধনাত্মক আয়নে পরিণত হয়।

$$Na\ (1s^2 2s^2 2p^6 3s^1) \longrightarrow Na^+\ (1s^2 2s^2 2p^6) + e^-$$

আবার যে সকল মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাসে বাইরের শক্তিস্তরে মোট ইলেকট্রন সংখ্যা 7টি সে সকল মৌল সাধারণত 1টি ইলেকট্রন গ্রহণ করে ঋণাত্মক আয়নে পরিণত হবার প্রবণতা দেখায়। যেমন–ক্লোরিনের বাইরের শক্তিস্তরে 7টি ইলেকট্রন আছে। তাই ক্লোরিন 1টি ইলেকট্রন গ্রহণ করে ঋণাত্মক আয়নে পরিণত হয়।

$$Cl\ (1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5) + e^- \longrightarrow Cl^-\ (1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6)$$

অতএব ইলেকট্রন বিন্যাসের মাধ্যমে পর্যায় সারণিতে মৌলের অবস্থান নির্ণয় ও মৌলসমূহের অনেক ধর্ম ব্যাখ্যা করা যায়। এজন্য ইলেকট্রন বিন্যাসকেই পর্যায় সারণির মূল ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

৪.৫ পর্যায় সারণির কিছু ব্যতিক্রম
(Some Exceptions in the Periodic Table)

(a) **হাইড্রোজেনের অবস্থান:** হাইড্রোজেন একটি অধাতু। কিন্তু পর্যায় সারণিতে হাইড্রোজেনকে তীব্র তড়িৎ ধনাত্মক ক্ষার ধাতু Na, K, Rb, Cs, Fr এর সাথে গ্রুপ-1 এ স্থান দেওয়া হয়েছে। এর কারণ ক্ষার ধাতুর মতো H এর বাইরের প্রধান শক্তিস্তরে একটিমাত্র ইলেকট্রন রয়েছে। আবার, হাইড্রোজেনের অনেক ধর্ম ক্ষার ধাতুগুলোর ধর্মের সাথে মিলে যায়। অন্যদিকে, হ্যালোজেন মৌল (F, Cl, Br, I) এর একটি পরমাণু যেমন একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করতে পারে, হাইড্রোজেনও তেমনি একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করতে পারে অর্থাৎ H এর অনেক ধর্ম হ্যালোজেন মৌলের ধর্মের সাথেও মিলে যায়। তবে হাইড্রোজেনের বেশির ভাগ ধর্ম ক্ষার ধাতুসমূহের ধর্মের সাথে মিলে যাওয়ায় একে ক্ষার ধাতুর সাথে গ্রুপ 1 এ স্থান দেওয়া হয়েছে।

(b) **হিলিয়ামের অবস্থান:** হিলিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস He(2)→ $1s^2$। হিলিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস অনুসারে একে গ্রুপ-2 এ স্থান দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু গ্রুপ-2 এর মৌলসমূহ তীব্র তড়িৎ ধনাত্মক। এদের মৃৎক্ষার ধাতু বলে। অপরদিকে He একটি নিষ্ক্রিয় গ্যাস। এর ধর্ম অন্যান্য নিষ্ক্রিয় গ্যাস নিয়ন,

আর্গন, ক্রিপ্টন, জেনন, রেডন ইত্যাদির সাথে মিলে যায়। He এর ধর্ম কখনই তীব্র তড়িৎ ধনাত্মক মৃৎক্ষার ধাতুর মতো হয় না। তাই হিলিয়ামকে নিষ্ক্রিয় গ্যাসসমূহের সাথে গ্রুপ-18 তে স্থান দেওয়া হয়েছে।

(c) **ল্যান্থানাইড সারির এবং অ্যাকটিনাইড সারির মৌলগুলোর অবস্থান:** পর্যায় সারণিতে ল্যান্থানাইড সারির মৌলগুলো 6 নম্বর পর্যায় ও 3 নম্বর গ্রুপে অবস্থিত এবং অ্যাকটিনাইড সারির মৌলগুলো 7 নম্বর পর্যায় ও 3 নম্বর গ্রুপে অবস্থিত। এই অবস্থানগুলোতে ল্যান্থানাইড সারির এবং অ্যাকটিনাইড সারির মৌলগুলোকে বসালে পর্যায় সারণির সৌন্দর্য নষ্ট হয়। কাজেই পর্যায় সারণিকে সুন্দরভাবে দেখানোর জন্য ল্যান্থানাইড সারির এবং অ্যাকটিনাইড সারির মৌলগুলোকে পর্যায় সারণির নিচে আলাদাভাবে রাখা হয়েছে।

৪.৬ মৌলের পর্যায়বৃত্ত ধর্ম (Periodic Properties of Elements)

পর্যায় সারণিতে অবস্থিত মৌলগুলোর কিছু ধর্ম আছে, যেমন-ধাতব ধর্ম, অধাতব ধর্ম, পরমাণুর আকার, আয়নিকরণ শক্তি, তড়িৎ ঋণাত্মকতা ইলেকট্রন আসক্তি ইত্যাদি। এসব ধর্মকে পর্যায়বৃত্ত ধর্ম বলে।

(a) ধাতব ধর্ম (Metallic Properties): যে সকল মৌল চকচকে, আঘাত করলে ধাতব শব্দ করে এবং তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবাহী তাদেরকে আমরা ধাতু বলে থাকি। আধুনিক সংজ্ঞা অনুযায়ী যে সকল মৌল এক বা একাধিক ইলেকট্রন ত্যাগ করে ধনাত্মক আয়নে পরিণত হয় তাদেরকে ধাতু বলে। ধাতুর ইলেকট্রন ত্যাগের এই ধর্মকে ধাতব ধর্ম বলে। যে মৌলের পরমাণু যত সহজে ইলেকট্রন ত্যাগ করতে পারবে সেই মৌলের ধাতব ধর্ম তত বেশি।

যেমন– লিথিয়াম (Li) একটি ধাতু কারণ Li একটি ইলেকট্রন ত্যাগ করে Li^+ এ পরিণত হয়।

$$Li \rightarrow Li^+ + e^-$$

পর্যায় সারণিতে যেকোনো পর্যায়ের বাম থেকে ডানে গেলে ধাতব ধর্ম হ্রাস পায়।

(b) অধাতব ধর্ম (Non-metallic Properties): যে সকল মৌল চকচকে নয়, আঘাত করলে ধাতব শব্দ করে না এবং তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবাহী নয় তাদেরকে আমরা অধাতু বলে থাকি। আধুনিক সংজ্ঞা অনুযায়ী যে সকল মৌল এক বা একাধিক ইলেকট্রন গ্রহণ করে ঋণাত্মক আয়নে পরিণত হয় তাদেরকে অধাতু বলে। অধাতুর ইলেকট্রন গ্রহণের এই ধর্মকে অধাতব ধর্ম বলে। যে মৌলের পরমাণু যত সহজে ইলেকট্রন গ্রহণ করতে পারবে সেই মৌলের অধাতব ধর্ম তত বেশি।

যেমন- ক্লোরিন (Cl) একটি অধাতু কারণ Cl একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে Cl^- এ পরিণত হয়।

$$Cl + e^- \rightarrow Cl^-$$

পর্যায় সারণিতে যেকোনো পর্যায়ের বাম থেকে ডানে গেলে অধাতব ধর্ম বৃদ্ধি পায়।

যে সকল মৌল কোনো কোনো সময় ধাতুর মতো আচরণ করে এবং কোনো কোনো সময় অধাতুর মতো আচরণ করে তাদেরকে অর্ধধাতু বা অপধাতু বলা হয়। আবার আধুনিক সংজ্ঞা অনুযায়ী যে সকল মৌল কোনো কোনো সময় ইলেকট্রন ত্যাগ করে এবং কোনো কোনো সময় ইলেকট্রন গ্রহণ করে তাদেরকে অপধাতু বলে। যেমন- সিলিকন (Si) একটি অপধাতু।

পর্যায় সারণির যেকোনো একটি পর্যায়ের দিকে লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, বামদিকের মৌলগুলো সাধারণত ধাতু, মাঝের মৌলগুলো সাধারণত অর্ধধাতু বা অপধাতু এবং ডানদিকের মৌলগুলো সাধারণত অধাতু।

(c) পরমাণুর আকার/পারমাণবিক ব্যাসার্ধ (Size of Atom/Atomic Radius): পরমাণুর আকার তথা পারমাণবিক ব্যাসার্ধ একটি পর্যায়বৃত্ত ধর্ম। যেকোনো একটি পর্যায়ের যতই বামদিক থেকে ডান দিকে যাওয়া যায় পরমাণুর আকার/পারমাণবিক ব্যাসার্ধ তত কমতে থাকে এবং যেকোনো একটি গ্রুপের যতই উপর দিক থেকে নিচের দিকে যাওয়া যায় পরমাণুর আকার/পারমাণবিক ব্যাসার্ধ তত বাড়তে থাকে।

একই পর্যায়ের বাম দিক থেকে যত ডান দিকে যাওয়া যায় পারমাণবিক সংখ্যা তত বাড়তে থাকে কিন্তু প্রধান শক্তিস্তরের সংখ্যা বাড়ে না। পারমাণবিক সংখ্যা বাড়লে নিউক্লিয়াসে প্রোটন সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং ইলেকট্রন সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। নিউক্লিয়াসের অধিক প্রোটন সংখ্যা এবং নিউক্লিয়াসের বাইরের অধিক ইলেকট্রন সংখ্যার মধ্যে আকর্ষণ বেশি হয় ফলে ইলেকট্রনগুলোর শক্তিস্তর নিউক্লিয়াসের কাছে চলে আসে, ফলে পরমাণুর আকার ছোট হয়ে যায়।

আবার, একই গ্রুপে যতই উপর থেকে নিচের দিকে যাওয়া যায় ততই বাইরের দিকে একটি করে নতুন শক্তিস্তর যুক্ত হয়। একটি করে নতুন শক্তিস্তর যুক্ত হলে পরমাণুর আকার বৃদ্ধি পায়।

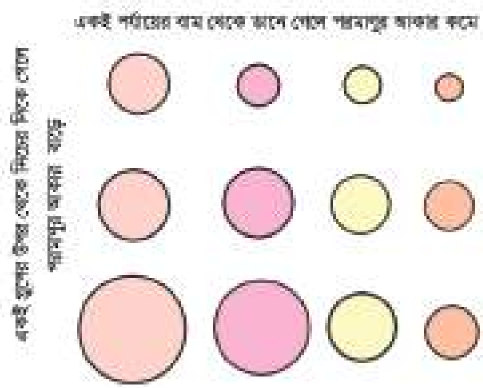

চিত্র ৪.০১: পরমাণুর আকারের পর্যায়বৃত্ত ধর্ম

একই গ্রুপের উপর থেকে নিচের দিকে গেলে নিউক্লিয়াসের প্রোটন সংখ্যা এবং বাইরের কক্ষপথের ইলেকট্রন সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য আকর্ষণ বৃদ্ধি হয়ে পরমাণুর আকার যতটুকু হ্রাস পায়, নতুন একটি শক্তিস্তর যোগ হওয়ার কারণে

পরমাণুর আকার তার চেয়ে বেশি বৃদ্ধি পায়। যে কারণে উপরের মৌলের চেয়ে নিচের মৌলের আকার বড় হয়।

(d) আয়নিকরণ শক্তি (Ionization Energy): গ্যাসীয় অবস্থায় কোনো মৌলের এক মোল গ্যাসীয় পরমাণু থেকে এক মোল ইলেকট্রন অপসারণ করে এক মোল ধনাত্মক আয়নে পরিণত করতে যে শক্তির প্রয়োজন হয়, তাকে ঐ মৌলের আয়নিকরণ শক্তি বলে। আয়নিকরণ শক্তি একটি পর্যায়বৃত্ত ধর্ম। একই পর্যায়ের বামের মৌলের পারমাণবিক ব্যাসার্ধ বেশি এবং ডানের মৌলের পারমাণবিক ব্যাসার্ধ কম। পারমাণবিক ব্যাসার্ধ কমলে আয়নিকরণ শক্তির মান বাড়ে এবং পারমাণবিক ব্যাসার্ধ বাড়লে আয়নিকরণ শক্তির মান কমে।

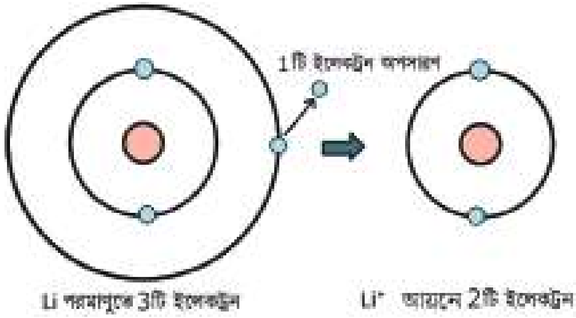

চিত্র ৪.০২: মৌলের আয়নিকরণ

উদাহরণ

Na, Mg, Al, Si এর মধ্যে Si এর আয়নিকরণ শক্তির মান বেশি। কারণ এই মৌলগুলোর মধ্যে Si এর পারমাণবিক ব্যাসার্ধের মান সবচেয়ে কম। পক্ষান্তরে, এই মৌলগুলোর মধ্যে Na এর পারমাণবিক ব্যাসার্ধের মান বেশি বলে এদের মধ্যে সোডিয়ামের আয়নিকরণ শক্তির মান কম।

গ্রুপ-1 এর Li, Na, K, Rb, Cs, Fr ক্ষার ধাতুগুলোর মধ্যে Li এর পারমাণবিক ব্যাসার্ধের মান সবচেয়ে কম এজন্য এদের মধ্যে Li এর আয়নিকরণ শক্তির মান সবচেয়ে বেশি।

আবার, গ্রুপ-17 এর F, Cl, Br, I এবং At মৌলগুলোর মধ্যে F এর পারমাণবিক ব্যাসার্ধের মান সবচেয়ে কম, কাজেই এই মৌলগুলোর মধ্যে F এর আয়নিকরণ শক্তির মান সবচেয়ে বেশি।

(e) ইলেকট্রন আসক্তি (Electron Affinities): গ্যাসীয় অবস্থায় কোনো মৌলের এক মোল গ্যাসীয় পরমাণুতে এক মোল ইলেকট্রন প্রবেশ করিয়ে এক মোল ঋণাত্মক আয়নে পরিণত করতে যে শক্তি নির্গত হয়, তাকে ঐ মৌলের ইলেকট্রন আসক্তি বলে।

ইলেকট্রন আসক্তি একটি পর্যায়বৃত্ত ধর্ম। একই পর্যায়ের বামের মৌলের পারমাণবিক ব্যাসার্ধ বেশি এবং ডানের মৌলের পারমাণবিক ব্যাসার্ধ কম। পারমাণবিক ব্যাসার্ধ কমলে ইলেকট্রন আসক্তির মান বাড়ে এবং পারমাণবিক ব্যাসার্ধ বাড়লে ইলেকট্রন আসক্তির মান কমে।

একক কাজ

সমস্যা: Be, Ca, Sr, Ba, Mg এবং Ra মৌলগুলোর মধ্যে কোনোটির ইলেকট্রন আসক্তি বেশি এবং কোনোটির ইলেকট্রন আসক্তি কম।

সমাধান: Be, Ca, Sr, Ba, Mg এবং Ra মৌলগুলো পর্যায় সারণির 2 নং গ্রুপ-এর মৌল। এই মৌলগুলোর মধ্যে Be এর পারমাণবিক ব্যাসার্ধের মান সবচেয়ে কম, এর জন্য Be এর ইলেকট্রন আসক্তির মান সবচেয়ে বেশি। আবার Ra এর পারমাণবিক ব্যাসার্ধের মান সবচেয়ে বেশি, এর জন্য Ra ইলেকট্রন আসক্তি সবচেয়ে কম।

সমস্যা: Na, Mg, Al, Si এর মধ্যে কার ইলেকট্রন আসক্তি বেশি বা কার ইলেকট্রন আসক্তির মান কম?

সমাধান: Na, Mg, Al, Si এর মৌলগুলো পর্যায় সারণির 3 নং পর্যায়ের মৌল। এই মৌলগুলোর মধ্যে Na-এর পারমাণবিক ব্যাসার্ধের মান সবচেয়ে বেশি এজন্য সোডিয়াম এর ইলেকট্রন আসক্তির মান সবচেয়ে কম। আবার, Si এর পারমাণবিক ব্যাসার্ধের মান সবচেয়ে কম সেজন্য এর ইলেকট্রন আসক্তির মান সবচেয়ে বেশি।

(f) **তড়িৎ ঋণাত্মকতা (Electronegativity):** দুটি পরমাণু যখন সমযোজী বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে অণুতে পরিণত হয় তখন অণুর পরমাণুগুলো বন্ধনের ইলেকট্রন দুটিকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণকে তড়িৎ ঋণাত্মকতা বলা হয়। তড়িৎ ঋণাত্মকতা একটি পর্যায়বৃত্ত ধর্ম। একই পর্যায়ের বামের মৌলের পারমাণবিক ব্যাসার্ধ বেশি এবং ডানের মৌলের পারমাণবিক ব্যাসার্ধ কম। পারমাণবিক ব্যাসার্ধ কমলে তড়িৎ ঋণাত্মকতার মান বাড়ে এবং পারমাণবিক ব্যাসার্ধ বাড়লে তড়িৎ ঋণাত্মকতার মান কমে।

যেমন- 3 পর্যায়ে মৌলগুলোর মাঝে Na পরমাণুর তড়িৎ ঋণাত্মকতার মান সবচেয়ে কম এবং Cl এর তড়িৎ ঋণাত্মকতা সবচেয়ে বেশি। সাধারণত কোনো মৌলের পরমাণুর আকার ছোট হলে তড়িৎ ঋণাত্মকতার মান বেশি হয় এবং কোনো মৌলের পরমাণুর আকার বড় হলে তড়িৎ ঋণাত্মকতার মান কম হয়।

৪.৭ বিভিন্ন গ্রুপে উপস্থিত মৌলগুলোর বিশেষ নাম (The Special Names of Elements Present in Various Groups)

মৌলসমূহের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন সময়ে তাদের বিশেষ নাম দেওয়া হয়েছিল। আমরা ইতোমধ্যে ধাতু, অধাতু, অর্ধধাতু বা অপধাতুর কথা আলোচনা করেছি। এছাড়া রয়েছে:

ক্ষার ধাতু: পর্যায় সারণির 1 নং গ্রুপে 7টি মৌল আছে। এদের মধ্যে হাইড্রোজেন ছাড়া বাকি 6টি মৌলকে (লিথিয়াম, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, রুবিডিয়াম, সিজিয়াম এবং ফ্রানসিয়াম) ক্ষারধাতু বলে। এই ছয়টি মৌলের প্রত্যেকটি পানিতে দ্রবীভূত হয়ে হাইড্রোজেন গ্যাস এবং ক্ষার তৈরি করে বলে এদেরকে ক্ষারধাতু (Alkali Metals) বলা হয়।

মৃৎক্ষার ধাতু: পর্যায় সারণির 2 নং গ্রুপে বেরিলিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম, স্ট্রনসিয়াম, বেরিয়াম এবং রেডিয়াম এই 6টি মৌল আছে। এই মৌলগুলোকে মৃৎক্ষার ধাতু বলে। এই ধাতুগুলোকে মাটিতে বিভিন্ন যৌগ হিসেবে পাওয়া যায়। আবার, এরা ক্ষার তৈরি করে। এজন্য সামগ্রিকভাবে এদের মৃৎক্ষার ধাতু (Alkaline Earth Metals) বলা হয়।

মুদ্রা ধাতু: গ্রুপ-11 এর 4টি মৌল হচ্ছে কপার, সিলভার, গোল্ড এবং রন্টজেনিয়াম। এই চারটি মৌলের মধ্যে প্রথম 3টি মৌলকে মুদ্রা ধাতু (Coin Metals) বলা হয়, কারণ এই গ্রুপের সবচেয়ে নিচের মৌল রন্টজেনিয়াম (Rg) ছাড়া অন্য যে 3টি মৌল আছে তা দিয়ে প্রাচীনকালে মুদ্রা তৈরি হতো এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হতো।

হ্যালোজেন গ্রুপ: গ্রুপ-17 এর 6টি মৌলকে হ্যালোজেন (Halogen) বলা হয়। এই হ্যালোজেন গ্রুপের 6টি মৌল হচ্ছে: ফ্লোরিন (F), ক্লোরিন (Cl), ব্রোমিন (Br), আয়োডিন (I), অ্যাস্টাটিন (At) এবং টেনেসিন (Ts)। এসব হ্যালোজেন মৌলকে X দ্বারা প্রকাশ করা হয়। হ্যালোজেন মানে লবণ উৎপাদনকারী এবং এর মূল উৎস সামুদ্রিক লবণ। হ্যালোজেন মৌলগুলোর সাথে ধাতু যুক্ত হয়ে লবণ গঠিত হয়। যেমন– F এর সাথে Na যুক্ত হয়ে সোডিয়াম ফ্লোরাইড লবণ কিংবা Cl এর সাথে Na যুক্ত হয়ে সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCl) বা খাদ্যলবণ গঠিত হয়। এরা নিজেরাই নিজেদের মধ্যে ইলেকট্রন ভাগাভাগি করে দ্বিমৌল অণু তৈরি করে, যেমন– Cl_2, I_2 ইত্যাদি।

নিষ্ক্রিয় গ্যাস: পর্যায় সারণির 18 নং গ্রুপের মৌলসমূহকে নিষ্ক্রিয় গ্যাস (Inert Gases) বলা হয়। মৌলগুলো হলো: হিলিয়াম (He), নিয়ন (Ne), আর্গন (Ar), ক্রিপ্টন (Kr), জেনন (Xe), রেডন (Rn) এবং ওগানেসন (Og)। এই মৌলগুলোর সবচেয়ে বাইরের শক্তিস্তরে প্রয়োজনীয় ইলেকট্রন দিয়ে পূর্ণ থাকে বলে এরা ইলেকট্রন বিনিময় বা ভাগাভাগি করে কোনো যৌগ গঠন করতে চায় না। রাসায়নিক বন্ধন গঠন বা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় এরা নিষ্ক্রিয় থাকে বলে এদেরকে নিষ্ক্রিয় মৌল বা নিষ্ক্রিয় গ্যাস বলে। নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলো সাধারণ তাপমাত্রায় গ্যাস হিসেবে থাকে।

অবস্থান্তর মৌল: অবস্থান্তর মৌলসমূহকে অবস্থান্তর ধাতুও বলা হয়। কারণ এ মৌলগুলোর সবগুলোই ধাতু। অবস্থান্তর মৌলসমূহ d-ব্লক মৌলের অন্তর্ভূক্ত। তবে সকল d-ব্লক মৌল অবস্থান্তর মৌল নয়। যে সকল d-ব্লক মৌলের এক বা একাধিক অরবিটাল আংশিক ইলেকট্রনপূর্ণ তারাই কেবল অবস্থান্তর মৌল। যেমন- লোহা (Fe), নিকেল (Ni), ক্রোমিয়াম (Cr) ইত্যাদি। অবস্থান্তর মৌলসমূহের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন- এরা যৌগে একাধিক যোজনী প্রদর্শন করে, এরা সাধারণত: রঙিন যৌগ গঠন করে, শিল্পক্ষেত্রে এরা ভালো প্রভাবক হিসাবে কাজ করে। উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণিতে তোমরা এ সম্পর্কে আরো অনেক কিছু শিখতে পারবে।

একক কাজ

সমস্যা: Ca কে মৃৎক্ষার ধাতু বলা হয় কেন?

সমাধান: Ca ধাতুর বিভিন্ন যৌগ মাটিতে পাওয়া যায়। আবার Ca ধাতুর হাইড্রোক্সাইড যৌগ $Ca(OH)_2$ একটি ক্ষার। অতএব Ca একটি মৃৎক্ষার ধাতু।

সমস্যা: He কেন নিষ্ক্রিয় গ্যাস? ব্যাখ্যা করো।

সমাধান: He নিজেদের সাথে যুক্ত হয় না আবার অন্য মৌলের সাথেও যুক্ত হয় না। এজন্য হিলিয়াম নিষ্ক্রিয় মৌল। আবার হিলিয়াম মৌল গ্যাস হিসেবে অবস্থান করে। এজন্যই সামগ্রিকভাবে He কে নিষ্ক্রিয় গ্যাস বলা হয়।

৪.৮ পর্যায় সারণির সুবিধা (Advantages of the Periodic Table)

পর্যায় সারণি বিভিন্ন রসায়নবিদের নিরলস প্রচেষ্টায় গড়া রসায়নের জগতে এক অসামান্য অবদান। রসায়ন অধ্যয়ন, নতুন মৌল সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী, গবেষণা ইত্যাদিতে পর্যায় সারণি বিরাট ভূমিকা পালন করে। নিচে তার কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরা হলো:

(a) রসায়ন পাঠ সহজীকরণ: 2016 সাল পর্যন্ত পৃথিবীতে 118টি মৌল আবিষ্কার করা হয়েছে। আমরা যদি শুধু 4টি ভৌত ধর্ম, যেমন– গলনাঙ্ক, স্ফুটনাঙ্ক, ঘনত্ব ও কঠিন/তরল/গ্যাসীয় অবস্থা এবং 4টি রাসায়নিক ধর্ম, যেমন– অক্সিজেন, পানি, এসিড ও ক্ষারের সাথে বিক্রিয়া বিবেচনা করি তাহলে 118টি মৌলের মোট $118 \times (4 + 4) =$ 944টি ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। এতগুলো ধর্ম মনে রাখা অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু পর্যায় সারণি সে কাজটিকে অনেক সহজ করে দিয়েছে। এ পর্যায় সারণিতে রয়েছে আঠারোটি গ্রুপ আর সাতটি পর্যায়। প্রতিটি গ্রুপের সাধারণ ধর্ম জানলে 118টি মৌলের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম সম্বন্ধে একটি মোটামুটি ধারণা লাভ করা যায়। শুধু তাই নয়, পর্যায় সারণি সম্পর্কে ভালোভাবে ধারণা থাকলে বিভিন্ন মৌল দ্বারা গঠিত তাদের যৌগের ধর্ম সম্পর্কেও ধারণা লাভ করা যেতে পারে।

(b) নতুন মৌলের আবিষ্কার: কিছু দিন আগেও সাতটি পর্যায় আর আঠারোটি গ্রুপ নিয়ে গঠিত পর্যায় সারণিতে বেশ কিছু ফাঁকা ঘর ছিল। এই মৌলগুলো আবিষ্কার হবার আগেই ঐ ফাঁকা ঘরে যে মৌলগুলো বসবে বা তাদের ধর্ম কেমন হবে তা পর্যায় সারণি থেকে ধারণা পাওয়া গিয়েছিল। তোমরা ইতোমধ্যে

জেনে গেছ যে বিজ্ঞানী মেন্ডেলিফ তাঁর সময়ে আবিষ্কৃত 63টি মৌলকে তার আবিষ্কৃত পর্যায় সারণিতে স্থান দিতে গিয়ে যে মৌলগুলো সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন সেগুলো পরে আবিষ্কৃত হয়েছিল।

(c) গবেষণা ক্ষেত্রে: গবেষণার ক্ষেত্রেও পর্যায় সারণির অসামান্য অবদান রয়েছে। মনে করো, কোনো একজন বিজ্ঞানী কোনো একটি বিশেষ প্রয়োজনের জন্য নতুন একটি পদার্থ আবিষ্কার করতে চাইছেন। তাহলে আগেই তাঁকে ধারণা করতে হবে যে, নতুন পদার্থটির ধর্ম কেমন হবে এবং সেই সকল ধর্মবিশিষ্ট পদার্থ তৈরি করতে কী ধরনের মৌল প্রয়োজন হবে। তার এ ধারণা পর্যায় সারণি থেকেই পাওয়া যাবে।

এছাড়া পর্যায় সারণির আরও অনেক ধরনের ব্যবহার আছে যা তোমরা ধীরে ধীরে জানতে পারবে।

৪.৯ পর্যায় সারণির একই গ্রুপের মৌলগুলো একই রকম রাসায়নিক ধর্ম প্রদর্শন করে (Elements in the Same Group in the Periodic Table Show similar Chemical Properties)

পর্যায় সারণির একই গ্রুপের মৌলগুলো যে একই রকম ধর্ম প্রদর্শন করে তা একটি পরীক্ষার মাধ্যমে তোমরা বুঝতে পারবে।

যেমন- 17 নং গ্রুপের মৌল F_2, Cl_2, Br_2, I_2 ইত্যাদি গ্যাস হাইড্রোজেনের সাথে বিক্রিয়া করে যথাক্রমে HF(g), HCl(g), HBr(g) , HI(g) ইত্যাদি গ্যাস উৎপন্ন করে।

$$H_2(g) + F_2(g) \longrightarrow 2HF(g)$$
$$H_2(g) + Cl_2(g) \longrightarrow 2HCl(g)$$
$$H_2(g) + Br_2(g) \longrightarrow 2HBr(g)$$
$$H_2(g) + I_2(g) \longrightarrow 2HI(g)$$

আবার, এই উৎপন্ন গ্যাসগুলোকে যদি পানিতে দ্রবীভূত করা হয় তাহলে হাইড্রোহ্যালাইড এসিড যথা হাইড্রোফ্লোরিক এসিড [HF(aq)], হাইড্রোক্লোরিক এসিড [HCl(aq)], হাইড্রোব্রোমিক এসিড [HBr(aq)], হাইড্রোআয়োডিক এসিডে [HI(aq)] পরিণত হয়।

$$HF(g) + H_2O(l) \longrightarrow HF(aq)$$
$$HCl(g) + H_2O(l) \longrightarrow HCl(aq)$$
$$HBr(g) + H_2O(l) \longrightarrow HBr(aq)$$
$$HI(g) + H_2O(l) \longrightarrow HI(aq)$$

এই হাইড্রোহ্যালাইড এসিডসমূহ যেকোনো কার্বনেট লবণের সাথে বিক্রিয়া করে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন করে। যেমন– ক্যালসিয়াম কার্বনেটের মধ্যে হাইড্রোফ্লোরিক এসিড যোগ করলেও কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়।

$$CaCO_3 + 2HF(aq) \longrightarrow CaF_2 + H_2O + CO_2$$

আবার, ক্যালসিয়াম কার্বনেটের মধ্যে হাইড্রোক্লোরিক এসিড যোগ করলেও কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস তৈরি হয়।

$$CaCO_3 + 2HCl(aq) \longrightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2$$

উপরের বিক্রিয়াগুলো থেকে বোঝা যায় যে, 17 নং গ্রুপের মৌল, F_2, Cl_2, Br_2, I_2 একই রকমের ধর্ম ও বিক্রিয়া প্রদর্শন করে।

আবার, 2 নং গ্রুপের মৌল Mg এবং Ca একই রকমের ধর্ম ও বিক্রিয়া প্রদর্শন করে।

ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট ($MgCO_3$) যেমন- লঘু হাইড্রোক্লোরিক এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড, পানি এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন করে তেমনি ক্যালসিয়াম কার্বনেট লঘু হাইড্রোক্লোরিক এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, পানি এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন করে।

$$MgCO_3 + 2HCl \longrightarrow MgCl_2 + H_2O + CO_2$$
$$CaCO_3 + 2HCl \longrightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2$$

পরীক্ষণ

পরীক্ষণের নাম: ক্যালসিয়াম কার্বনেটের সাথে লঘু হাইড্রোক্লোরিক এসিডের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস শনাক্তকরণ।

মূলনীতি: ক্যালসিয়াম কার্বনেট লঘু হাইড্রোক্লোরিক এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, পানি এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন করে।

$$CaCO_3 + 2HCl \longrightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2$$

প্রয়োজনীয় উপকরণ

যন্ত্রপাতি: 1. একটি গোলতলী ফ্লাস্ক 2. একটি থিসল ফানেল 3. দুইবার সমকোণে বাঁকানো একটি কাচের নির্গম নল 4. কয়েকটি গ্যাসজার 5. ছিদ্রযুক্ত ছিপি।

রাসায়নিক দ্রব্যাদি: 1. ক্যালসিয়াম কার্বনেট 2. লঘু হাইড্রোক্লোরিক এসিড 3. পানি।

কার্যপদ্ধতি:

1. একটি গোলতলী ফ্লাস্কে ক্যালসিয়াম কার্বনেটের কিছু ছোট টুকরো নেওয়া হলো।

2. ছিপির সাহায্যে ফ্লাস্কের এক মুখ দিয়ে একটি থিসল ফানেল এবং অপর মুখ দিয়ে দুইবার সমকোণে বাঁকানো নির্গম নলের এক প্রান্ত প্রবেশ করানো হলো।

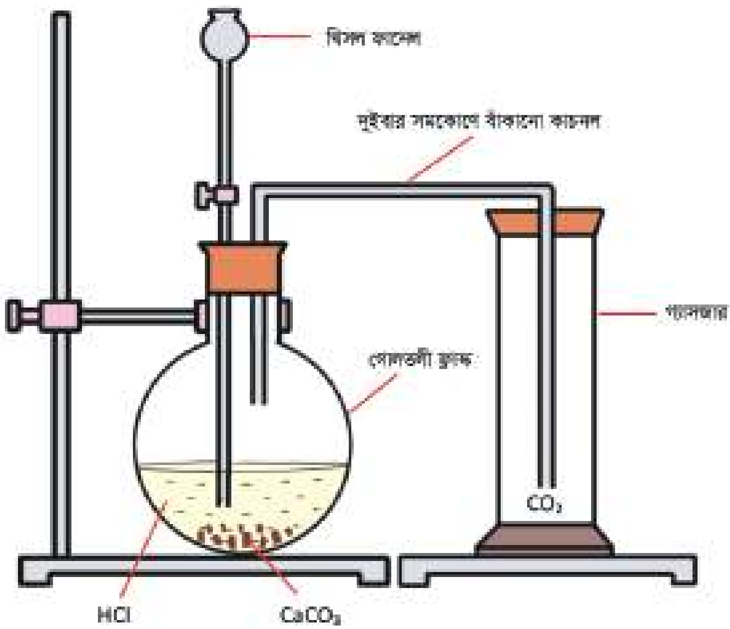

চিত্র ৪.০৩ : কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রস্তুতকরণ

3. থিসল ফানেলের মধ্য দিয়ে কিছু পরিমাণ পানি গোলতলী ফ্লাস্কে নেওয়া হলো যেন ক্যালসিয়াম কার্বনেট এবং থিসল ফানেলের নিম্নপ্রান্ত পানিতে ডুবে থাকে।

4. নির্গম নলের অন্য প্রান্ত একটি গ্যাসজারে প্রবেশ করানো হলো।

5. এরপর থিসল ফানেলের ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে হাইড্রোক্লোরিক এসিড যোগ করা হলো। দেখা গেল ক্যালসিয়াম কার্বনেট এবং হাইড্রোক্লোরিক এসিড বিক্রিয়া করে যে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস তৈরি করছে তা বুদ্‌বুদ্‌ আকারে নির্গম নল দিয়ে বের হয়ে আসছে।

২০২৬

6. নির্গম নল দিয়ে বের হয়ে আসা গ্যাসকে গ্যাসজারে সংরক্ষণ করা হলো। যেহেতু কার্বন ডাই-অক্সাইড বাতাসের অন্যান্য গ্যাস অপেক্ষা তুলনামূলক ভারী, সেহেতু কার্বন ডাইঅক্সাইড সিলিন্ডারের নিচের দিকে জমা হবে।

কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের ধর্ম পরীক্ষা: 1. উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের বর্ণ লক্ষ করা হলো। কার্বন ডাই-অক্সাইডের কোনো বর্ণ দেখা গেল না।

2. গ্যাসজারের মুখে একটি জ্বলন্ত কাঠি ধরা হলো। কাঠিটির আগুন নিভে গেল। সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস আগুন নিভাতে সাহায্য করে।

3. একটি টেস্টটিউব বা পরীক্ষানলে চুনের পানি বা ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড নিয়ে তার মধ্যে উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস প্রবেশ করানো হলো । প্রথমে সামান্য গ্যাস প্রবেশ করে ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সাথে বিক্রিয়া করে ক্যালসিয়াম কার্বনেটের সাদা বর্ণের অধঃক্ষেপ তৈরি হলো। ফলে চুনের পানি ঘোলা হলো। এরপর আরও অধিক গ্যাস এই ঘোলা পানির মধ্যে প্রবেশ করানো হলো ফলে ক্যালসিয়াম কার্বনেট, পানি এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড বিক্রিয়া করে ক্যালসিয়াম বাইকার্বনেট তৈরি করল। এতে চুনের ঘোলা পানি আবার পরিষ্কার হয়ে গেল।

সতর্কতা: 1. থিসল ফানেলের শেষ প্রান্ত পানির নিচে যাতে সব সময় ডুবে থাকে সেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল।

2. গোলতলী ফ্লাস্ককে একটি স্ট্যান্ডের সাথে আটকিয়ে রাখা হয়েছিল।

এই পরীক্ষণের জন্য ক্যালসিয়াম কার্বনেটের পরিবর্তে শামুক, ঝিনুক, ডিমের খোসা এবং হাইড্রোক্লোরিক এসিডের পরিবর্তে ভিনেগার ব্যবহার করা যায়।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. আধুনিক পর্যায় সারণির মূল ভিত্তি কী?
(ক) পারমাণবিক সংখ্যা (খ) পারমাণবিক ভর
(গ) আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর (ঘ) ইলেকট্রন বিন্যাস

২. A $\rightarrow 1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^3\ 4s^2$ মৌলটি পর্যায় সারণির কোন গ্রুপে অবস্থিত?
(ক) Group-2 (খ) Group-5
(গ) Group-11 (ঘ) Group-13

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

পর্যায় সারণির কোনো একটি গ্রুপের খণ্ডিত অংশ। (এখানে X, Y প্রতীকী অর্থে, প্রচলিত কোনো মৌলের প্রতীক নয়)

$_{19}K$
$_{37}X$
$_{55}Y$

৩. 'X' মৌলটি পর্যায় সারণির কোন পর্যায়ের?
(ক) ৩য় (খ) ৪র্থ
(গ) ৫ম (ঘ) ৬ষ্ঠ

৪. উদ্দীপকের মৌলগুলোর–
(i) সর্বশেষ স্তরে 1টি ইলেকট্রন আছে
(ii) Y মৌলটি X মৌল অপেক্ষা বেশি সক্রিয়
(iii) পারমাণবিক আকার উপর থেকে নিচে ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের উদ্দীপকের আলোকে প্রশ্নের উত্তর দাও :

মৌল	পারমাণবিক সংখ্যা
X	12
Y	20
Z	24

(ক) মুদ্রা ধাতু কাকে বলে?

(খ) বেরিয়ামকে মৃৎক্ষার ধাতু বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো।

(গ) পর্যায় সারণিতে Z মৌলের অবস্থান নির্ণয় করো।

(ঘ) X ও Y মৌলদ্বয় একই রকম রাসায়নিক ধর্ম প্রর্দশন করে বিশ্লেষণ করো।

২. নিচের উদ্দীপকের আলোকে প্রশ্নের উত্তর দাও :

	গ্রুপ 1	গ্রুপ 2	গ্রুপ 17
পর্যায় 2			X
পর্যায় 3			Y
পর্যায় 4	A	D	E

(ক) আধুনিক পর্যায় সূত্রটি লেখো।

(খ) সিলিকনকে অপধাতু বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো।

(গ) উদ্দীপকের কোন মৌলটির ইলেকট্রন আসক্তি বেশি? ব্যাখ্যা করো।

(ঘ) A থেকে E এর দিকে যেতে আয়নিকরণ শক্তির পরিবর্তন বিশ্লেষণ করো।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. সোডিয়ামকে ক্ষার ধাতু বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো।

২. হিলিয়ামকে পর্যায় সারণির গ্রুপ-2 তে স্থান দেওয়া হয়নি কেন? ব্যাখ্যা করো।

৩. Ca ও Mg এর মধ্যে কোনটির আয়নিকরণ শক্তি বেশি? ব্যাখ্যা করো।

পঞ্চম অধ্যায়

রাসায়নিক বন্ধন

(Chemical Bond)

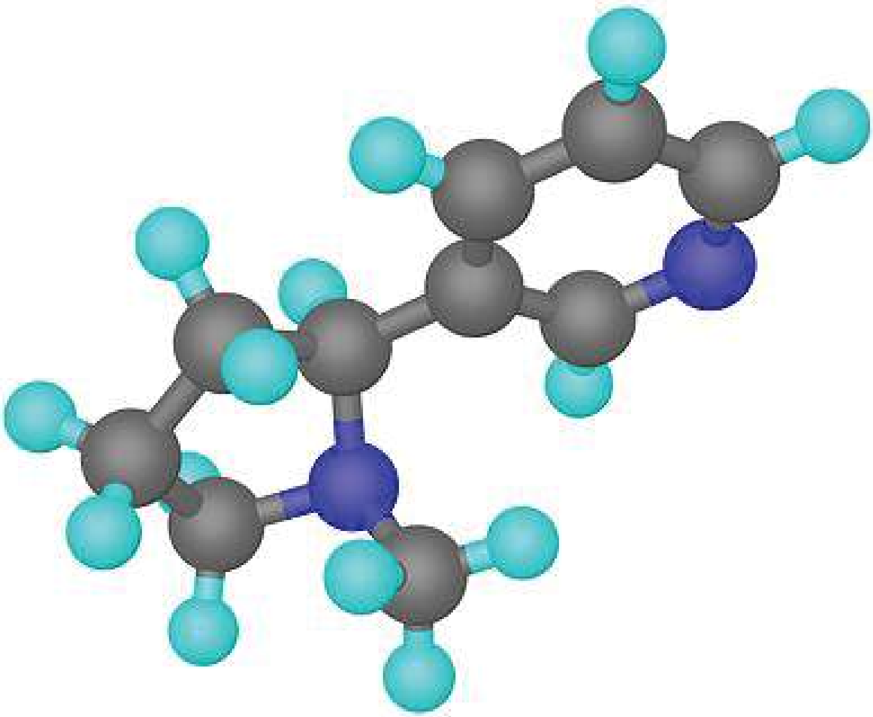

আমরা জানি, সকল পদার্থই অণু এবং পরমাণু দিয়ে গঠিত। এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত 118টি মৌলের 118টি ভিন্ন ভিন্ন পরমাণু রয়েছে। এদের মধ্য থেকে এক বা একাধিক মৌলের পরমাণু দিয়েই সকল পদার্থের অণু গঠিত হয়। পদার্থের অণুতে পরমাণুসমূহ এলোমেলো বা বিক্ষিপ্তভাবে থাকে না। পরমাণুসমূহ সুবিন্যস্তভাবে থাকে। যে আকর্ষণ শক্তির মাধ্যমে অণুতে দুটি পরমাণু পরস্পর যুক্ত থাকে তাকে রাসায়নিক বন্ধন বলে। এই বন্ধন বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। যেমন—আয়নিক বন্ধন, সমযোজী বন্ধন কিংবা ধাতব বন্ধন। এ অধ্যায়ে আয়নিক, সমযোজী বা ধাতব বন্ধন বিশিষ্ট যৌগের বন্ধন গঠন প্রক্রিয়া ও তাদের ধর্ম নিয়ে আলোচনা করা হবে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- যোজ্যতা ইলেকট্রনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মৌলের প্রতীক, যৌগমূলকের সংকেত ও এগুলোর যোজনী ব্যবহার করে যৌগের সংকেত লিখতে পারব।
- নিষ্ক্রিয় গ্যাসের স্থিতিশীলতা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- অষ্টক ও দুইয়ের নিয়মের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- রাসায়নিক বন্ধন এবং তা গঠনের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আয়ন কীভাবে এবং কেন সৃষ্টি হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আয়নিক বন্ধন গঠনের প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারব।
- সমযোজী বন্ধন গঠনের প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারব।
- আয়নিক ও সমযোজী বন্ধনের সাথে গলনাঙ্ক, স্ফুটনাঙ্ক, দ্রাব্যতা, বিদ্যুৎ পরিবাহিতা এবং কেলাস গঠনের ধর্ম ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ধাতব বন্ধনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ধাতব বন্ধনের সাহায্যে ধাতুর বিদ্যুৎ পরিবাহিতা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- স্থানীয়ভাবে সহজপ্রাপ্য দ্রব্যের মধ্যে আয়নিক ও সমযোজী যৌগ শনাক্ত করতে পারব।

২০২৩

৫.১ যোজ্যতা ইলেকট্রন (Valence Electrons)

কোনো মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাসে সর্বশেষ কক্ষপথে যে ইলেকট্রন বা ইলেকট্রনসমূহ থাকে তার সংখ্যাকে যোজ্যতা ইলেকট্রন সংখ্যা বলা হয়। যেমন- পটাশিয়াম ও অক্সিজেনের ইলেকট্রন বিন্যাসে সর্বশেষ কক্ষপথে যথাক্রমে 1টি ও 6টি করে ইলেকট্রন বিদ্যমান।

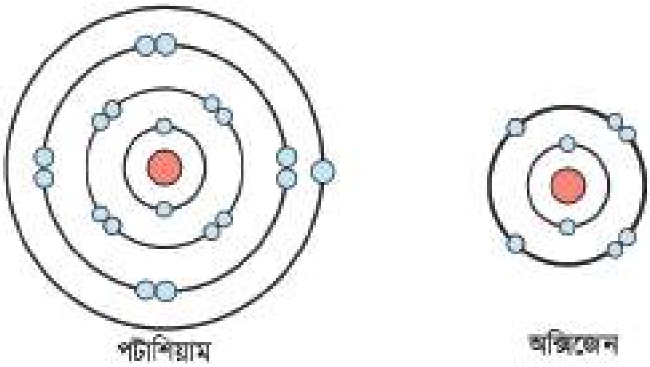

চিত্র ৫.০১: (a) পটাশিয়ামের যোজ্যতা ইলেকট্রন (b) অক্সিজেনের যোজ্যতা ইলেকট্রন

সুতরাং পটাশিয়ামের যোজ্যতা ইলেকট্রন 1টি এবং অক্সিজেনের যোজ্যতা ইলেকট্রন 6টি। নিচের তালিকায় কিছু মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস হতে যোজ্যতা ইলেকট্রনের সংখ্যা দেখানো হলো:

টেবিল ৫.০১: মৌলের যোজ্যতা ইলেকট্রন

মৌল	ইলেকট্রন বিন্যাস				যোজ্যতা ইলেকট্রন
	K কক্ষপথ	L কক্ষপথ	M কক্ষপথ	N কক্ষপথ	
N(7)	2	5			5
F(9)	2	7			7
P(15)	2	8	5		5
Cl(17)	2	8	7		7
Ca(20)	2	8	8	2	2

এখানে নাইট্রোজেন (N) এর K কক্ষপথে 2টি এবং L কক্ষপথে 5টি ইলেকট্রন আছে। নাইট্রোজেনের ক্ষেত্রে L কক্ষপথই হলো সর্বশেষ কক্ষপথ। যেহেতু সর্বশেষ কক্ষপথে 5টি ইলেকট্রন আছে। সুতরাং নাইট্রোজেনের যোজ্যতা ইলেকট্রন আছে 5টি।

একক কাজ

শিক্ষার্থীর কাজ : F, P, Cl এবং Ca এর যোজ্যতা ইলেকট্রনের সংখ্যা বের করো।

৫.২ যোজনী বা যোজ্যতা (Valency)

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিভিন্ন মৌলের পরমাণুসমূহ একে অপরের সাথে সর্বশেষ কক্ষপথের ইলেকট্রন বর্জন, গ্রহণ অথবা ভাগাভাগির মাধ্যমে অণু গঠন করে। অণু গঠনকালে কোনো মৌলের একটি পরমাণুর সাথে অপর একটি মৌলের পরমাণু যুক্ত হওয়ার ক্ষমতাকে যোজনী বা যোজ্যতা বলা হয়।

সাধারণত সব সময় হাইড্রোজেনের যোজনী এক (1) ধরা হয়। কোনো মৌলের একটি পরমাণু যতগুলো H পরমাণু বা Cl পরমাণুর সাথে যুক্ত হতে পারে সেই সংখ্যাই হলো ঐ মৌলের যোজনী বা যোজ্যতা।

হাইড্রোজেনের একটি পরমাণু ক্লোরিনের একটি পরমাণুর সাথে যুক্ত হয়ে HCl অণু গঠিত হয়, তাই ক্লোরিনের যোজনীও 1 (এক)। আবার অক্সিজেনের একটি পরমাণু হাইড্রোজেনের দুটি পরমাণুর সাথে যুক্ত হয়ে H_2O তৈরি করে, এজন্য অক্সিজেনের যোজনী 2 (দুই)। একটি Na পরমাণু একটি Cl পরমাণুর সাথে যুক্ত হয়ে NaCl গঠিত হয়। সুতরাং Na এর যোজনী 1 (এক)।

একটি পরমাণুর সাথে যতটি অক্সিজেন পরমাণু যুক্ত হয় তার সেই সংখ্যার দ্বিগুণ করলে ঐ পরমাণুর যোজনী বা যোজ্যতা হয়। যেমন- ক্যালসিয়াম (Ca) এর একটি পরমাণু একটি অক্সিজেন (O) পরমাণুর সাথে যুক্ত হয়ে ক্যালসিয়াম অক্সাইড (CaO) তৈরি করে। এখানে অক্সিজেন পরমাণুর সংখ্যা 1 এই সংখ্যাকে 2 দ্বারা গুণ করলে হয় 2। কাজেই ক্যালসিয়ামের যোজনী 2।

কিছু কিছু মৌলের একাধিক যোজনী থাকে। কোনো মৌলের একাধিক যোজনী থাকলে সেই মৌলের যোজনীকে পরিবর্তনশীল যোজনী বলা হয়। যেমন- Fe এর পরিবর্তনশীল যোজনী 2 এবং 3।

কোনো মৌলের সর্বোচ্চ যোজনী এবং সক্রিয় যোজনীর পার্থক্যকে ঐ মৌলের সুপ্ত যোজনী বলা হয়। যেমন: $FeCl_2$ যৌগে Fe এর সক্রিয় যোজনী 2 কিন্তু Fe এর সর্বোচ্চ যোজনী 3। অতএব $FeCl_2$ যৌগে Fe এর সুপ্ত যোজনী $3-2=1$। আবার $FeCl_3$ যৌগে Fe এর সক্রিয় যোজনী 3 কিন্তু Fe এর সর্বোচ্চ যোজনী 3, অতএব $FeCl_3$ যৌগে Fe এর সুপ্ত যোজনী $3 - 3 = 0$।

টেবিল ৫.০২: বিভিন্ন মৌলের যোজনী

মৌল	যোজনী	মৌল	যোজনী	মৌল	যোজনী
H	1	Na	1	Fe	2, 3
F	1	K	1	Cu	1, 2
Cl	1	C	2, 4	Zn	2
Br	1	Mg	2		
I	1	Al	3		

টেবিল ৫.০৩: বিভিন্ন পরমাণুর যোজনী এবং যৌগ

ধাতব ও অধাতব পরমাণু	প্রতীক	যোজনী	যৌগ	ধাতব ও অধাতব পরমাণু	প্রতীক	যোজনী	যৌগ
হাইড্রোজেন	H	1	HCl	সিলভার	Ag	1	AgCl
লিথিয়াম	Li	1	LiCl	ফ্লোরিন	F	1	NaF
সোডিয়াম	Na	1	NaCl	ক্লোরিন	Cl	1	NaCl
পটাশিয়াম	K	1	KCl	ব্রোমিন	Br	1	NaBr
ম্যাগনেসিয়াম	Mg	2	$MgCl_2$	আয়োডিন	I	1	NaI
ক্যালসিয়াম	Ca	2	$CaCl_2$	বোরন	B	3	BCl_3
অ্যালুমিনিয়াম	Al	3	$AlCl_3$	ফসফরাস	P	3 5	PCl_3 PCl_5
আয়রন	Fe	2 3	$FeCl_2$ $FeCl_3$	কপার	Cu	1 2	CuCl $CuCl_2$
জিংক	Zn	2	$ZnCl_2$	অক্সিজেন	O	2	H_2O
লেড	Pb	2 4	$PbCl_2$ $PbCl_4$	কার্বন	C	2 4	CO CH_4
নাইট্রোজেন	N	3 5	NH_3 N_2O_5	সালফার	S	2 4 6	H_2S SO_2 SO_3

৫.৩ যৌগমূলক ও তাদের যোজনী (Radicals and Their Valencies)

একাধিক মৌলের কতিপয় পরমাণু বা আয়ন পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে ধনাত্মক বা ঋণাত্মক আধানবিশিষ্ট একটি পরমাণুগুচ্ছ তৈরি করে এবং এটি একটি মৌলের আয়নের ন্যায় আচরণ করে। এ ধরনের পরমাণুগুচ্ছকে যৌগমূলক বলা হয়।

যৌগমূলক ধনাত্মক কিংবা ঋণাত্মক আধানবিশিষ্ট হতে পারে। এদের আধান সংখ্যাই মূলত এদের যোজনী নির্দেশ করে। যেমন- একটি N পরমাণুর সাথে তিনটি H পরমাণু ও একটি H^+ যুক্ত হয়ে অ্যামোনিয়াম (NH_4^+) আয়ন নামক যৌগমূলকের সৃষ্টি করে। এর আধান সংখ্যা হলো +1 (এক)। সুতরাং এর যোজনীও 1 (এক)। আধান বা চার্জ ধনাত্মক বা ঋণাত্মক হতে পারে কিন্তু যোজনী শুধু একটি সংখ্যা এর কোনো ধনাত্মক চিহ্ন বা ঋণাত্মক চিহ্ন নেই।

টেবিল ৫.০৪: বিভিন্ন যৌগমূলকের নাম, সংকেত, আধান ও যোজনী

যৌগমূলকের নাম	সংকেত	আধান	যোজনী
অ্যামোনিয়াম	NH_4^+	+1	1
কার্বনেট	CO_3^{2-}	−2	2
হাইড্রোজেন কার্বনেট	HCO_3^-	−1	1
সালফেট	SO_4^{2-}	−2	2
হাইড্রোজেন সালফেট	HSO_4^-	−1	1
সালফাইট	SO_3^{2-}	−2	2
নাইট্রেট	NO_3^-	−1	1
নাইট্রাইট	NO_2^-	−1	1
ফসফেট	PO_4^{3-}	−3	3
হাইড্রোক্সাইড	OH^-	−1	1
ফসফোনিয়াম	PH_4^+	+1	1

৫.৪ যৌগের রাসায়নিক সংকেত (Chemical Formula of Compounds)

যৌগের একটি অণুতে যেসব পরমাণু থাকে তাদের প্রতীক ও সংখ্যার মাধ্যমে অণুটিকে প্রকাশ করা হয়। যেমন- দুটি হাইড্রোজেন (H) পরমাণু ও একটি অক্সিজেন (O) পরমাণু মিলে পানির (H_2O) একটি

২০২৬

অণু গঠিত হয়। এখানে, H_2O হলো পানির অণুর রাসায়নিক সংকেত। সুতরাং মৌল বা যৌগমূলকের প্রতীক বা সংকেত ও তাদের সংখ্যার মাধ্যমে কোনো যৌগ অণুকে প্রকাশ করাই হলো উক্ত যৌগের রাসায়নিক সংকেত (Chemical Formula)। এক্ষেত্রে অণুর মধ্যে অবস্থিত মৌলের বা যৌগমূলকের সংখ্যাকে সংকেতের নিচে ডান পাশে ছোট করে (Subscript) লেখা হয়।

রাসায়নিক সংকেত লেখার নিয়ম

(a) কোনো মৌলের একটি অণুতে যতগুলো পরমাণু থাকে তার সংখ্যাটি ইংরেজি হরফে মৌলটির প্রতীকের ডান পাশে নিচে ছোট করে লিখতে হবে। যেমন: নাইট্রোজেন অণুতে দুটি পরমাণু থাকে তাই নাইট্রোজেন অণুর সংকেত N_2। ওজোন এর একটি অণুতে তিনটি অক্সিজেন পরমাণু থাকে—তাই ওজোন অণুর সংকেত O_3। কিছু মৌল অণু গঠন করে না তাই তাদেরকে শুধু প্রতীক দিয়ে বোঝানো হয়। যেমন: সকল ধাতু। কাজেই আয়রনকে বোঝাতে শুধু Fe লিখতে হবে। আবার, নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলোও অণু গঠন করে না, তাই হিলিয়ামকে বোঝাতেও শুধু He লিখতে হবে।

(b) কখনো কখনো কোনো যৌগের অণু দুটি ভিন্ন মৌলের পরমাণু দিয়ে গঠিত হয়। তাদের যোজনী যদি কোনো সাধারণ সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য না হয় তাহলে দুটি মৌলের প্রতীক পাশাপাশি লিখে একটি মৌলের প্রতীকের পাশে অন্যটির যোজনী লিখতে হয়। যেমন: অ্যালুমিনিয়ামের যোজনী 3 এবং অক্সিজেন এর যোজনী 2। যোজনী দুটি কোনো সাধারণ সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য নয়। যদি অ্যালুমিনিয়াম এবং অক্সিজেন দ্বারা গঠিত কোনো যৌগের সংকেত লিখতে হয় তবে অ্যালুমিনিয়ামের প্রতীক Al এর নিচের দিকে ডান পাশে অক্সিজেনের যোজনী ছোট করে লিখতে হবে এবং অক্সিজেনের প্রতীক O এর নিচের দিকে ডান পাশে অ্যালুমিনিয়ামের যোজনী ছোট করে লিখতে হবে অর্থাৎ এর সংকেত হবে Al_2O_3। অনুরূপভাবে ক্যালসিয়ামের যোজনী 2 এবং ক্লোরিনের যোজনী 1। সুতরাং ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডের সংকেত Ca_1Cl_2 হওয়ার কথা, 1টি লিখতে হয় না বলে আমরা লিখি $CaCl_2$। আবার, ম্যাগনেসিয়ামের যোজনী 2 এবং ফসফেটের যোজনী 3। সুতরাং ম্যাগনেসিয়াম ফসফেটের সংকেত $Mg_3(PO_4)_2$। উল্লেখ্য যে, কোনো যৌগমূলক একাধিক সংখ্যক থাকলে যৌগমূলকটিকে প্রথম বন্ধনীর মধ্যে রেখে তারপর সংখ্যা লিখতে হয়। যেমন: অ্যামোনিয়াম ফসফেট $(NH_4)_3(PO_4)_1$ বা $(NH_4)_3PO_4$, অ্যালুমিনিয়াম সালফেট $Al_2(SO_4)_3$ ইত্যাদি।

(c) যদি দুটি মৌলের যোজনী কোনো সাধারণ সংখ্যা দিয়ে বিভাজ্য হয় তাহলে যোজনীগুলো সেই সাধারণ সংখ্যা দিয়ে ভাগ দিয়ে মৌলের পাশে পূর্বের নিয়মে ভাগফলটি লিখতে হয় যেমন: কার্বন ও অক্সিজেন দিয়ে গঠিত যৌগ কার্বন ডাই-অক্সাইড। কার্বনের যোজনী 4 এবং অক্সিজেনের যোজনী 2। কার্বনের যোজনীকে 2 দিয়ে ভাগ করলে 2 পাওয়া যায় আবার অক্সিজেনের যোজনীকে 2 দিয়ে ভাগ করলে 1 পাওয়া যায়। এখন নিয়ম অনুযায়ী কার্বনের সংকেত C এর নিচে ডান পাশে 1 এবং অক্সিজেনের নিচে 2 লিখতে হবে। কিন্তু সংকেত লেখার সময় যেহেতু 1 সংখ্যাটি লেখার প্রয়োজন

২০২৩

নেই তাই কার্বন ডাই-অক্সাইডের সংকেত হবে CO_2। ফেরাস সালফেট যৌগে আয়রনের যোজনী 2 সালফেট আয়নের (SO_4^{2-}) যোজনী 2। এই সংখ্যাদুটিকে 2 দিয়ে ভাগ করে 1 ও 1 পাওয়া যায়। সুতরাং ফেরাস সালফেটের সংকেত $FeSO_4$। বোরন ও নাইট্রোজেনের যোজনী 3। এদের 3 দিয়ে ভাগ করলে 1 ও 1 পাওয়া যায় সুতরাং বোরন নাইট্রাইডের সংকেত $B_1N_1 = BN$।

৫.৫ আণবিক সংকেত ও গাঠনিক সংকেত (Molecular Formula and Structural Formula)

একটি মৌল বা যৌগের অণুতে যে যে ধরনের মৌলের পরমাণু থাকে তাদের প্রতীক এবং যে মৌলের পরমাণু যতটি থাকে সেই সকল সংখ্যা দিয়ে প্রকাশিত সংকেতকে আণবিক সংকেত বা রাসায়নিক সংকেত বলে। এ সম্পর্কে তোমরা ইতোমধ্যে জেনেছ। আবার একটি অণুতে মৌলের পরমাণুগুলো যেভাবে সাজানো থাকে প্রতীক এবং বন্ধনের মাধ্যমে তা প্রকাশ করাকে গাঠনিক সংকেত বলে। যেমন তিনটি কার্বন (C) পরমাণু আটটি হাইড্রোজেন (H) পরমাণুর সাথে যুক্ত হয়ে প্রোপেন (C_3H_8) অণু গঠিত হয়। প্রোপেনের C_3H_8 এই সংকেতটিকে আণবিক সংকেত বা রাসায়নিক সংকেত বলে।

আবার উক্ত যৌগে কার্বন পরমাণু তিনটি একে অপরের সাথে শিকল আকারে যুক্ত হয় এবং অবশিষ্ট যোজনীগুলো হাইড্রোজেন দ্বারা পূর্ণ হয়ে প্রতিটি কার্বনের যোজনী 4 হয়। নিচে প্রোপেনের গাঠনিক সংকেত দেখানো হলো:

```
  H H H
  | | |
H-C-C-C-H
  | | |
  H H H
```

আবার পানির আণবিক সংকেত H_2O, অতএব এর গাঠনিক সংকেত হবে

```
 O
/ \
H H
```

মিথেনের আণবিক সংকেত CH_4, অতএব মিথেনের গাঠনিক সংকেত হবে

```
  H
  |
H-C-H
  |
  H
```

কার্বন-কার্বন ও কার্বন-হাইড্রোজেনের মধ্যে অবস্থিত প্রতিটি রেখা হলো এককেটি বন্ধন। এগুলো সমযোজী বন্ধন। সমযোজী বন্ধন সম্পর্কে এ অধ্যায়েই জানতে পারবে। গাঠনিক সংকেতের মাধ্যমে যৌগের অণুতে কোন পরমাণু কতটি করে আছে এবং তারা একে অপরের সাথে কীভাবে যুক্ত আছে তা জানা যায়।

৫.৬ অষ্টক ও দুই-এর নিয়ম (Octet and Duet Rules)

প্রতিটি মৌলই তার সর্বশেষ শক্তিস্তরে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ইলেকট্রন বিন্যাসের প্রবণতা দেখায়। হিলিয়াম ছাড়া সকল নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ইলেকট্রন বিন্যাসে সর্বশেষ শক্তিস্তরে ৪টি করে ইলেকট্রন বিদ্যমান। অণু গঠনকালে কোনো মৌল ইলেকট্রন গ্রহণ, বর্জন অথবা ভাগাভাগির মাধ্যমে তার সর্বশেষ শক্তিস্তরে ৪টি করে ইলেকট্রন ধারণের মাধ্যমে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ইলেকট্রন বিন্যাস লাভ করে। একেই 'অষ্টক' নিয়ম বলা হয়। যেমন– CH_4 অণুতে কেন্দ্রীয় পরমাণু কার্বনের সর্বশেষ শক্তিস্তরে ৪টি ইলেকট্রন বিদ্যমান। যেখানে 4টি ইলেকট্রন কার্বনের নিজস্ব আর বাকি 4টি ইলেকট্রন চারটি হাইড্রোজেন পরমাণু থেকে আসে। পাশের চিত্রে তা দেখানো হলো। এভাবে পরমাণুসমূহ তার সর্বশেষ শক্তিস্তরে ৪টি ইলেকট্রন ধারণ করে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ইলেকট্রন বিন্যাস লাভের মাধ্যমে যৌগ গঠনের পদ্ধতিকে 'অষ্টক' নিয়ম বলে।

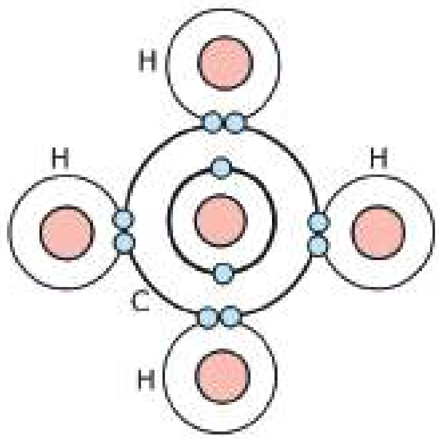

চিত্র ৫.০২: মিথেন অণুতে অষ্টক নিয়ম

'অষ্টক' নিয়মের কিছু সীমাবদ্ধতার কারণে বিজ্ঞানীরা নতুন একটি নিয়মের উপস্থাপন করেন। যাকে 'দুই'-এর নিয়ম বলা হয়। 'দুই' -এর নিয়মটি অষ্টক নিয়ম থেকে অধিকতর উপযোগী এবং আধুনিক। নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলোর সর্বশেষ শক্তিস্তরে যেমন 2টি বা ৪টি ইলেকট্রন বিদ্যমান, তেমনি অণু গঠনে কোনো পরমাণুর সর্বশেষ শক্তিস্তরে এক বা একাধিক জোড়া ইলেকট্রন বিদ্যমান থাকবে, এটিই হচ্ছে 'দুই' এর নিয়ম। অর্থাৎ অণুতে যেকোনো পরমাণুর সর্বশেষ শক্তিস্তরে এক বা একাধিক জোড়া ইলেকট্রন অবস্থান করবে।

যেমন– $BeCl_2$ অণুর কেন্দ্রীয় পরমাণু Be এর সর্বশেষ শক্তিস্তরে 2 জোড়া অর্থাৎ 4টি ইলেকট্রন বিদ্যমান। BF_3 অণুর কেন্দ্রীয় পরমাণু B এর সর্বশেষ শক্তিস্তরে 3 জোড়া অর্থাৎ 6টি ইলেকট্রন বিদ্যমান। CH_4, অণুর কেন্দ্রীয় পরমাণু C এর সর্বশেষ শক্তিস্তরে 4 জোড়া অর্থাৎ ৪টি ইলেকট্রন বিদ্যমান। শুধু তাই নয়

কেন্দ্রীয় পরমাণু ছাড়াও অন্য পরমাণুগুলো অর্থাৎ Cl এর সর্বশেষ শক্তিস্তরে 4 জোড়া অর্থাৎ ৪টি ইলেকট্রন বিদ্যমান।

F সর্বশেষ শক্তিস্তরে 4 জোড়া অর্থাৎ ৪টি ইলেকট্রন বিদ্যমান এবং H এর সর্বশেষ শক্তিস্তরে 1 জোড়া অর্থাৎ 2টি ইলেকট্রন বিদ্যমান। এক্ষেত্রে সকল পরমাণু 'দুই' এর নিয়ম অনুসরণ করেছে। উল্লেখ্য, পর্যায় সারণির 1-20 পর্যন্ত মৌলসমূহ মূলত 'অষ্টক' ও 'দুই' এর নিয়ম ভালোভাবে অনুসরণ করে।

৫.৭ নিষ্ক্রিয় গ্যাস এবং এর স্থিতিশীলতা (Inert Gases and their Stability)

পর্যায় সারণি অধ্যায়ে তোমরা নিষ্ক্রিয় গ্যাস তথা 18 নং গ্রুপের মৌল সম্পর্কে বিস্তারিত জেনেছ। এদের ইলেকট্রন বিন্যাস সম্পর্কেও জ্ঞান লাভ করেছো। তারপরও এখানে এদের ইলেকট্রন বিন্যাস দেখানো হলো:

$He(2) \rightarrow 1s^2$

$Ne(10) \rightarrow 1s^2 2s^2 2p^6$

$Ar(18) \rightarrow 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$

$Kr(36) \rightarrow 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6$

$Xe(54) \rightarrow 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6 4d^{10} 5s^2 5p^6$

$Rn(86) \rightarrow 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6 4d^{10} 4f^{14} 5s^2 5p^6 5d^{10} 6s^2 6p^6$

নিষ্ক্রিয় গ্যাসসমূহের ইলেকট্রন বিন্যাসে দেখা যায় যে, হিলিয়ামের সর্বশেষ শক্তিস্তরে 2টি ইলেকট্রন রয়েছে। হিলিয়ামের বেলায় তার সর্বশেষ শক্তিস্তর পূর্ণ করতে 2টি ইলেকট্রনই প্রয়োজন, কাজেই এই ইলেকট্রন বিন্যাস স্থিতিশীল। অন্যান্য নিষ্ক্রিয় গ্যাসের বেলায় তাদের সর্বশেষ শক্তিস্তরে ৪টি (ns^2np^6) করে ইলেকট্রন বিদ্যমান। কোনো মৌলের সর্বশেষ শক্তিস্তরে ৪টি করে ইলেকট্রন থাকলে তারা সর্বাধিক স্থিতিশীলতা অর্জন করে। সর্বশেষ শক্তিস্তরে 2টি থাকলে তাকে দ্বিত্ব বলে আর ৪টি ইলেকট্রন থাকলে তাকে অষ্টক বলে। সর্বশেষ শক্তিস্তরে দ্বিত্ব ও অষ্টক পূর্ণ থাকার কারণে নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলো অধিকতর স্থিতিশীল হয়। অধিকতর স্থিতিশীলতার কারণে নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলো অন্য কোনো মৌলকে ইলেকট্রন প্রদান করে না। এমনকি অপর কোনো মৌলের কাছ থেকে কোনো ইলেকট্রন গ্রহণও করে না। এরা রাসায়নিকভাবে আসক্তিহীন হয়ে পড়ে বা এরা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। নিষ্ক্রিয় গ্যাস ছাড়া বাকি কোনো মৌলেরই সর্বশেষ শক্তিস্তরে এরূপ দ্বিত্ব বা অষ্টক পূর্ণ থাকে না। ফলে তারা স্থিতিশীল হয় না। অন্যান্য মৌল স্থিতিশীলতা অর্জনের জন্য সর্বশেষ শক্তিস্তরে দ্বিত্ব বা অষ্টক পূরণ করতে চায়। এজন্য তারা সর্বশেষ শক্তিস্তরে ইলেকট্রন গ্রহণ, প্রদান অথবা ভাগাভাগি করে পরস্পরের সাথে বন্ধন গঠন করে।

৫.৮ রাসায়নিক বন্ধন ও রাসায়নিক বন্ধন গঠনের কারণ (Chemical Bonds and the Causes of Their Formation)

দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে হাইড্রোজেন অণু (H_2) গঠন করে। অনুরূপভাবে, হাইড্রোজেন ও ক্লোরিন পরমাণু পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড অণু (H-Cl) গঠন করে। প্রথম ক্ষেত্রে হাইড্রোজেন অণুতে দুটি হাইড্রোজেন পরমাণুর মধ্যে এক ধরনের আকর্ষণ বল কাজ করে। আবার, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড অণুতে হাইড্রোজেন ও ক্লোরিন পরমাণুর মধ্যে এক ধরনের আকর্ষণ বল কাজ করে। এ ধরনের আকর্ষণ বলই মূলত রাসায়নিক বন্ধন। অর্থাৎ অণুতে পরমাণুসমূহ যে আকর্ষণের মাধ্যমে একে অপরের সাথে যুক্ত থাকে তাকেই রাসায়নিক বন্ধন বলে। এখন প্রশ্ন হলো পরমাণুসমূহ কেন আলাদাভাবে থাকেনি? কেন তারা পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে অণু তৈরি করল?

তোমরা এর মাঝে জেনে গেছ যে, প্রত্যেক মৌলই তার সর্বশেষ শক্তিস্তরে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের স্থিতিশীল ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জনের চেষ্টা করে। একই মৌলের বা ভিন্ন মৌলের দুটি পরমাণু যখন কাছাকাছি অবস্থান করে তখন তারা তাদের সর্বশেষ শক্তিস্তরে ইলেকট্রন গ্রহণ, বর্জন বা ভাগাভাগির মাধ্যমে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জন করে। এর মাধ্যমে তাদের মধ্যে এক ধরনের আকর্ষণের সৃষ্টি হয়, যে আকর্ষণকে আমরা রাসায়নিক বন্ধন বলি। কাজেই বলা যেতে পারে রাসায়নিক বন্ধন গঠনের মূল কারণ হলো পরমাণুগুলোর সর্বশেষ শক্তিস্তরের ইলেকট্রনগুলো নিষ্ক্রিয় গ্যাসের স্থিতিশীল ইলেকট্রন বিন্যাস (দ্বিত্ব বা অষ্টক) লাভের প্রবণতা।

৫.৯ ক্যাটায়ন ও অ্যানায়ন (Cations and Anions)

আমরা জানি, সাধারণ অবস্থায় পরমাণুর নিউক্লিয়াসে যতটি ধনাত্মক আধান বা পজিটিভ চার্জবিশিষ্ট প্রোটন থাকে এবং নিউক্লিয়াসের বাইরে বিভিন্ন শক্তিস্তরে ঠিক ততটি ঋণাত্মক আধান বা নেগেটিভ চার্জবিশিষ্ট ইলেকট্রন থাকে। এর ফলে পরমাণুটি সামগ্রিকভাবে আধান বা চার্জ নিরপেক্ষ হয়। এরকম একটি আধান নিরপেক্ষ পরমাণুর বাইরের শক্তিস্তর থেকে এক বা একাধিক ইলেকট্রনকে সরিয়ে নিলে পরমাণুটি আর আধান নিরপেক্ষ থাকবে না। এটি সামগ্রিকভাবে ধনাত্মক আধানবিশিষ্ট আয়নে পরিণত হবে। ধনাত্মক আধান বা পজিটিভ চার্জ বিশিষ্ট এরূপ আয়নকে ক্যাটায়ন বলে। সাধারণত পর্যায় সারণির বামের মৌল বা ধাতুগুলো তাদের সর্বশেষ শক্তিস্তরের এক বা একাধিক ইলেকট্রন ত্যাগ করে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ইলেকট্রন বিন্যাস লাভের মাধ্যমে ক্যাটায়নের সৃষ্টি করে। যেমন- লিথিয়াম পরমাণু তার সর্বশেষ শক্তিস্তরের একটি ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়ে নিষ্ক্রিয় গ্যাস হিলিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জনের মাধ্যমে লিথিয়াম ক্যাটায়ন (Li^+) তৈরি করে। 5.03 চিত্রে তা দেখানো হলো।

অনুরূপে, Na পরমাণু তার সর্বশেষ শক্তিস্তরের একটি ইলেকট্রন ত্যাগ করে নিষ্ক্রিয় গ্যাস Ne এর ইলেকট্রন বিন্যাস লাভের মাধ্যমে সোডিয়াম ক্যাটায়ন (Na^+) তৈরি করে।

বলতে পারবে কি, ধাতুসমূহ কেন তাদের সর্বশেষ শক্তিস্তরের ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়ে ক্যাটায়ন তৈরি করে?

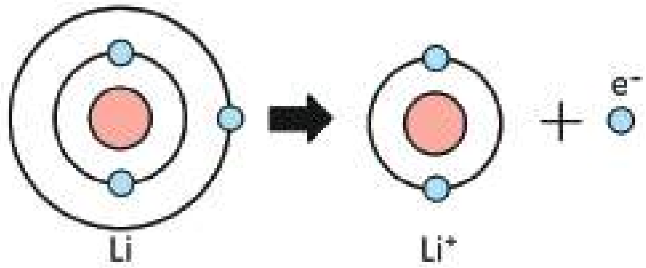

চিত্র ৫.০৩: লিথিয়াম ক্যাটায়ন (Li^+) গঠন

আমরা জানি, পর্যায় সারণির যেকোনো একটি পর্যায়ে বাম থেকে ডানে গেলে মৌলসমূহের ধাতব ধর্ম ধীরে ধীরে হ্রাস পায় এবং অধাতব ধর্ম বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ যেকোনো পর্যায়ের বামের মৌলসমূহ হলো ধাতু এবং ডানের মৌলসমূহ হলো অধাতু। আবার একই পর্যায়ে বাম থেকে ডানে গেলে মৌলসমূহ আকারও ধীরে ধীরে হ্রাস পায়। এই কারণে একই পর্যায়ে অবস্থিত অন্য মৌলসমূহের চেয়ে ধাতুগুলোর আকার বড় হয়ে থাকে। আবার ধাতুগুলোর সর্বশেষ শক্তিস্তরে সাধারণত 1, 2 বা 3টি ইলেকট্রন থাকে। আকার বড় হওয়ার কারণে ধাতুগুলোর সর্বশেষ শক্তিস্তরের ইলেকট্রনগুলোর নিউক্লিয়াস থেকে দূরে থাকে এবং নিউক্লিয়াসের সাথে আকর্ষণ কম হয় অর্থাৎ দুর্বলভাবে আবদ্ধ থাকে। ফলে এদের আয়নিকরণ শক্তির মান অনেক কম হয়। অর্থাৎ সামান্য পরিমাণ শক্তি প্রয়োগ করলেই ধাতুগুলো তার সর্বশেষ শক্তিস্তরের এক বা একাধিক ইলেকট্রন ত্যাগ করে কাছাকাছি নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জন করে ক্যাটায়নে পরিণত হতে পারে। এই কারণেই ধাতুগুলোই মূলত ক্যাটায়নে পরিণত হয়।

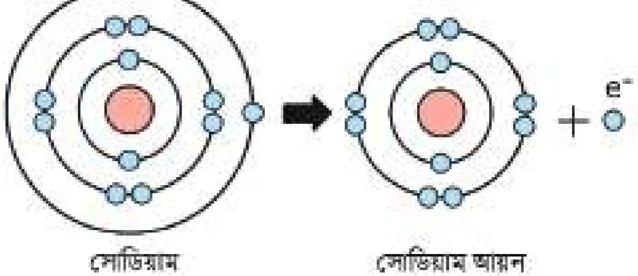

চিত্র ৫.০৪: সোডিয়াম ক্যাটায়ন (Na^+) গঠন

অন্যদিকে অধাতুগুলো ক্যাটায়ন তৈরি করে না। এর কারণও তোমরা এখন নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছো। অধাতুগুলো পর্যায় সারণির ডানে অবস্থান করে। এদের সর্বশেষ শক্তিস্তরে সাধারণত 5, 6 বা 7টি ইলেকট্রন বিদ্যমান থাকে। এদের আকার একই পর্যায়ের ধাতুসমূহের চেয়ে অনেক ছোট হয়। ছোট আকারের কারণে সর্বশেষ শক্তিস্তর নিউক্লিয়াসের কাছাকাছি থাকে এবং এদের সর্বশেষ শক্তিস্তরের ইলেকট্রনের প্রতি নিউক্লিয়াসের আকর্ষণ অনেক বেশি হয়, অর্থাৎ এদের আয়নিকরণ শক্তির মান অনেক

বেশি হয়। এরূপ কোনো মৌলের সর্বশেষ শক্তিস্তরের এক বা একাধিক ইলেকট্রনকে সরিয়ে নিতে অনেক বেশি শক্তির প্রয়োজন হয়, যা সাধারণ অবস্থায় কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া থেকে সহজে পাওয়া যায় না। এ কারণে অধাতুগুলো সাধারণত ধনাত্মক আধান তথা ক্যাটায়ন তৈরি করে না।

তাহলে কি অধাতুগুলো তার সর্বশেষ শক্তিস্তরে ইলেকট্রনের কোনো পরিবর্তন ঘটায় না? অবশ্যই ঘটায়। যেহেতু এদের সর্বশেষ শক্তিস্তরে অষ্টক অপেক্ষা সাধারণত 1, 2 কিংবা 3টি ইলেকট্রন কম থাকে সেহেতু এরা সেই সংখ্যক ইলেকট্রন গ্রহণ করে সহজেই নিষ্ক্রিয় গ্যাসের স্থিতিশীল ইলেকট্রন বিন্যাস লাভ করে। অন্যভাবে বলা যায়, এদের ইলেকট্রন আসক্তির মান বেশি। ইলেকট্রন গ্রহণের ফলে এদের নিউক্লিয়াসে অবস্থিত ধনাত্মক প্রোটন সংখ্যার চেয়ে ঋণাত্মক আধানবিশিষ্ট ইলেকট্রনের সংখ্যা বেশি হয়। ফলে সামগ্রিকভাবে অধাতব পরমাণুসমূহ ঋণাত্মক আধানবিশিষ্ট হয়। এভাবে ঋণাত্মক আধানবিশিষ্ট অধাতব পরমাণুকে অ্যানায়ন বলে। যেমন ক্লোরিন (Cl) পরমাণু একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে নিষ্ক্রিয় গ্যাস আর্গনের (Ar) ইলেকট্রন বিন্যাস লাভের মাধ্যমে ক্লোরাইড (Cl^-) আয়ন তৈরি করে।

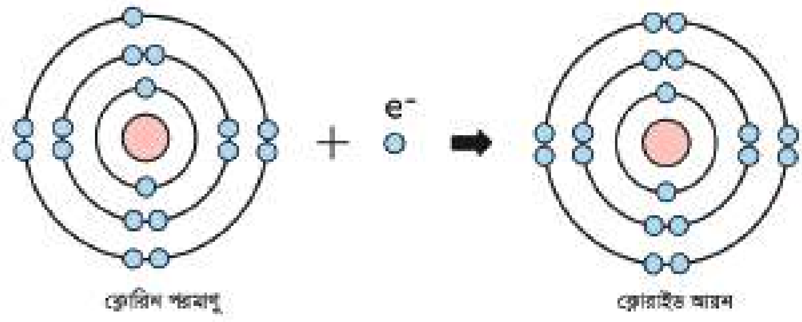

চিত্র ৫.০৫: ঋণাত্মক Cl^- আয়ন গঠন

৫.১০ আয়নিক বন্ধন বা তড়িৎযোজী বন্ধন (Ionic Bond or Electrovalent Bond)

আমরা ইতঃপূর্বে জেনেছি, ধাতুগুলোর আয়নিকরণ শক্তির মান অনেক কম হওয়ায় এরা অতি সহজেই সর্বশেষ শক্তিস্তরের এক বা একাধিক ইলেকট্রন ত্যাগ করে ধনাত্মক আধানবিশিষ্ট আয়ন বা ক্যাটায়নে পরিণত হয়। আবার অধাতুগুলোর ইলেকট্রন আসক্তির মান বেশি হওয়ায় এরা সহজেই সর্বশেষ শক্তিস্তরে এক বা একাধিক ইলেকট্রন গ্রহণ করে ঋণাত্মক আধানবিশিষ্ট আয়ন বা অ্যানায়নে পরিণত হয়। এভাবে সৃষ্ট বিপরীত আধানের ক্যাটায়ন ও অ্যানায়নের মধ্যে স্থির বৈদ্যুতিক আকর্ষণ বল বা ইলেকট্রোস্ট্যাটিক বল কাজ করে। এই ইলেকট্রোস্ট্যাটিক বল বা কুলম্ব আকর্ষণ বলের ফলে তারা একে অপরের সাথে ২০২৫

যুক্ত থাকে। যে আকর্ষণের ফলে ক্যাটায়ন ও অ্যানায়ন পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকে সেটিই আয়নিক বা তড়িৎযোজী বন্ধন। যেমন- Na পরমাণু তার সর্বশেষ শক্তিস্তরের একটি ইলেকট্রন ত্যাগ করে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের মতো ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জন করে অর্থাৎ সর্বশেষ শক্তিস্তরে ৪টি ইলেকট্রন গঠন করে Na^+ ক্যাটায়নে পরিণত হয়। অপরদিকে Cl পরমাণু তার সর্বশেষ শক্তিস্তরে Na এর ত্যাগকৃত ইলেকট্রনটিকে গ্রহণ করে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের মতো ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জন করে অর্থাৎ সর্বশেষ শক্তিস্তরে ৪টি ইলেকট্রন গঠন করে Cl^- অ্যানায়নে পরিণত হয়। এভাবে সৃষ্ট ধনাত্মক আধান Na^+ ও ঋণাত্মক আধান Cl^- পরস্পরের সাথে স্থির বৈদ্যুতিক আকর্ষণে আবদ্ধ হয়। এ আকর্ষণ বলই আয়নিক বন্ধন। অর্থাৎ ধাতব ও অধাতব পরমাণুর রাসায়নিক সংযোগের সময় ধাতব পরমাণু তার সর্বশেষ শক্তিস্তরের এক বা একাধিক ইলেকট্রনকে অধাতব পরমাণুর সর্বশেষ শক্তিস্তরে স্থানান্তর করে ধনাত্মক ঋণাত্মক আয়ন সৃষ্টির মাধ্যমে যে বন্ধন গঠিত হয় তাকে আয়নিক বা তড়িৎযোজী বন্ধন বলে। যে যৌগে আয়নিক বন্ধন থাকে তাকে আয়নিক যৌগ বলে।

$$Na \longrightarrow Na^+ + e^-$$
$$Cl + e^- \longrightarrow Cl^-$$
$$Na + Cl \longrightarrow Na^+ + Cl^- = NaCl$$

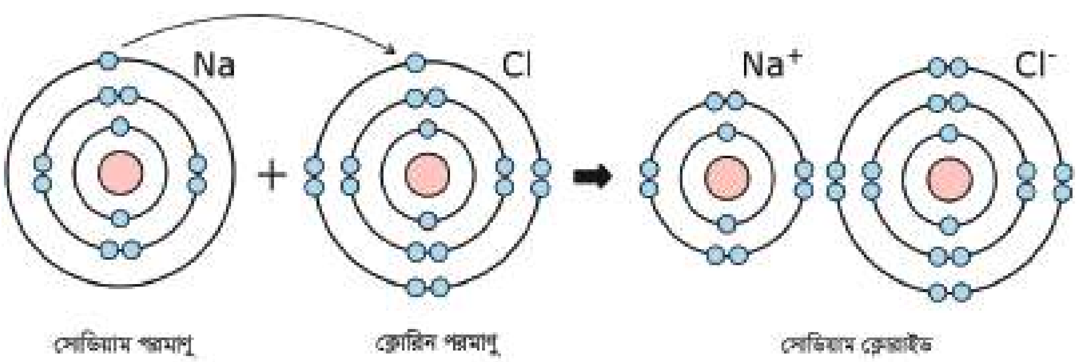

চিত্র ৫.০৬: সোডিয়াম ক্লোরাইড গঠন

MgO অণুতে Mg 2টি ইলেকট্রন ত্যাগ করে নিষ্ক্রিয় গ্যাস Ne এর মতো ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জন করে অর্থাৎ সর্বশেষ শক্তিস্তরে ৪টি ইলেকট্রন গঠন করে Mg^{2+} এ পরিণত হয়।

$$Mg \longrightarrow Mg^{2+} + 2e^-$$

আবার O পরমাণু ঐ 2টি ইলেকট্রন গ্রহণ করে নিষ্ক্রিয় গ্যাস Ne এর মতো ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জন করে অর্থাৎ সর্বশেষ শক্তিস্তরে ৪টি ইলেকট্রন গঠন করে O^{2-} এ পরিণত হয়।

$$O + 2e^- \longrightarrow O^{2-}$$

এবার Mg^{2+} এবং O^{2-} কাছাকাছি এসে আয়নিক বন্ধন তৈরি করে। যে যৌগে আয়নিক বন্ধন বিদ্যমান সেই যৌগকে আয়নিক যৌগ বলে। যেমন- MgO একটি আয়নিক যৌগ।

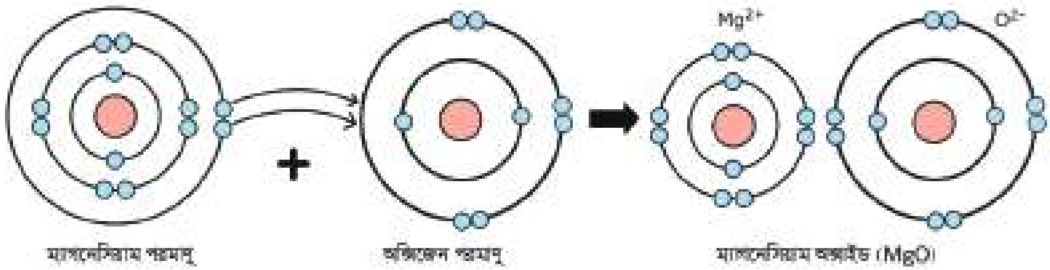

চিত্র ৫.০৭: ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড গঠন

NaH অণুতে Na পরমাণু ইলেকট্রন দান করে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের মতো ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জন করে অর্থাৎ সর্বশেষ শক্তিস্তরে 8টি ইলেকট্রন গঠন করে Na^+ এ পরিণত হয় এবং H পরমাণু ঐ ইলেকট্রন গ্রহণ করে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের মতো ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জন করে অর্থাৎ সর্বশেষ শক্তিস্তরে 2টি ইলেকট্রন গঠন করে H^- এ পরিণত হয়। অতঃপর এদের মধ্যে আয়নিক বন্ধন গঠিত হয়।

$$Na \longrightarrow Na^+ + e^-$$
$$H + e^- \longrightarrow H^-$$

CaO অণুতে Ca পরমাণু 2টি ইলেকট্রন ত্যাগ করে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের মতো ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জন করে অর্থাৎ সর্বশেষ শক্তিস্তরে 8টি ইলেকট্রন গঠন করে Ca^{2+} তে পরিণত হয়।

$$Ca \longrightarrow Ca^{2+} + 2e^-$$

O পরমাণু সেই 2টি ইলেকট্রন গ্রহণ করে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের মতো ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জন করে অর্থাৎ সর্বশেষ শক্তিস্তরে 8টি ইলেকট্রন গঠন করে O^{2-} এ পরিণত হয়

$$O + 2e^- \longrightarrow O^{2-}$$

অতএব Ca^{2+} এবং O^{2-} এর মধ্যে আয়নিক বন্ধন গঠিত হয়।

উপরের উদাহরণগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ধাতুগুলো ইলেকট্রন বর্জন এবং অধাতুগুলো ধাতু কর্তৃক বর্জন করা ইলেকট্রন গ্রহণ করে যথাক্রমে ক্যাটায়ন ও অ্যানায়নে পরিণত হয়। এই ক্যাটায়ন ও অ্যানায়ন পরস্পরের কাছাকাছি আবদ্ধ হয়ে আয়নিক বন্ধন তৈরি করে। উল্লেখ্য, পর্যায় সারণির 1 ও 2 নম্বর গ্রুপের ধাতব মৌলসমূহ এবং 16 ও 17 নম্বর গ্রুপের অধাতব মৌলসমূহ সাধারণত আয়নিক বন্ধন

তৈরি করে। প্রত্যেকটি নিয়মের কিছু না কিছু ব্যতিক্রম থাকে। যেমন-এখানে 13 নম্বর গ্রুপের Al মৌলটি 1 ও 2 নম্বর গ্রুপের মৌল না হওয়া সত্ত্বেও আয়নিক বন্ধন তৈরি করে। অন্য মৌলসমূহ তাদের সর্বশেষ শক্তিস্তরে অনেক বেশি ইলেকট্রন ধারণ করার কারণে তারা ইলেকট্রন বর্জন বা গ্রহণ করার প্রবণতা দেখায় না। ফলে তারা আয়নিক বন্ধনও তৈরি করে না। আয়নিক বন্ধন স্থির বৈদ্যুতিক আকর্ষণের মাধ্যমে ঘটে বলে এ বন্ধন খুবই শক্তিশালী হয়।

৫.১১ সমযোজী বন্ধন (Covalent Bond)

তোমরা ইতঃপূর্বে জেনেছ যে, একটি ধাতব পরমাণু ও একটি অধাতব পরমাণু রাসায়নিক সংযোগের সময় ধাতু তার সর্বশেষ শক্তিস্তরের ইলেকট্রন অধাতব পরমাণুর সর্বশেষ শক্তিস্তরে স্থানান্তর করে ক্যাটায়ন ও অ্যানায়ন তৈরির মাধ্যমে আয়নিক বন্ধনের সৃষ্টি করে। কিন্তু তুমি যদি দুটি অধাতব পরমাণুর মধ্যে রাসায়নিক সংযোগ করাতে চাও তাহলে সেটি কীভাবে ঘটবে? অধাতুর বেলায় পরমাণুর শেষ শক্তিস্তরের ইলেকট্রন ত্যাগ বা গ্রহণ করা সহজ নয় বলে তাদের ভেতর বন্ধন তৈরি করা কঠিন মনে হতে পারে। কিন্তু বাস্তবে দুটি অধাতব পরমাণু বন্ধন গঠন করে। যেমন- দুটি ক্লোরিন (অধাতু) পরমাণুকে যখন কাছাকাছি রাখা হয় তখন তাদের মধ্যে এক ধরনের রাসায়নিক বন্ধন গঠিত হয়ে ক্লোরিন অণুতে পরিণত হয়। প্রশ্ন হলো কীভাবে দুটি অধাতব ক্লোরিন পরমাণু একে অপরের সাথে বন্ধন তৈরি করে? এদের তো সর্বশেষ শক্তিস্তরে সাতটি করে ইলেকট্রন আছে।

ক্লোরিনের ইলেকট্রন বিন্যাস হলো: $Cl\ (17) \rightarrow 1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^5$

Cl এর সর্বশেষ শক্তিস্তরে সাতটি ইলেকট্রন থাকায় ক্লোরিন পরমাণু সর্বশেষ শক্তিস্তরের ইলেকট্রন প্রদান করতে চাইবে না বরং গ্রহণের প্রবণতা দেখাবে। কিন্তু দাতা পরমাণু না থাকায় গ্রহণ প্রক্রিয়াও ঘটবে না। তাই দুটি ক্লোরিন পরমাণু কাছাকাছি এলে প্রত্যেকটি পরমাণুর সর্বশেষ শক্তিস্তর থেকে 1টি করে ইলেকট্রন এসে জোড়বদ্ধ হয় এবং ঐ ইলেকট্রন জোড় উভয় পরমাণুর নিউক্লিয়াসের মাঝামাঝি অবস্থান করে। একে ইলেকট্রনের ভাগাভাগি বা ইলেকট্রনের শেয়ারিং বলে। এর ফলে উভয় পরমাণু তাদের সর্বশেষ শক্তিস্তরে আটটি করে ইলেকট্রন লাভ করে অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় গ্যাস এর ইলেকট্রন বিন্যাস লাভ করে। ফলস্বরূপ দুটি ক্লোরিন পরমাণুর নিউক্লিয়াসগুলো একে অপরের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে পারে না অর্থাৎ এরা এক ধরনের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এ ধরনের বন্ধনকে সমযোজী বন্ধন বলে। অর্থাৎ দুটি অধাতব পরমাণুর রাসায়নিক সংযোগের সময় অধাতব পরমাণুদ্বয় তাদের সর্বশেষ শক্তিস্তরের (এক বা একাধিক) একটি ইলেকট্রনকে সরবরাহ করে এক জোড়া ইলেকট্রন তৈরি করে। এরপর এই এক জোড়া ইলেকট্রন উভয় পরমাণু শেয়ারের মাধ্যমে যে বন্ধন গঠিত হয় তাকে সমযোজী বন্ধন বলে। যে যৌগে সমযোজী বন্ধন থাকে তাকে সমযোজী যৌগ বলে। প্রতিটি সমযোজী বন্ধনে দুটি ইলেকট্রন

অংশগ্রহণ করে। সমযোজী বন্ধনকে একটি রেখার (–) মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় এবং ইলেকট্রনসমূহকে ডট (·) চিহ্ন বা ক্রস (×) চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

ক্লোরিন অণুতে দুটি ক্লোরিন পরমাণু বিদ্যমান। ক্লোরিন অণুর সংকেত হলো Cl_2। অনেক অধাতু অণু আকারে থাকে। যেমন- হাইড্রোজেন (H_2), অক্সিজেন (O_2), নাইট্রোজেন (N_2), সালফার (S_8), ফসফরাস (P_4), ব্রোমিন (Br_2), আয়োডিন (I_2), ফ্লোরিন (F_2) ইত্যাদি।

H_2 অণুতে সমযোজী বন্ধন: হাইড্রোজেন পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাস হলো, $H(1) \rightarrow 1s^1$। দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু যখন কাছাকাছি আসে তখন উভয় পরমাণুই একটি করে ইলেকট্রন শেয়ার করে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের মতো ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জন করে অর্থাৎ সর্বশেষ শক্তিস্তরে 2টি ইলেকট্রন গঠন করে। এর ফলে (H – H) সমযোজী বন্ধনের সৃষ্টি হয়।

$$H\cdot + \cdot H \longrightarrow H\cdot\cdot H$$

চিত্র ৫.০৮: হাইড্রোজেন অণুতে সমযোজী বন্ধন গঠন

O_2 অণুতে সমযোজী বন্ধন: অক্সিজেন পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাস হলো, $O(8) \rightarrow 1s^2 2s^2 2p^4$। অক্সিজেন পরমাণুর সর্বশেষ শক্তিস্তরে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ইলেকট্রন বিন্যাস (অষ্টক) অপেক্ষা দুটি ইলেকট্রন

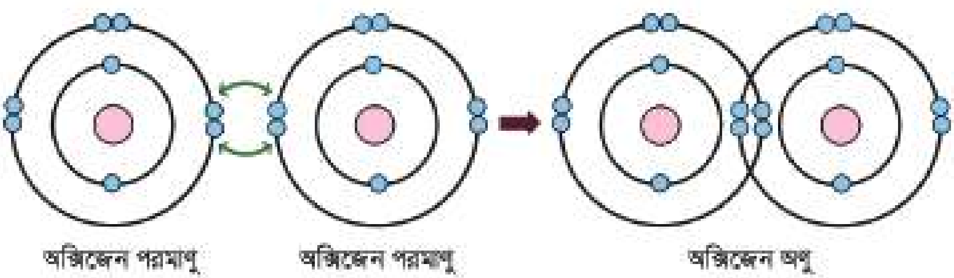

চিত্র ৫.০৯: অক্সিজেন অণুতে সমযোজী বন্ধন গঠন

কম আছে। এরূপ দুটি অক্সিজেন পরমাণু কাছাকাছি এলে তাদের উভয় পরমাণুই নিষ্ক্রিয় গ্যাসের মতো ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জন করে অর্থাৎ সর্বশেষ শক্তিস্তরে ৪টি ইলেকট্রন গঠন করে। ফলে তাদের

মধ্যে (O=O) সমযোজী বন্ধন গঠিত হয়। এক্ষেত্রে উভয় পরমাণু দুটি করে মোট চারটি ইলেকট্রন শেয়ার করায় সমযোজী বন্ধনের সংখ্যা হয় 2 (দুই)। যেমন:

সাধারণভাবে, $O + O \longrightarrow O = O$ বা O_2

এতক্ষণ আমরা একই অধাতব পরমাণু দ্বারা গঠিত অণু তথা মৌলিক অণুসমূহের মধ্যে সমযোজী বন্ধন দেখলাম। মৌলিক অণু ছাড়াও একাধিক ভিন্ন অধাতব পরমাণু দ্বারা গঠিত যৌগিক অণুতেও সমযোজী বন্ধন দেখতে পাওয়া যায়। যেমন- পানির অণুতে অক্সিজেন পরমাণু তার সর্বশেষ শক্তিস্তরের একটি করে ইলেকট্রন প্রত্যেক হাইড্রোজেন পরমাণুর একটি করে ইলেকট্রনের সাথে শেয়ার করে। এভাবে দুটি (O–H) সমযোজী বন্ধন গঠনের মাধ্যমে পানির অণু গঠিত হয়।

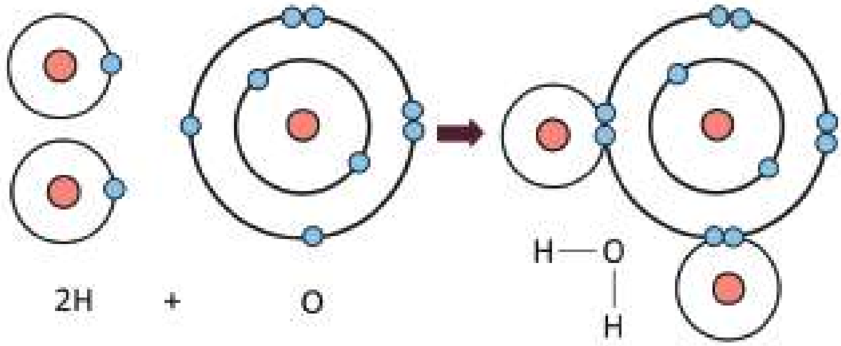

চিত্র ৫.১০: দুটি (O-H) সমযোজী বন্ধনের মাধ্যমে পানির অণুতে সমযোজী বন্ধন গঠন

H_2O অণুতে O পরমাণুর 2 জোড়া ইলেকট্রন অর্থাৎ 4টি ইলেকট্রন এখানে কোনো বন্ধন গঠন করেনি। কিন্তু প্রয়োজন হলে এই চারটি ইলেকট্রন বন্ধন গঠন করতে পারে। এই বিষয়গুলো তোমরা উচ্চতর শ্রেণিতে জানতে পারবে।

O পরমাণু সমযোজী এবং আয়নিক উভয় প্রকার যৌগ গঠন করলেও Na পরমাণু কখনোই সমযোজী যৌগ গঠন করে না। Na পরমাণু সব সময় আয়নিক যৌগ গঠন করে। কারণ হিসেবে বলা যায়, O পরমাণু কোনো মৌল থেকে 2টি ইলেকট্রন গ্রহণ করেও ঐ মৌলের সাথে আয়নিক বন্ধন তৈরি করে আবার কোনো মৌলের সাথে 2টি ইলেকট্রন শেয়ার করেও ঐ মৌলের সাথে সমযোজী বন্ধন তৈরি করতে পারে। Na পরমাণু সব সময় ইলেকট্রন ত্যাগ করে কোনো মৌলের সাথে আয়নিক বন্ধন তৈরি করে। কিন্তু Na পরমাণু কোনো মৌলের সাথেই ইলেকট্রন শেয়ার করে সমযোজী বন্ধন তৈরি করে না।

সমযোজী বন্ধনবিশিষ্ট মৌলিক পদার্থের অণুকে (যেমন: N_2, O_2, Cl_2, Br_2, I_2) সমযোজী অণু এবং সমযোজী বন্ধনবিশিষ্ট যৌগকে সমযোজী যৌগ অণু বলা হয় (যেমন: CH_4, CO_2, HCl, NH_3 ইত্যাদি)।

অনেক সমযোজী অণু স্বাভাবিক তাপমাত্রা ও চাপে গ্যাসীয় অবস্থায় থাকে। যেমন: CO_2, NH_3, O_2, N_2, Cl_2 ইত্যাদি। আবার কিছু সমযোজী অণু স্বাভাবিক তাপমাত্রা ও চাপে তরল অবস্থায় বিরাজ করে। যেমন: H_2O (পানি), C_2H_5OH (ইথানল) ইত্যাদি এবং কিছু কঠিন অবস্থায় থাকে, যেমন- ন্যাপথালিন ($C_{10}H_8$), সালফার (S_8), আয়োডিন (I_2) ইত্যাদি। দুটি সমযোজী অণু যখন খুবই নিকটবর্তী হয় তখন তাদের মধ্যে এক ধরনের দুর্বল আকর্ষণ বল কাজ করে, এই আকর্ষণ বলকেই ভ্যান্ডারওয়ালস আকর্ষণ বল বলে। সমযোজী অণুগুলো পরস্পরের সাথে এই দুর্বল ভ্যান্ডারওয়ালস আকর্ষণের মাধ্যমে যুক্ত থাকে। তাই এদেরকে বিচ্ছিন্ন করতে সামান্য শক্তির প্রয়োজন হয়। ফলে এদের গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক অনেক কম হয়। আবার গ্যাসীয় সমযোজী অণুর মধ্যে (যেমন: CO_2, NH_3, O_2 ইত্যাদি) ভ্যান্ডারওয়ালস আকর্ষণ বল নেই বললেই চলে, যার কারণে এরা একক অণু হিসেবে গ্যাসীয় অবস্থায় থাকে।

৫.১২ আয়নিক ও সমযোজী যৌগের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Ionic and Covalent Bonds)

(a) গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক (Melting Point and Boiling Point)

যে যৌগে আয়নিক বন্ধন থাকে সেই যৌগকে আয়নিক যৌগ বলা হয় এবং যে যৌগে সমযোজী বন্ধন থাকে সেই যৌগকে সমযোজী যৌগ বলা হয়। আয়নিক যৌগের গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক অনেক বেশি হয় কিন্তু সমযোজী যৌগের গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক আয়নিক যৌগ অপেক্ষা কম হয়। কিন্তু কেন? এটি আসলেই সত্যি আয়নিক যৌগে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আধান থাকে। এ আধানদ্বয় পরস্পরের সাথে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকে। আয়নিক যৌগে এরূপ অসংখ্য ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আধান পরস্পরের কাছাকাছি থেকে ত্রিমাত্রিকভাবে সুবিন্যস্ত হয়ে একটি স্ফটিক তৈরি করে। এতে তাদের আন্তঃআণবিক আকর্ষণ বল অনেক বেশি হয়। ফলে এদেরকে একে অপরের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিতে বা গলিয়ে ফেলতে অনেক বেশি তাপশক্তির প্রয়োজন হয়। কাজেই এদের গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক অনেক বেশি হয়। অপর দিকে সমযোজী অণুসমূহের মধ্যে আন্তঃআণবিক আকর্ষণ মূলত দুর্বল ভ্যান্ডারওয়ালস বলের কারণে হয়ে থাকে। কাজেই সমযোজী যৌগে আন্তঃআণবিক আকর্ষণ বল অনেক কম হয়। এজন্য এদেরকে সামান্য তাপ প্রদান করলে এরা পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে যায়। অর্থাৎ এদের গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক কম হয়। একইভাবে তোমরা আয়নিক যৌগ NaCl এর পরিবর্তে $CuSO_4$, $NaNO_3$, KCl, $CaCl_2$ ইত্যাদি ব্যবহার করলেও একই বিষয় দেখবে। অন্যদিকে সমযোজী যৌগ হিসেবে গ্লুকোজ, চিনি ইত্যাদি ব্যবহার করে পরীক্ষাগুলো সম্পন্ন করতে পারো। স্ফুটনাঙ্কের ক্ষেত্রে সমযোজী যৌগ হিসেবে আমাদের অতি পরিচিত পানি ব্যবহার করা যায়। সব পরীক্ষাতেই দেখতে পাবে আয়নিক যৌগের গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক সমযোজী যৌগ থেকে অনেক বেশি।

(b) দ্রাব্যতা/ দ্রবণীয়তা (Solubility)

তোমরা একটি বিকার বা কাচের একটি পাত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণ পানি নাও। এরপর এতে আয়নিক যৌগ হিসেবে খাদ্য লবণ (NaCl) যোগ করে নাড়তে থাকো। দেখবে সমস্ত খাদ্যলবণ পানিতে দ্রবীভূত হয়েছে। এরপর কাপড় কাচা সোডা ($Na_2CO_3.10H_2O$), তুঁতে ($CuSO_4.5H_2O$) বা অন্য বেশ কয়েকটি আয়নিক যৌগ নিয়ে একইভাবে পরীক্ষা সম্পন্ন করো, দেখতে পাবে প্রতি ক্ষেত্রে আয়নিক যৌগ পানিতে দ্রবীভূত হচ্ছে। অর্থাৎ তোমরা বলতে পারো যে, সকল আয়নিক যৌগ পানিতে দ্রবীভূত হয় কিন্তু কিছু কিছু আয়নিক যৌগ আছে, যেমন- সিলভার ক্লোরাইড পানিতে দ্রবীভূত হয় না। অপরদিকে, সমযোজী যৌগ, যেমন- ন্যাপথালিন, সরিষার তেল, কেরোসিন এগুলো নিয়ে একইভাবে পরীক্ষা সম্পন্ন করলে দেখতে পাবে এদের কেউই পানিতে দ্রবীভূত হয়নি। সমযোজী যৌগ সাধারণত পানিতে দ্রবীভূত হয় না তবে কিছু কিছু সমযোজী যৌগ আছে যেমন- চিনি, গ্লুকোজ, অ্যালকোহল এগুলো পানিতে দ্রবীভূত হয়। সুতরাং সামগ্রিকভাবে বলা যায় কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সকল আয়নিক যৌগ পানিতে দ্রবীভূত হয় এবং কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সকল সমযোজী যৌগ পানিতে দ্রবীভূত হয় না।

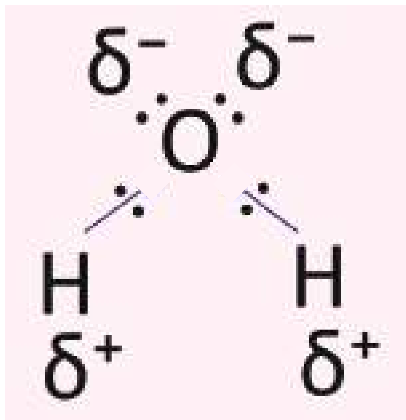

চিত্র ৫.১১: δ^+ ও δ^- দিয়ে আংশিক ধনাত্মক আধান এবং আংশিক ঋণাত্মক আধানকে বোঝানো হচ্ছে

অধিকাংশ সমযোজী যৌগ পানিতে দ্রবীভূত হয় না—তবে কিছু কিছু সমযোজী যৌগ পানিতে দ্রবীভূত হয়, এর কারণ কী? এর কারণ জানতে হলে প্রথমে পানির বন্ধন গঠন সম্পর্কে জানতে হবে। তোমরা জানো, পানি একটি সমযোজী যৌগ অর্থাৎ পানির অণুতে একটি অক্সিজেন পরমাণুর সাথে দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু ইলেকট্রন শেয়ারের মাধ্যমে সমযোজী বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। কিন্তু অক্সিজেন পরমাণু হাইড্রোজেন পরমাণু থেকে অধিক তড়িৎ ঋণাত্মক হওয়ায় পানির অণুর সমযোজী বন্ধনীতে ব্যবহৃত ইলেকট্রন দুটি অক্সিজেনের দিকে সামান্য পরিমাণ সরে যায়। যে কারণে অক্সিজেন পরমাণু আংশিক ঋণাত্মক আধান ও হাইড্রোজেন পরমাণু আংশিক ধনাত্মক আধান প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ পানির অণুতে আংশিক ধনাত্মক এবং আংশিক ঋণাত্মক প্রান্তের সৃষ্টি হয়। এরকম ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আধানপ্রাপ্ত সমযোজী যৌগকে পোলার সমযোজী যৌগ বলে। সুতরাং পানি একটি পোলার সমযোজী যৌগ এবং দ্রাবক হিসেবে পানি একটি পোলার দ্রাবক। মনে রাখবে, সমযোজী বন্ধনীস্থ ইলেকট্রন যুগলকে কোনো পরমাণু কর্তৃক নিজের দিকে আকর্ষণ করার ক্ষমতাকে উক্ত পরমাণুর তড়িৎ ঋণাত্মকতা বলা হয়। δ^+ (ডেলটা প্লাস) ও δ^- (ডেলটা মাইনাস) দিয়ে যথাক্রমে আংশিক ধনাত্মক আধান এবং আংশিক ঋণাত্মক আধানকে বোঝানো হচ্ছে।

পোলার দ্রাবক পানিতে আয়নিক যৌগ যোগ করলে পানির অণুগুলোর ধনাত্মক প্রান্ত আয়নিক যৌগের ঋণাত্মক প্রান্ত বা অ্যানায়নকে আকর্ষণ করে। একইভাবে পানির অণুর ঋণাত্মক প্রান্ত আয়নিক যৌগের ধনাত্মক প্রান্ত বা ক্যাটায়নকে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণ বলের মান যখন আয়নিক যৌগের অ্যানায়ন ও ক্যাটায়নের মধ্যকার আকর্ষণ বল থেকে বেশি হয় তখন অ্যানায়ন ও ক্যাটায়ন পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পানির অণু দিয়ে পরিবেষ্টিত হয়। এভাবে আয়নিক যৌগ পানিতে দ্রবীভূত হয়।

NaCl আয়নিক যৌগ তাই NaCl পোলার দ্রাবক H_2O তে দ্রবীভূত হয়। মিথানল (CH_3OH) পোলার যৌগ তাই CH_3OH পোলার দ্রাবক H_2O তে দ্রবীভূত হয়। মিথেন (CH_4) আয়নিক যৌগও নয় আবার CH_4 পোলার যৌগও নয়, কাজেই CH_4 পানিতে দ্রবণীয় হয় না।

অপরদিকে, সমযোজী যৌগে সাধারণত আয়নিক যৌগের মতো ধনাত্মক ও ঋণাত্মক প্রান্ত থাকে না। তাই পানির অণুর ধনাত্মক ও ঋণাত্মক প্রান্তের সাথে সমযোজী যৌগের কোনো আকর্ষণ বা বিকর্ষণ ঘটে না। ফলস্বরূপ সমযোজী যৌগটি পানিতে আয়ন আকারে ভেঙ্গে যায় না অর্থাৎ সমযোজী যৌগটি পানিতে দ্রবীভূত হয় না।

তবে কিছু কিছু সমযোজী যৌগ আছে যাদের মধ্যে আংশিক ধনাত্মক এবং আংশিক ঋণাত্মক প্রান্ত দেখা যায় অর্থাৎ পোলারিটি দেখা যায়। যেমন- ইথানল (C_2H_5OH) পোলার যৌগ তাই ইথানল পানিতে দ্রবীভূত হয়।

(c) বিদ্যুৎ পরিবাহিতা (Electrical Conductivity):

একটি বিকারে খাদ্য লবণের (NaCl) জলীয় দ্রবণ এবং অন্য একটি বিকারে চিনির জলীয় দ্রবণ নাও। এবার উভয় দ্রবণে ইলেকট্রোড হিসেবে দুটি গ্রাফাইট দণ্ড কিংবা যেকোনো ধাতব দণ্ড ডুবিয়ে দণ্ডদ্বয়ের সাথে ছবিতে দেখানো উপায়ে ব্যাটারি এবং বাল্ব যুক্ত করে বর্তনী পূর্ণ করো। এরপর পর্যবেক্ষণ করো। কী দেখলে? দেখবে যে খাদ্য লবণের দ্রবণযুক্ত বর্তনীতে বাল্ব জ্বলছে কিন্তু চিনির জলীয় দ্রবণযুক্ত বর্তনীতে বাল্ব জ্বলছে না। অর্থাৎ খাদ্য লবণ বা NaCl-এর জলীয় দ্রবণ বিদ্যুৎ পরিবহণ করে কিন্তু চিনির জলীয় দ্রবণ বিদ্যুৎ পরিবহণ করে না। এ থেকে তোমরা মন্তব্য করতে পারবে যে, আয়নিক যৌগ জলীয় দ্রবণে বিদ্যুৎ পরিবহণ করে কিন্তু সমযোজী যৌগ জলীয় দ্রবণে বিদ্যুৎ পরিবহন করে না। কিন্তু এর কারণ কী?

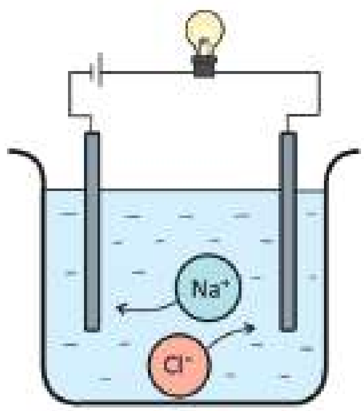

চিত্র ৫.১২: খাদ্য লবণ (NaCl) এর জলীয় দ্রবণে বিদ্যুৎ পরিবহণ

এর কারণ তোমরা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছো। বিদ্যুৎ পরিবহণের জন্য প্রয়োজন বিচ্ছিন্ন ধনাত্মক বা ঋণাত্মক আয়ন। খাদ্য লবণের (NaCl) জলীয় দ্রবণে ধনাত্মক আয়ন হিসেবে Na^+ ও ঋণাত্মক আয়ন হিসেবে Cl^- বিদ্যুৎ পরিবহণ করে।

যেহেতু জলীয় দ্রবণে আয়নিক যৌগসমূহ বিচ্ছিন্ন ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আয়ন হিসেবে অবস্থান করে কাজেই সকল আয়নিক যৌগ জলীয় দ্রবণে বিদ্যুৎ পরিবহণ করে।

অপরদিকে জলীয় দ্রবণে সমযোজী যৌগ বিদ্যুৎ পরিবহণ করে না। কারণ সমযোজী যৌগ কোনো বিচ্ছিন্ন আয়ন তৈরি করে না। আর দ্রবণে আয়ন না থাকলে তা কখনোই বিদ্যুৎ পরিবহণ করতে পারবে না।

$CaCl_2$ দ্রবণে Ca^{2+} ও Cl^- থাকে। HCl দ্রবণে H^+ ও Cl^- থাকে। কাজেই এরা দ্রবণে বিদ্যুৎ পরিবহণ করে। গ্লুকোজ ($C_6H_{12}O_6$) দ্রবণে আয়ন আকারে বিভক্ত হয় না, কাজেই গ্লুকোজ দ্রবণে বিদ্যুৎ পরিবহণ করে না।

দলীয় কাজ

চিত্র ৫.১৩: লবণ ও চিনির কেলাস

কেলাস গঠন (Formation of Crystals)

প্রতিটি দল দুটি করে বিকার নাও। একটি বিকারে খাদ্য লবণ (NaCl) ও অপর বিকারে খানিকটা চিনি ($C_{12}H_{22}O_{11}$) নাও। এই বিকার দুটির মধ্যে পানি যোগ করো। অল্প তাপ দিয়ে যতটুকু সম্ভব লবণ এবং চিনি পানিতে দ্রবীভূত করো। এবার প্রত্যেকটি দ্রবণের মাঝখানে একটা করে সুতা ঝুলিয়ে কয়েক দিনের জন্য রেখে দাও। তারপর সুতাগুলো তুলে দেখো তার উপর লবণ এবং চিনির ক্রিস্টাল বা কেলাস জমা হয়েছে। সাধারণত সকল আয়নিক যৌগ কেলাস আকারে থাকে। অপরদিকে, কিছু কিছু সমযোজী যৌগ যেমন চিনি কেলাস তৈরি করে তবে, বেশির ভাগ সমযোজী যৌগ কেলাস তৈরি করে না।

৫.১৩ ধাতব বন্ধন (Metallic Bond)

ইতঃপূর্বে তোমরা আয়নিক বন্ধন ও সমযোজী বন্ধন সম্পর্কে বিস্তারিত জেনেছ। তোমরা দেখেছ যে একটি ধাতু অপর একটি অধাতুর মধ্যে আয়নিক বন্ধন এবং দুটি অধাতব পরমাণুর মধ্যে সমযোজী বন্ধন গঠিত হয়। কিন্তু দুটি ধাতব পরমাণু কাছাকাছি এলে তাদের মধ্যে যে বন্ধন গঠিত হয় সেটাকে ধাতব বন্ধন বলে। অর্থাৎ এক খণ্ড ধাতুর মধ্যে পরমাণুসমূহ যে আকর্ষণের মাধ্যমে যুক্ত থাকে তাকেই ধাতব বন্ধন বলে। তোমরা তামার (কপার) তার, লোহার (আয়রন) তৈরি ছুরি, কাঁচি, দা কিংবা জানালার গ্রিল, অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি জানালা, সোনার অলংকার ইত্যাদি দেখেছ। এসবের মধ্যে একই ধাতুর অসংখ্য পরমাণু পরস্পরের সাথে ধাতব বন্ধনের মাধ্যমে আবদ্ধ থাকে।

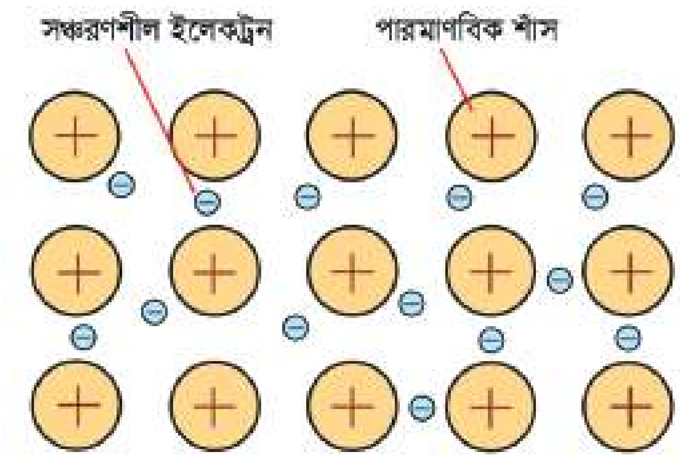

চিত্র ৫.১৪: ধাতব বন্ধন

প্রশ্ন হলো ধাতব বন্ধন কীভাবে তৈরি হয়? প্রত্যেক ধাতব পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাসে সর্বশেষ শক্তিস্তরে সাধারণত 1টি, 2টি কিংবা 3টি ইলেকট্রন থাকে এবং এদের আকার একই পর্যায়ের অধাতব পরমাণুর চেয়ে বড় হওয়ায় ধাতব পরমাণুর সর্বশেষ শক্তিস্তরের ইলেকট্রনের প্রতি নিউক্লিয়াসের আকর্ষণ অনেক কম হয়। ফলে ধাতুতে পরমাণুসমূহ তার সর্বশেষ শক্তিস্তরের এক বা একাধিক ইলেকট্রনকে ত্যাগ করে ধনাত্মক আয়নে পরিণত হয়। এই ধনাত্মক আয়নকে পারমাণবিক শাঁস (Atomic core) বলা হয়।

ধাতব স্ফটিকে পারমাণবিক শাঁসগুলো সুনির্দিষ্ট ত্রিমাত্রিকভাবে বিন্যস্ত থাকে। আর ধাতব পরমাণু কর্তৃক ত্যাগকৃত ইলেকট্রনগুলো উক্ত পারমাণবিক শাঁসের মধ্যবর্তী স্থানে মুক্তভাবে ঘোরাফেরা করে। এই ধরনের ইলেকট্রনকে সঞ্চরণশীল ইলেকট্রন (Delocalized Electron) বলে। এই ইলেকট্রনগুলো কোনো নির্দিষ্ট পরমাণুর অধীনে থাকে না পুরো ধাতব খণ্ডের সবগুলো ধাতব আয়নের ইলেকট্রন হয়ে যায়।

২০২৩

বলা যেতে পারে ইলেকট্রনের সাগরে পারমাণবিক ধাতব আয়নগুলো স্ফটিকের আকারে সুবিন্যস্তভাবে সজ্জিত থাকে। ধাতব স্ফটিকে দুটো ধাতব আয়নের মধ্যবর্তী স্থানে যখন একটি সঞ্চরণশীল ইলেকট্রন অবস্থান করে তখন ইলেকট্রনের প্রতি উভয় ধাতব আয়নই স্থির বৈদ্যুতিক আকর্ষণে আকর্ষিত হয়। এ কারণে ধাতব আয়ন দুটি পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। এটিই মূলত ধাতব বন্ধনের মূল কারণ। ধাতুর মধ্যে সঞ্চরণশীল এই ইলেকট্রনগুলোই তাপ এবং বিদ্যুৎ পরিবহনের জন্য দায়ী। অনুরূপে ধাতুর নমনীয়তা, ঘাতসহতা, ধাতব ঔজ্জ্বল্য ইত্যাদি ধর্ম সঞ্চরণশীল এই ইলেকট্রনের কারণেই ঘটে থাকে।

ধাতুর বিদ্যুৎ পরিবাহিতা

সকল ধাতুই বিদ্যুৎ সুপরিবাহী। ধাতুর স্ফটিকে মুক্তভাবে বিচরণশীল ইলেকট্রনগুলো বিদ্যুৎ পরিবহণের কাজটি করে থাকে। একটি ধাতব খণ্ডের দুই প্রান্তের সাথে ব্যাটারির ধনাত্মক (+) ও ঋণাত্মক (–) প্রান্ত সংযুক্ত করলে ইলেকট্রনগুলো ঋণাত্মক প্রান্ত থেকে ধনাত্মক প্রান্তের দিকে প্রবাহিত হবে। অর্থাৎ ধনাত্মক প্রান্ত থেকে ঋণাত্মক প্রান্তের সঞ্চরণশীল ইলেকট্রনের প্রবাহই বিদ্যুৎ প্রবাহ সৃষ্টি করে। সঞ্চরণশীল ইলেকট্রন না থাকলে ধাতুর মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতো না।

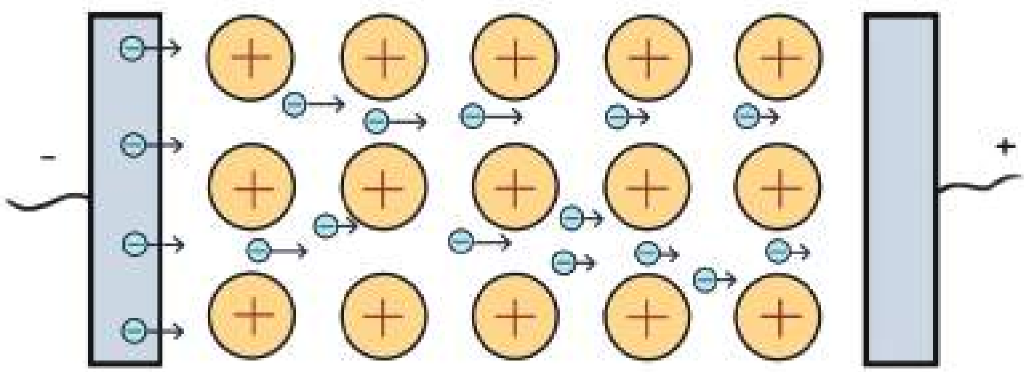

চিত্র ৫.১৫: ধাতুর বিদ্যুৎ পরিবহণের কৌশল

ধাতুর তাপ পরিবাহিতা

এক খণ্ড ধাতব পাতের এক প্রান্তকে আগুনের উপর রেখে উত্তপ্ত করলে দেখতে পাবে অপর প্রান্তটি বেশ তাড়াতাড়ি গরম হতে শুরু করেছে। এর অর্থ ধাতুগুলো তাপ পরিবাহিতাও প্রদর্শন করে। এর কারণও সঞ্চরণশীল ইলেকট্রন। তাপ প্রদানের সাথে সাথে সঞ্চরণশীল ইলেকট্রনগুলো শক্তি গ্রহণ করে, তাদের গতিবেগ বেড়ে যায় এবং ইলেকট্রনগুলো অধিক তাপমাত্রার প্রান্ত থেকে কম তাপমাত্রার প্রান্তের দিকে স্থানান্তরিত হয়। এর ফলে ধাতুতে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে তাপের পরিবহণ ঘটে।

একক কাজ

স্থানীয়ভাবে সহজপ্রাপ্য দ্রব্যের মধ্যে আয়নিক ও সমযোজী যৌগ শনাক্তকরণ

খাদ্য লবণ, কর্পূর, ন্যাপথলিন, কাপড়কাচা সোডা এগুলোকে আলাদাভাবে ভিন্ন ভিন্ন বিকারে রক্ষিত পানির মধ্যে নিয়ে কাচ দণ্ড দিয়ে ভালোভাবে মিশাও। যেগুলো পানিতে দ্রবীভূত হলো সেগুলো আয়নিক যৌগ আর যেগুলো পানিতে দ্রবীভূত হলো না সেগুলো সমযোজী যৌগ। এভাবে অন্য যৌগগুলোকেও পানিতে তাদের দ্রবণীয়তার উপর ভিত্তি করে আয়নিক ও সমযোজী এ দুইভাগে ভাগ করা যায়।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোন যৌগের অণুসমূহের মধ্যে ভ্যান্ডারওয়ালস আকর্ষণ বল বিদ্যমান?

(ক) NaCl (খ) CH_4

(গ) MgO (ঘ) Na_2CO_3

২. নিচের কোন যৌগটি গঠনকালে প্রতিটি পরমাণুই নিয়নের ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জন করে?

(ক) KF (খ) CaS

(গ) MgO (ঘ) NaCl

নিচের মৌলগুলোর ইলেকট্রনিক কাঠামোর আলোকে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

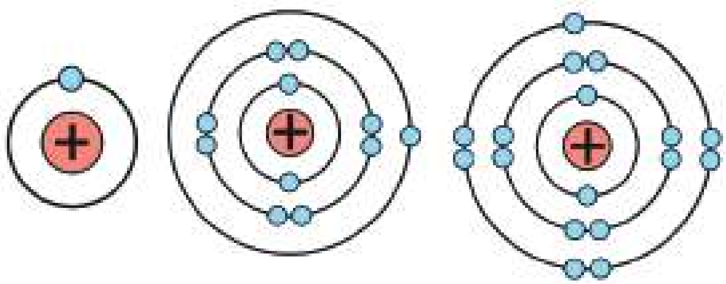

A B D

৩. D চিহ্নিত মৌলের যোজ্যতা ইলেক্ট্রনের সংখ্যা কতটি?

(ক) 1 (খ) 3

(গ) 5 (ঘ) 7

৪. B মৌলটি–

(i) দুই ধরনের বন্ধন গঠন করে

(ii) A কে ইলেকট্রন দান করে

(iii) D -এর সাথে যুক্ত হয়ে পানিতে দ্রবীভূত হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii

(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৫. নিচের কোন যৌগটি পানিতে দ্রবণীয়?

(ক) মিথেন (খ) ন্যাপথালিন

(গ) ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড (ঘ) কার্বন টেট্রাক্লোরাইড

৬. কোন যৌগটি জলীয় দ্রবণে বিদ্যুৎ পরিবহণ করে না?

(ক) NaCl (খ) $CaCl_2$

(গ) HCl (ঘ) $C_6H_{12}O_6$ (গ্লুকোজ)

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.

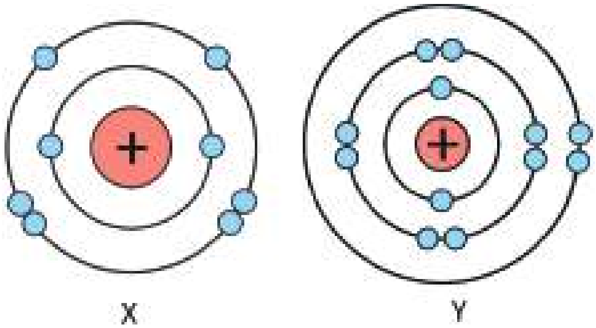

[এখানে X ও Y প্রতীকী অর্থে; কোনো মৌলের প্রতীক নয়]

(ক) সমযোজী বন্ধন কাকে বলে?

(খ) F এর যোজ্যতা ইলেক্ট্রন ও যোজনী সমান নয় কেন? ব্যাখ্যা করো।

(গ) উদ্দীপকের YX যৌগে কোন ধরনের বন্ধন বিদ্যমান? ব্যাখ্যা করো।

(ঘ) X আয়নিক ও সমযোজী উভয় ধরনের যৌগ গঠন করলেও Y কখনো সমযোজী বন্ধন গঠন করে না– যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করো।

২. নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

মৌল	যোজ্যতাস্তরের ইলেক্ট্রন বিন্যাস	পর্যায়
X	ns^2np^2	2
Y	ns^2np^5	3
Z	ns^2	4

(ক) ধাতব বন্ধন কাকে বলে?

(খ) পানি পোলার যৌগ কেন? ব্যাখ্যা করো।

(গ) ZY_2 যৌগটি কোন অবস্থায় বিদ্যুৎ পরিবহন করে? ব্যাখ্যা করো।

(ঘ) ZY_2 যৌগটি পানিতে দ্রবীভূত হলেও XY_4 যৌগটি দ্রবণীয় নয় কেন? বিশ্লেষণ করো।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. মিথেন পানিতে দ্রবীভূত হয় না কেন? ব্যাখ্যা করো।

২. CCl_4 অণু গঠনকালে দুই এর নিয়ম মেনে চলে- ব্যাখ্যা করো।

৩. গলিত NaCl বিদ্যুৎ পরিবাহী কেন? ব্যাখ্যা করো।

২০২৩

ষষ্ঠ অধ্যায়

মোলের ধারণা ও রাসায়নিক গণনা

(Concept of Mole and Chemical Counting)

রসায়নে মূলত দুই ধরনের বিশ্লেষণ পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়, যা গুণগত বিশ্লেষণ এবং পরিমাণগত বিশ্লেষণ। কোনো পদার্থকে এবং তার বিভিন্ন ধর্মকে শনাক্ত করার পদ্ধতির নাম গুণগত বিশ্লেষণ এবং কোনো পদার্থের পরিমাণ নির্ণয়ের পদ্ধতির নাম পরিমাণগত বিশ্লেষণ। পরিমাণগত বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে বিভিন্ন হিসাব-নিকাশ প্রয়োজন হয়। এসব হিসাব-নিকাশকে একত্রে রাসায়নিক গণনা বলা হয়। রাসায়নিক গণনায় কোনো পদার্থের পরিমাণ অনেক সময়েই মোল এককে প্রকাশ করা হয়। এই অধ্যায়ে তোমরা মোল কী, মোল দিয়ে হিসাব-নিকাশ কীভাবে করা হয়, মোলের হিসাব-নিকাশ থেকে কীভাবে ঘনমাত্রার হিসাব করা হয়। এই বিষয়গুলো জানতে পারবে।

২০২৫

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- মোলের ধারণা ব্যবহার করে সরল গাণিতিক হিসাব করতে পারব।
- নির্দিষ্ট ঘনমাত্রার দ্রবণ প্রস্তুত করতে পারব।
- প্রদত্ত তথ্য ও উপাত্ত ব্যবহার করে যৌগে উপস্থিত মৌলের শতকরা সংযুতি নির্ণয় করতে পারব।
- শতকরা সংযুতি ব্যবহার করে স্থূল সংকেত ও আণবিক সংকেত নির্ণয় করতে পারব।
- মৌল ও যৌগমূলকের প্রতীক, সংকেত ও যোজনী ব্যবহার করে রাসায়নিক সমীকরণ লিখতে এবং সমতা বিধান করতে পারব।
- রাসায়নিক সমীকরণের মাত্রিক তাৎপর্য থেকে বিক্রিয়ক ও উৎপাদের ভরভিত্তিক গাণিতিক সমস্যা সমাধান করতে পারব।
- তুঁতের কেলাস পানির শতকরা পরিমাণ নির্ণয় করতে পারব।
- নিক্তি ব্যবহার করে রাসায়নিক দ্রব্য পরিমাপ করতে সক্ষম হব।

৬.১ মোল (Mole)

মোল হলো রাসায়নিক পদার্থ পরিমাপের একক। মনে করো,

12টি O_2 = 1 ডজন O_2
100টি O_2 = 1 শতক O_2
1000টি O_2 = 1 হাজার O_2

তেমনি 6.023×10^{23} টি O_2 = 1 মোল O_2

1 মোল পরমাণুতে 6.023×10^{23} টি পরমাণু থাকে।
1 মোল অণুতে 6.023×10^{23} টি অণু থাকে।
1 মোল আয়নে 6.023×10^{23} টি আয়ন থাকে।

অতএব, 6.023×10^{23} সংখ্যাটি পরমাণু, অণু, আয়ন ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয়। এই সংখ্যাটিকে অ্যাভোগেড্রোর সংখ্যা বলা হয়।

কোনো পদার্থের যে পরিমাণের মধ্যে 6.023×10^{23} টি পরমাণু, অণু বা আয়ন থাকে সেই পরিমাণকে ঐ পদার্থের মোল বলা হয়। যেমন: 12 গ্রাম C এর মধ্যে 6.023×10^{23} টি C পরমাণু থাকে।

রাসায়নিক পদার্থের (পরমাণুর ক্ষেত্রে) পারমাণবিক ভর অথবা (অণুর ক্ষেত্রে) আণবিক ভরকে গ্রাম এককে প্রকাশ করলে যে পরিমাণ পাওয়া যায় তাকে ঐ পদার্থের এক মোল বলা হয়।

অতএব 12 গ্রাম C = 1 মোল C পরমাণু।
আবার, 18 গ্রাম H_2O এর মধ্যে 6.023×10^{23} টি H_2O অণু থাকে।
অতএব 18 গ্রাম H_2O = 1 মোল H_2O

অণুর আণবিক ভর বের করার পদ্ধতি

কোনো অণুতে বিদ্যমান সকল পরমাণুর পারমাণবিক ভর যোগ করলে ঐ অণুর আণবিক ভর পাওয়া যায়।

যেমন: Cl_2 অণুতে Cl পরমাণু আছে 2টি।
অতএব, Cl_2 এর আণবিক ভর = $2 \times$ Cl এর পারমাণবিক ভর = $2 \times 35.5 = 71$
এক মোল Cl_2 = 71g Cl_2

NaCl অণুতে Na পরমাণু আছে 1টি এবং Cl পরমাণু আছে 1টি

২০২৫

অতএব, NaCl এর আণবিক ভর = Na এর পারমাণবিক ভর + Cl এর পারমাণবিক ভর

= 23 + 35.5 = 58.5

এক মোল NaCl = 58.5g NaCl

$CuSO_4 \cdot 5H_2O$ তে Cu আছে 1টি, S আছে 1টি, O আছে 9টি এবং H আছে 10টি

অতএব, $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ এর আণবিক ভর = 1 × Cu এর পারমাণবিক ভর + 1 × S এর পারমাণবিক ভর + 9× O এর পারমাণবিক ভর + 10 × H এর পারমাণবিক ভর

= 1 × 63.5 + 1 × 32 + 9 × 16 + 10 × 1

= 249.5

এক মোল $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ = 249.5 g $CuSO_4 \cdot 5H_2O$

উদাহরণ

১. সমস্যা: 1টি H_2O অণুর ভর কত?

সমাধান: আমরা জানি, 1 মোল H_2O = 18g H_2O = 6.023×10^{23} টি H_2O অণু

এখানে 6.02×10^{23} টি H_2O অণুর ভর = 18g

অতএব, 1টি H_2O অণুর ভর = $\frac{18}{6.023 \times 10^{23}}$ g = 2.99×10^{-23}g

২. সমস্যা: 1g H_2SO_4 এ কতগুলো H_2SO_4 অণু আছে?

সমাধান: আমরা জানি, 1 মোল H_2SO_4 = 98g H_2SO_4 = 6.023×10^{23} টি H_2SO_4 অণু

এখানে, 98g H_2SO_4 = 6.023×10^{23} টি H_2SO_4 অণু

1g H_2SO_4 = $\frac{6.023 \times 10^{23}}{98}$ টি H_2SO_4 অণু = 6.14×10^{21} টি H_2SO_4 অণু

৩. সমস্যা: 5 g H_2O এ কত মোল H_2O বিদ্যমান?

সমাধান: আমরা জানি, 1 মোল H_2O = 18 g H_2O

এখানে, 18 g H_2O = 1 মোল H_2O

1 g H_2O = $\frac{1}{18}$ মোল H_2O

5g H_2O = $\frac{1 \times 5}{18}$ মোল H_2O = 0.277 মোল H_2O

নিজে করো: 1 g H_2SO_4 এ কতগুলো H, S এবং O পরমাণু আছে?

৬.১.১ গ্যাসের মোলার আয়তন

1 মোল গ্যাসীয় পদার্থ যে আয়তন দখল করে তাকে ঐ গ্যাসের মোলার আয়তন বলে। 0° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা এবং 1 বায়ুমণ্ডল চাপকে একত্রে প্রমাণ তাপমাত্রা ও চাপ বা আদর্শ তাপমাত্রা ও চাপ বা সংক্ষেপে আদর্শ বা প্রমাণ অবস্থা বলা হয়। প্রমাণ অবস্থায় 1 মোল গ্যাসের আয়তন হয় 22.4 লিটার।

যদি n = মোল সংখ্যা,
w = গ্রাম এককে ভর,
V = লিটার এককে আয়তন,
N = অণুর সংখ্যা এবং
M = আণবিক ভর হয় তাহলে আমরা লিখতে পারি:

$$n = \frac{w}{M}$$

কিংবা

$$n = \frac{V}{22.4}$$

কিংবা

$$n = \frac{N}{6.023 \times 10^{23}}$$

উদাহরণ

১. **সমস্যা:** আদর্শ তাপমাত্রা ও চাপে 1 লিটার CO_2 গ্যাসে কতটি অণু থাকে?

সমাধান: আমরা জানি, 1 মোল CO_2 = 44g CO_2 = 6.023×10^{23} টি CO_2 অণু = আদর্শ তাপমাত্রা ও চাপে 22.4 লিটার আয়তনের CO_2 গ্যাস

আদর্শ তাপমাত্রা ও চাপে, 22.4 লিটার CO_2 গ্যাসে থাকে = 6.023×10^{23} টি অণু

অতএব, 1 লিটার CO_2 গ্যাসে থাকে = $\frac{6.023 \times 10^{23}}{22.4}$ টি অণু = 2.69×10^{22} টি অণু

নিজে করো: প্রমাণ অবস্থায় 5 লিটার CH_4 গ্যাসে কয়টি H পরমাণু আছে?

২. **সমস্যা:** 5 মোল CO_2 গ্যাসের প্রমাণ অবস্থায় আয়তন কত?

সমাধান: এখানে দেওয়া আছে, মোল $n = 5$

বের করতে হবে প্রমাণ অবস্থায় আয়তন $V = ?$

আমরা জানি $n = \frac{V}{22.4}$

বা, $5 = \frac{V}{22.4}$

কাজেই $V = 5 \times 22.4$ লিটার $= 112$ লিটার

> **নিজে করো:** প্রমাণ অবস্থায় 5টি CO_2 অণুর আয়তন কত?

৩. সমস্যা: প্রমাণ অবস্থায় 10 গ্রাম হাইড্রোজেন গ্যাসের আয়তন কত?

সমাধান: এখানে দেওয়া আছে, ভর $w = 10$ গ্রাম, H_2 এর আণবিক ভর $M = 2$

আয়তন, $V = ?$

আমরা জানি,

$$n = \frac{w}{M} = \frac{V}{22.4}$$

$$\frac{10}{2} = \frac{V}{22.4}$$

বা, $V = 22.4 \times 5$ লিটার $= 112$ লিটার

৬.১.২ মোল এবং আণবিক সংকেত

মোল এবং আণবিক সংকেতের মধ্যে একটি সম্পর্ক রয়েছে। কোনো পদার্থের আণবিক সংকেত থেকে প্রাপ্ত আণবিক ভরকে গ্রামে প্রকাশিত করলে যে পরিমাণ পাওয়া যায় সেই পরিমাণকে ঐ পদার্থের 1 মোল বলা হয়। যেমন-পানির আণবিক সংকেত H_2O। পানির আণবিক ভর 18। অতএব, 18 গ্রামকে 1 গ্রাম আণবিক ভর পানি বা 1 মোল পানি বলা হয়। এখানে দেখা যাচ্ছে, মোলকে গ্রাম আণবিক ভরও বলা হয়।

আণবিক সংকেত থেকে আরও অনেক তথ্য পাওয়া যায়।

H_2O আণবিক সংকেত থেকে যে যে তথ্য পাওয়া যায় তা নিচে উল্লেখ করা হলো।

1. H_2O এর নাম পানি
2. 1 অণু পানি এর সংকেত H_2O
3. 1 মোল পানি এর সংকেত H_2O
4. 1 অণু H_2O এ 2টি হাইড্রোজেন পরমাণু এবং 1টি অক্সিজেন পরমাণু আছে।
5. 1 মোল H_2O অণুতে 2 মোল H পরমাণু আছে ও 1 মোল O পরমাণু আছে।

6. 1 মোল H_2O অণুতে H পরমাণুর ভর $1 \times 2 = 2g$ এবং O পরমাণুর ভর $16 \times 1 = 16g$। অতএব, 1 মোল H_2O অণুর ভর $(2 + 16)g = 18g$
7. 1 মোল H_2O অণুতে H পরমাণুর সংখ্যা $6.023 \times 10^{23} \times 2$ টি $= 1.20 \times 10^{24}$ টি, O পরমাণুর সংখ্যা $6.023 \times 10^{23} \times 1$ টি $= 6.023 \times 10^{23}$ টি, এবং H_2O অণুর সংখ্যা $= 6.023 \times 10^{23}$ টি।

৬.১.৩ মোলার দ্রবণ

ধরা যাক কোনো দ্রাবকে একটি দ্রব দ্রবীভূত আছে। একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় 1 লিটার দ্রবণের মধ্যে যদি এক মোল দ্রব দ্রবীভূত থাকে তবে ঐ দ্রবণকে মোলার দ্রবণ বলে বা এক মোলার দ্রবণ বলা হয়। 1 লিটার দ্রবণে যদি 2 মোল দ্রব দ্রবীভূত থাকে তবে ঐ দ্রবণকে 2 মোলার দ্রবণ বলা হয়।

দ্রাবক, দ্রব ও দ্রবণ বলতে কী বোঝায় সেটি বোঝানোর জন্য একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। একটি গ্লাসে প্রায় অর্ধেক পানি নাও। সেই পানিতে সামান্য পরিমাণ খাবার লবণ নিয়ে তা একটি চামচ দিয়ে মেশাও। দেখা গেল পানিতে লবণ মিশে গেছে বা পানিতে আর লবণ দেখা যাচ্ছে না। এই লবণ-পানির মিশ্রণ একটি দ্রবণ। এই মিশ্রণে পানিকে বলা হয় দ্রাবক এবং লবণকে বলা হয় দ্রব। দ্রবণ প্রস্তুত করার সময় পানি, এসিড, অ্যালকোহল ইত্যাদি নানা রকম তরল ব্যবহার করা যায়। এই অধ্যায়ে আমরা মূলত পানিকে দ্রাবক হিসেবে ব্যবহার করব। পানিকে দ্রাবক হিসাবে ব্যবহার করলে যে দ্রবণ তৈরি হয় তাকে জলীয় দ্রবণ বলে।

দ্রবণ = দ্রব + দ্রাবক

তোমরা মাঝে মাঝেই লঘু দ্রবণ এবং গাঢ় দ্রবণ কথাগুলো শুনবে। তুমি যদি একটি গ্লাসে 250 মিলিলিটার পানির মধ্যে 10 গ্রাম খাবার লবণ মিশাও তাহলে একটি দ্রবণ তৈরি হবে। তুমি যদি আরেকটি গ্লাসে 250 মিলিলিটার পানির মধ্যে 15 গ্রাম খাবার লবণ মিশাও তাহলেও একটি দ্রবণ তৈরি হবে। এই দুটি দ্রবণের মধ্যে একটি লঘু দ্রবণ এবং অন্যটি গাঢ় দ্রবণ। যে দ্রবণে খাবার লবণ কম সেই দ্রবণটি লঘু দ্রবণ আর যে দ্রবণে খাবার লবণ বেশি সেই দ্রবণটি গাঢ় দ্রবণ। আবার একটি গ্লাসে 250 mL পানি এবং অপর একটি গ্লাসে 200 mL পানি নেওয়া হলো। এবারে দুটি গ্লাসেই 10g লবণ মেশানো হয়েছে। এখন বলতে পারবে কোন পাত্রের দ্রবণটি লঘু এবং কোন পাত্রের দ্রবণ গাঢ়? যে পাত্রে পানির পরিমাণ বেশি সেটি লঘু দ্রবণ আর যে পাত্রে পানির পরিমাণ কম সেটি গাঢ় দ্রবণ। ল্যাবরেটরিতে একটি নির্দিষ্ট

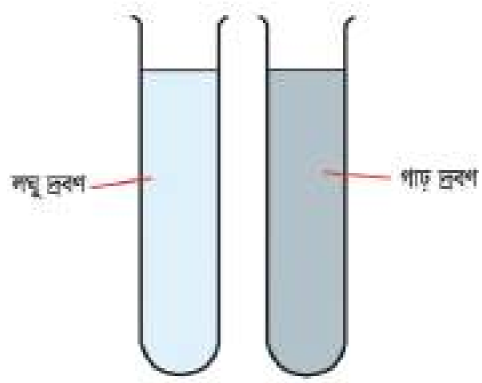

চিত্র ৬.০১: লঘু দ্রবণ এবং গাঢ় দ্রবণ

পরিমাণ দ্রাবকের মধ্যে কম পরিমাণ দ্রব মিশ্রিত করলে তাকে লঘু দ্রবণ বলে এবং একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রাবকের মধ্যে বেশি পরিমাণ দ্রব মিশ্রিত করলে তাকে গাঢ় দ্রবণ বলে। আসলে দ্রাবকের মধ্যে কতটুকু পদার্থ যোগ করলে সেই দ্রবণ লঘু হবে আর কতটুকু পদার্থ যোগ করলে দ্রবণ গাঢ় হবে তার কোনো নিয়ম নেই। অর্থাৎ দ্রাবকের মধ্যে তুলনামূলক কম পরিমাণ দ্রব থাকলে তাহলে সেটা লঘু দ্রবণ এবং দ্রাবকের মধ্যে তুলনামূলকভাবে বেশি পরিমাণে দ্রব থাকলে সেটা গাঢ় দ্রবণ।

একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় 1 লিটার দ্রবণের মধ্যে যত মোল দ্রব দ্রবীভূত থাকে তাকে ঐ দ্রবণের মোলারিটি বলা হয়। একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় 1 লিটার দ্রবণের মধ্যে যদি দুই মোল দ্রব দ্রবীভূত থাকে তবে ঐ দ্রবণের মোলারিটি দুই। যদি 1 লিটার দ্রবণের মধ্যে 0.5 মোল দ্রব দ্রবীভূত থাকে তাহলে ঐ দ্রবণকে সেমিমোলার দ্রবণ বলে এবং ঐ 1 লিটার দ্রবণের মধ্যে যদি 0.1 মোল দ্রব দ্রবীভূত থাকে তবে ঐ দ্রবণকে ডেসিমোলার দ্রবণ বলে এবং ডেসিমোলার দ্রবণের মোলারিটি = 0.1। সেমিমোলার দ্রবণের মোলারিটি হবে 0.5।

বিভিন্ন মোলারিটির দ্রবণ প্রস্তুতকরণ

ল্যাবরেটরিতে মোলার দ্রবণ, ডেসিমোলার দ্রবণ, সেমিমোলার দ্রবণ ইত্যাদি প্রস্তুত করার প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন মোলারিটির দ্রবণ প্রস্তুত করা অত্যন্ত সহজ। এক্ষেত্রে তোমাকে কতগুলো কাজ ধাপে ধাপে করতে হবে। প্রথমত, তোমাকে একটি নির্দিষ্ট আয়তনের আয়তনিক ফ্লাস্ক বাছাই করতে হবে। দ্বিতীয়ত, যে পদার্থের দ্রবণ তৈরি করতে হবে সেই পদার্থের নির্দিষ্ট পরিমাণ ওজন করে নিয়ে আয়তনিক ফ্লাস্কে ঢেলে নিতে হবে। তৃতীয়ত, আয়তনিক ফ্লাস্কের মধ্যে খানিকটা পানি যোগ করে ঝাঁকিয়ে পদার্থটির দ্রবণ তৈরি করতে হবে। তারপর সাবধানে আয়তনিক ফ্লাস্কের নির্দিষ্ট দাগ পর্যন্ত পানি দ্বারা পূর্ণ করতে হবে। দ্রবণের মোলারিটি, দ্রবণের আয়তন, দ্রবের ভর এবং দ্রবের আণবিক ভরের মধ্যে একটি সম্পর্ক আছে।

$$\text{গ্রাম এককে দ্রবের ভর} = \frac{\text{দ্রবণের মোলারিটি} \times \text{মিলিলিটার এককে দ্রবণের আয়তন} \times \text{দ্রবের আণবিক ভর}}{1000}$$

এখানে গ্রাম এককে দ্রবের ভর = w

দ্রবণের মোলারিটি = S

মিলিলিটার এককে দ্রবণের আয়তন = V

এবং দ্রবের আণবিক ভর = M ধরে নিলে

$$w = \frac{SVM}{1000}$$

মোলারিটি বা ঘনমাত্রা সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের জন্য এই সূত্রটি ব্যবহার করা যেতে পারে।

উদাহরণ

১. সমস্যা: 250 মিলিলিটার আয়তনিক ফ্লাস্কে 0.2 মোলার NaCl দ্রবণ কীভাবে প্রস্তুত করবে?

সমাধান: দেওয়া আছে, দ্রবণের আয়তন, V = 250mL, দ্রবণের মোলারিটি, S = 0.2 মোলার,
NaCl এর আণবিক ভর 23 + 35.5 = 58.5
কাজেই 1 মোল NaCl = 58.5 g
1000 মিলি বা 1 লিটার দ্রবণে 0.2 মোলারিটির জন্য প্রয়োজন $58.5 \times 0.2 = 11.7$ g

250 mL দ্রবণে প্রয়োজন $= \frac{11.7 \times 250}{1000} = 2.925$ g

একটি 250 মিলিলিটার আয়তনিক ফ্লাস্ক নিয়ে তার মধ্যে 2.925 গ্রাম NaCl যোগ করো। এবার পানি যোগ করে আয়তনিক ফ্লাস্কে দ্রবণের আয়তন 250 মিলিলিটার করো। তাহলেই 0.2 মোলার দ্রবণ প্রস্তুত হয়ে যাবে।

বিকল্প সমাধান:

আমরা জানি, $w = \frac{SVM}{1000}$

কাজেই $w = \frac{0.2 \times 250 \times 58.5}{1000}$ g = 2.925 g

এবারে আগের মতো আয়তনিক ফ্লাস্কে 2.925 গ্রাম NaCl নিয়ে পানি যোগ করে দ্রবণের আয়তন 250 মিলিলিটার করো। তাহলেই 0.2 মোলার দ্রবণ প্রস্তুত হয়ে যাবে।

---

২. সমস্যা: 2 লিটার 0.1 মোলার Na_2CO_3 দ্রবণের মধ্যে কী পরিমাণ Na_2CO_3 আছে?

সমাধান: Na_2CO_3 এর আণবিক ভর $= 23 \times 2 + 12 + 16 \times 3 = 106$
কাজেই 1 লিটার 1 মোলার দ্রবণে Na_2CO_3 এর পরিমাণ 106 g
1 লিটার 0.1 মোলার দ্রবণে Na_2CO_3 এর পরিমাণ 10.6 g
2 লিটার 0.1 মোলার দ্রবণে Na_2CO_3 এর পরিমাণ $10.6 \times 2 = 21.2$ g

বিকল্প সমাধান:

$$w = \frac{SVM}{1000}$$

$$w = \frac{0.1 \times 2000 \times 106 \text{ g}}{1000}$$

২০২৫

$w = 21.2$ g

৩. সমস্যা: 250 mL দ্রবণে 20g Na_2CO_3 থাকলে Na_2CO_3 দ্রবণের মোলারিটি কত?

সমাধান: Na_2CO_3 এর আণবিক ভর $23 \times 2 + 12 + 16 \times 3 = 106$

1 লিটারে 1 মোলারিটির জন্য প্রয়োজন 106 g

250 mL দ্রবণে 1 মোলারিটির জন্য প্রয়োজন $\frac{106 \times 250}{1000}$ g $= 26.5$ g

250 mL দ্রবণে 26.5 g Na_2CO_3 থাকলে মোলারিটি হয় 1 মোলার

250 mL দ্রবণে 1 g Na_2CO_3 থাকলে মোলারিটি হয় $\frac{1}{26.5}$ মোলার

250 mL দ্রবণে 20 g Na_2CO_3 থাকলে মোলারিটি হয় $\frac{1 \times 20}{26.5} = 0.75$ মোলার

বিকল্প সমাধান:

$$w = \frac{SVM}{1000}$$

$$20 = \frac{S \times 250 \times 106}{1000}$$

$S = 0.75$ মোলার

৪. সমস্যা: 0.75 মোলার Na_2CO_3 দ্রবণের মধ্যে 20 গ্রাম Na_2CO_3 দ্রবীভূত থাকলে ঐ দ্রবণের আয়তন কত মিলিলিটার?

সমাধান: দেওয়া আছে, $S = 0.75$ Molar, $w = 20$ g, $M = 23 \times 2 + 12 + 16 \times 3 = 106$, $V=?$

আমরা জানি,

$$w = \frac{SVM}{1000}$$

$$20 = \frac{0.75 \times V \times 106}{1000}$$

$$V = \frac{1000 \times 20}{0.75 \times 106} \text{ mL} = 250 \text{ mL}$$

৫. সমস্যা: একটি 250 mL দ্রবণের মধ্যে 20 g পদার্থ দ্রবীভূত থাকলে এবং ঐ দ্রবণের মোলারিটি 0.75 মোলার হবে। ঐ দ্রবণে দ্রবের আণবিক ভর কত?

সমাধান: দেওয়া আছে, $w = 20$g, $V = 250$ mL, $S = 0.7$ Molar, $M = ?$

আমরা জানি,

$$w = \frac{SVM}{1000}$$

$$20 = \frac{0.75 \times 250 \times M}{1000}$$

$$M = \frac{1000 \times 20}{0.75 \times 250} = 106$$

৬. সমস্যা: তুমি কীভাবে 200 মিলিলিটার সেমিমোলার Na_2CO_3 দ্রবণ তৈরি করবে?

সমাধান: V= 200 mL, S = 0.5 Molar, M = 23×2 + 12 + 16×3 = 106

আমরা জানি, $w = \frac{SVM}{1000} = \frac{0.5 \times 200 \times 106}{1000} g = 10.6 g$

এবারে একটি 200 mL পাত্রে 10.6g Na_2CO_3 নিয়ে তাতে পানি যোগ করে দ্রবণের আয়তন 200 mL করলেই সেমি মোলার Na_2CO_3 দ্রবণ তৈরি হবে।

নিজে করো

কাজ: 100 মিলিলিটার দ্রবণে 4 গ্রাম NaOH থাকলে দ্রবণের মোলারিটি কত বের করো ।

কাজ: 100 মিলিলিটার দ্রবণে 4 গ্রাম HCl থাকলে দ্রবণের মোলারিটি কত বের করো।

৬.২ যৌগে মৌলের শতকরা সংযুতি
(The Percentage Composition of Elements in Compounds)

কোনো যৌগের 100 গ্রামের মধ্যে কোনো মৌল যত গ্রাম থাকে তাকে ঐ মৌলের শতকরা সংযুতি বলে। যৌগের আণবিক সংকেত থেকে ঐ যৌগে বিদ্যমান মৌলসমূহের শতকরা সংযুতি বের করা যায়। অর্থাৎ,

$$\text{কোনো যৌগে একটি মৌলের শতকরা সংযুতি} = \frac{\text{মৌলের পারমাণবিক ভর} \times \text{পরমাণুর সংখ্যা} \times 100}{\text{যৌগের আণবিক ভর}} \%$$

উদাহরণ: HCl যৌগে H ও Cl এর শতকরা সংযুতি হিসাব দেখানো হলো

HCl এর আণবিক ভর = 1 + 35.5 = 36.5

এখানে 36.5 গ্রাম HCl এর মধ্যে H আছে = 1 গ্রাম

অতএব, 1 গ্রাম HCl এর মধ্যে H আছে = $\frac{1}{36.5}$ গ্রাম

অতএব, 100 গ্রাম HCl এর মধ্যে H আছে = $\frac{1 \times 100}{36.5}$ গ্রাম = 2.74 গ্রাম

অতএব, H এর শতকরা সংযুতি = 2.74%

আবার, 36.5 গ্রাম HCl এর মধ্যে Cl আছে = 35.5 গ্রাম

অতএব, 1 গ্রাম HCl এর মধ্যে Cl আছে = $\frac{35.5}{36.5}$ গ্রাম

অতএব, 100 গ্রাম HCl এর মধ্যে Cl আছে = $\frac{35.5 \times 100}{36.5}$ গ্রাম = 97.26 গ্রাম

অতএব, Cl এর শতকরা সংযুতি = 97.26%

কিংবা অন্যভাবে বের করতে পারি: Cl এর শতকরা সংযুতি = (100 – 2.74)% = 97.26%

উদাহরণ

১. সমস্যা: H_2O-এর H ও O এর শতকরা সংযুতি হিসাব করো।

সমাধান: 1 মোল H_2O এর ভর = 2 + 16 = 18 গ্রাম

18 গ্রাম H_2O এর মধ্যে H আছে = 2 গ্রাম

1 গ্রাম H_2O এর মধ্যে H আছে = $\frac{2}{18}$ গ্রাম

100 গ্রাম H_2O এর মধ্যে H আছে = $\frac{2 \times 100}{18}$ গ্রাম = 11.11 গ্রাম

কাজেই H এর শতকরা সংযুতি = 11.11%

O এর শতকরা সংযুতি = (100 – 11.11)% = 88.89%

আমরা ইচ্ছা করলে শতকরা সংযুতির সূত্রটিতে মান বসিয়ে শতকরা সংযুতির মান বের করতে পারি।

$$\text{মৌলের শতকরা সংযুতি} = \frac{\text{মৌলের পারমাণবিক ভর} \times \text{পরমাণুর সংখ্যা} \times 100}{\text{যৌগের আণবিক ভর}}\%$$

যেমন: H_2SO_4 যৌগে H, S এবং O এর শতকরা সংযুতি হচ্ছে:

H_2SO_4 এর আণবিক ভর = (1×2 + 32×1 + 16×4) = 98

এখানে, H এর পারমাণবিক ভর 1, পরমাণুর সংখ্যা 2

কাজেই H এর শতকরা সংযুতি = $\frac{1 \times 2 \times 100}{98}\%$ = 2.04%

S এর পারমাণবিক ভর 32, পরমাণুর সংখ্যা 1,

কাজেই S এর শতকরা সংযুতি = $\frac{32 \times 1 \times 100}{98}\%$ = 32.65%

O এর পারমাণবিক ভর 16, পরমাণুর সংখ্যা 4

কাজেই O এর শতকরা সংযুতি = $\frac{16\times4\times100}{98}\%$ = 65.30%

২. সমস্যা: $Al_2(SO_4)_3$ যৌগে আলুমিনিয়াম, সালফার এবং অক্সিজেনের শতকরা সংযুতি বের করো।

সমাধান: এখানে $Al_2(SO_4)_3$ এর আণবিক ভর = 27×2 + (32×1 + 16×4) × 3 = 342

আলুমিনিয়ামের (Al) এর শতকরা সংযুতি = $\frac{27\times2\times100}{342}\%$ = 15.78%

সালফার (S) এর শতকরা সংযুতি = $\frac{32\times3\times100}{342}\%$ = 28.07%

অক্সিজেন (O) এর শতকরা সংযুতি = $\frac{16\times12\times100}{342}\%$ = 56.14%

নিজে করো

কাজ: NaCl যৌগে Na এবং Cl এর শতকরা সংযুতি বের করো।

৬.২.১ শতকরা সংযুতি এবং স্থূল সংকেত

আমরা আণবিক সংকেতের ধারণাটির সাথে ভালোভাবে পরিচিত হয়েছি, অনেকবার ব্যবহার করেছি এবং আমরা জানি আণবিক সংকেত দেখে আমরা একটি অণুতে কোন পরমাণু কতগুলো আছে বের করতে পারি। একটি অণুতে বিভিন্ন পরমাণুর সংখ্যার অনুপাত বোঝানোর জন্য 'স্থূল সংকেত' এর ধারণাটি প্রবর্তন করা হয়েছে। যেমন হাইড্রোজেন পার অক্সাইডের অণুতে (H_2O_2) দুটি হাইড্রোজেন এবং দুটি অক্সিজেন পরমাণু রয়েছে। তোমরা দেখতে পাচ্ছ H_2O_2 এ হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের পরমাণুর সংখ্যা যথাক্রমে 2 এবং 2, কাজেই তাদের অনুপাত 1:1 অর্থাৎ H_2O_2 এর স্থূল সংকেত HO। অর্থাৎ যে সংকেত দিয়ে অণুতে বিদ্যমান পরমাণুগুলোর অনুপাত প্রকাশ করে তাকে স্থূল সংকেত বলে।

কাজেই তোমরা বুঝতে পারছো আমরা যদি কোনো যৌগের ভেতরকার মৌলগুলোর শতকরা সংযুতি এবং আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর বা পারমাণবিক ভর জানি তাহলে খুব সহজেই যৌগটির স্থূল সংকেত বের করতে পারব।

শতকরা সংযুতি থেকে স্থূল সংকেত নির্ণয়

শতকরা সংযুতি থেকে স্থূল সংকেত বের করার কতকগুলো ধাপ রয়েছে যা নিম্নে দেওয়া হলো-

✓ **ধাপ** 1: মৌলসমূহের শতকরা সংযুতিকে এর পারমাণবিক ভর দ্বারা ভাগ করতে হবে।

- ✓ **ধাপ** 2: ভাগফলগুলোর মধ্য থেকে যে সংখ্যাটি ক্ষুদ্রতম সেই সংখ্যা দিয়ে ভাগফলগুলোকে ভাগ করতে হবে এবং ভাগফলগুলোকে নিকটতম পূর্ণসংখ্যায় পরিণত করার জন্য প্রয়োজনে যেকোনো সংখ্যা দিয়ে সবগুলোকে গুণ করতে হবে।
- ✓ **ধাপ 3:** মৌলসমূহের প্রতীকের নিচে ডান পাশে ঐ পূর্ণসংখ্যাগুলো বসিয়ে দিলেই স্থূল সংকেত তৈরি হয়ে যাবে।
- ✓ **ধাপ 4:** মৌলগুলোর প্রতীকের নিচে ডান পাশে 1 থাকলে সেটি লেখার প্রয়োজন নেই।

ধরা যাক কোনো যৌগ কার্বনের সংযুতি 92.31% এবং হাইড্রোজেনের সংযুতি 7.69%, যৌগটির স্থূল সংকেত বের করতে হবে।

প্রথমে মৌলগুলোর শতকরা সংযুতিকে তার পারমাণবিক ভর দিয়ে ভাগ করি

$$C = \frac{92.31}{12} = 7.69$$

$$H = \frac{7.69}{1} = 7.69$$

ভাগফলগুলোর মধ্য থেকে যে সংখ্যাটি ক্ষুদ্রতম সেই সংখ্যা দিয়ে ভাগফলগুলোকে ভাগ করি

$$C = \frac{7.69}{7.69} = 1$$

$$H = \frac{7.69}{7.69} = 1$$

এই মানগুলো এবং মৌলের প্রতীক দিয়ে সংকেত আকারে লিখলেই স্থূল সংকেত পাওয়া যাবে।

অতএব, যৌগটির স্থূল সংকেত: C_1H_1 = CH

উদাহরণ

১. সমস্যা: কোনো যৌগের মৌলগুলোর শতকরা সংযুতি H = 2.04%, S = 32.65%, O = 65.30% দেওয়া আছে। এর স্থূল সংকেত বের করো।

সমাধান: প্রথমে শতকরা সংযুতিকে নিজ নিজ পারমাণবিক ভর দ্বারা ভাগ করি

$$H = \frac{2.04}{1} = 2.04$$

$$S = \frac{32.65}{32} = 1.02$$

$$O = \frac{65.30}{16} = 4.08$$

২০২৫

ভাগফলগুলোর মধ্য থেকে যে সংখ্যাটি ক্ষুদ্রতম সেই সংখ্যা দিয়ে ভাগফলগুলোকে ভাগ করি

$$H = \frac{2.04}{1.02} = 2$$

$$S = \frac{1.02}{1.02} = 1$$

$$O = \frac{4.08}{1.02} = 4$$

এই মানগুলো এবং মৌলের প্রতীক দিয়ে সংকেত আকারে লিখলেই স্থূল সংকেত পাওয়া যাবে।
সুতরাং স্থূল সংকেত: $H_2S_1O_4 = H_2SO_4$

২. সমস্যা: একটি যৌগে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন আছে। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের শতকরা সংযুতি যথাক্রমে 11.11% ও 88.89%। এর স্থূল সংকেত কত?

সমাধান: প্রথমে শতকরা সংযুতিকে নিজ নিজ পারমাণবিক ভর দিয়ে ভাগ করি

$$H = \frac{11.11}{1} = 11.11$$

$$O = \frac{88.89}{16} = 5.55$$

ভাগফলগুলোর মধ্য থেকে যে সংখ্যাটি ক্ষুদ্রতম সেই সংখ্যা দ্বারা ভাগফলগুলোকে ভাগ করি

$$H = \frac{11.11}{5.55} = 2$$

$$O = \frac{5.55}{5.55} = 1$$

এই মানগুলো এবং মৌলের প্রতীক দিয়ে সংকেত আকারে লিখলেই স্থূল সংকেত পাওয়া যাবে।
সুতরাং যৌগটির স্থূল সংকেত $H_2O_1 = H_2O$

নিজে করো

কাজ: একটি পরীক্ষার মাধ্যমে দেখা গেল 3 গ্রাম কার্বন পরমাণু এবং ৪ গ্রাম অক্সিজেন পরমাণুর সাথে যুক্ত হয়ে যৌগ গঠন করেছে। সেই যৌগের স্থূল সংকেত বের করো।

৬.২.২ শতকরা সংযুতি থেকে যৌগের আণবিক সংকেত নির্ণয়

কোনো যৌগের আণবিক সংকেত বের করার জন্য যৌগের শতকরা সংযুতি থেকে প্রথমে স্থূল সংকেত বের করতে হবে। কোনো যৌগের স্থূল সংকেতের ভর যদি ঐ যৌগের আণবিক ভরের সমান হয় তাহলে যৌগের স্থূল সংকেতই যৌগের আণবিক সংকেত হবে। কিন্তু যদি কোনো যৌগের স্থূল সংকেতের ভর ঐ যৌগের আণবিক ভরের সমান না হয় তাহলে স্থূল সংকেতের ভর থেকে আণবিক ভর কত গুণ বেশি সেটি বের করতে হবে।

যদি স্থূল সংকেতের ভর থেকে আণবিক ভর n গুণ বেশি হয় তাহলে

$$\text{আণবিক সংকেত} = (\text{স্থূল সংকেত})_n$$

$$\text{এখানে, } n = \frac{\text{যৌগের আণবিক ভর}}{\text{স্থূল সংকেতের ভর}}$$

ধরা যাক, কোনো যৌগের $C = 92.31\%$, $H = 7.69\%$ দেওয়া আছে। ঐ যৌগের আণবিক ভর = 78

যৌগটির আণবিক সংকেত বের করতে হবে।

মৌলগুলোর শতকরা সংযুতিকে তাদের পারমাণবিক ভর দিয়ে ভাগ করি

$$C = \frac{92.31}{12} = 7.69$$

$$H = \frac{7.69}{1} = 7.69$$

ভাগফলগুলোর মধ্য থেকে যে সংখ্যাটি ক্ষুদ্রতম সেই সংখ্যা দিয়ে ভাগফলগুলোকে ভাগ করি

$$C = \frac{7.69}{7.69} = 1$$

$$H = \frac{7.69}{7.69} = 1$$

এই মানগুলো এবং মৌলের প্রতীক দিয়ে সংকেত আকারে লিখলেই স্থূল সংকেত পাওয়া যাবে।

অতএব, যৌগটির স্থূল সংকেত = $C_1H_1 = CH$

যৌগের স্থূল সংকেত CH হলে এর আণবিক সংকেত হবে: $(CH)_n = C_nH_n$

স্থূল সংকেত CH এর ভর = $12\times1 + 1\times1 = 13$ এবং আণবিক ভর = 78

$$\text{অতএব, } n = \frac{\text{যৌগের আণবিক ভর}}{\text{স্থূল সংকেতের ভর}} = \frac{78}{(12+1)} = 6$$

কাজেই যৌগটির আণবিক সংকেত = C_6H_6

আণবিক সংকেত থেকে স্থূল সংকেত নির্ণয়

কোনো যৌগের আণবিক সংকেত থেকে স্থূল সংকেত নির্ণয় করা যায়। ধরা যাক গ্লুকোজ ($C_6H_{12}O_6$) এর স্থূল সংকেত বের করতে হবে।

গ্লুকোজ ($C_6H_{12}O_6$) এর একটি অণুতে 6টি C পরমাণু, 12টি H পরমাণু এবং 6টি O পরমাণু আছে।

অতএব, পরমাণুসমূহের অনুপাত C:H:O = 6:12:6 = 1:2:1

সুতরাং স্থূল সংকেত $C_1H_2O_1 = CH_2O$

কখনো কখনো স্থূল সংকেত এবং আণবিক সংকেত একই হয়।

যেমন পানির আণবিক সংকেত H_2O এর স্থূল সংকেত H_2O। সালফিউরিক এসিড এর আণবিক সংকেত H_2SO_4 এবং এর স্থূল সংকেত H_2SO_4।

কিন্তু যে সকল যৌগের সকল পরমাণুর সংখ্যাকে কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায় তাদের স্থূল সংকেত এবং আণবিক সংকেত ভিন্ন হবে। বেনজিনের আণবিক সংকেত C_6H_6। বেনজিনের কার্বন এবং হাইড্রোজেনের পরমাণু সংখ্যাকে 6 দ্বারা ভাগ করা যায় অতএব, এর স্থূল সংকেত C_1H_1 বা CH।

একইভাবে ইথিনের আণবিক সংকেত C_2H_4। অতএব, এর স্থূল সংকেত C_1H_2 বা CH_2।

৬.৩ রাসায়নিক বিক্রিয়া ও রাসায়নিক সমীকরণ (Chemical Reactions and Chemical Equations)

রাসায়নিক বিক্রিয়া

যদি কোনো পরিবর্তনের ফলে কোনো পদার্থ তার নিজের ধর্ম ও বৈশিষ্ট্য হারিয়ে নতুন ধর্ম লাভ করে সেই পরিবর্তনকে রাসায়নিক পরিবর্তন বলে। যে প্রক্রিয়ায় রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে সেই প্রক্রিয়াকে রাসায়নিক বিক্রিয়া বলে। রাসায়নিক বিক্রিয়াকে সংক্ষেপে উপস্থাপন করার জন্য যে সমীকরণ ব্যবহার করা হয় সেই সমীকরণকে রাসায়নিক সমীকরণ বলা হয়।

রাসায়নিক সমীকরণকে প্রকাশ করার জন্য প্রতীক, সংকেত এবং নানা রকম চিহ্ন ব্যবহার করা হয়।

যে সকল পদার্থ নিয়ে রাসায়নিক বিক্রিয়া শুরু করা হয় সেই সকল পদার্থকে বলা হয় বিক্রিয়ক। বিক্রিয়ার ফলে নতুন ধর্মবিশিষ্ট যে সকল পদার্থ উৎপন্ন হয় সেই সকল পদার্থকে উৎপাদ বলা হয়।

রাসায়নিক বিক্রিয়াকে রাসায়নিক সমীকরণ আকারে লেখার জন্য কতগুলো নিয়ম মানা হয় সেগুলো হচ্ছে:

২০২৬

1. গণিতে যেমন সমীকরণের মাঝে একটি সমান চিহ্ন (=) ব্যবহার করা হয় তেমনি কোনো বিক্রিয়ার বিক্রিয়ক বাম পাশে এবং উৎপাদ ডান পাশে লিখে তাদের মাঝে একটি সমান চিহ্ন (=) বা তির চিহ্ন ($\rightarrow$) বসাতে হয়।

2. বিক্রিয়কসমূহ এবং উৎপাদসমূহকে রাসায়নিক প্রতীক বা সংকেতের মাধ্যমে লেখা হয়। বিক্রিয়ায় একাধিক বিক্রিয়ক থাকলে বিক্রিয়কসমূহের মাঝে যোগ চিহ্ন দিতে হয়। এবং একাধিক উৎপাদ থাকলে উৎপাদসমূহের মাঝে যোগ চিহ্ন দিতে হয়।

3. যে প্রক্রিয়ায় সমীকরণের বাম পাশের বিভিন্ন মৌলের পরমাণুর সংখ্যা এবং ডান পাশের ঐ একই মৌলের পরমাণুর সংখ্যা সমান করা হয়। সেই প্রক্রিয়াকে রাসায়নিক সমীকরণের সমতা বলা হয়।

$$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$$
$$2H_2 + O_2 = 2H_2O$$

4. কখনো কখনো বিক্রিয়ার সমতা না করেও বিক্রিয়া দেখানো হয়, তখন সমান চিহ্ন (=) না দিয়ে তির চিহ্ন ($\rightarrow$) ব্যবহার করতে হয়।

$$H_2 + O_2 \longrightarrow H_2O$$

5. অনেক সময় বিক্রিয়ক এবং উৎপাদের ভৌত অবস্থা উল্লেখ করেও রাসায়নিক সমীকরণ লেখা হয়। বিক্রিয়ক এবং উৎপাদের ভৌত অবস্থা পদার্থের ডান পাশে প্রথম বন্ধনীর মধ্যে প্রকাশ করা হয়। এক্ষেত্রে কোনো পদার্থ কঠিন হলে তার ইংরেজি নাম (Solid) এর প্রথম বর্ণ (s) লিখতে হয়, কোনো পদার্থ তরল (liquid) হলে তার ইংরেজি নামের প্রথম বর্ণ (l) লিখতে হয়, কোনো পদার্থ গ্যাসীয় তার ইংরেজি নাম (gas) এর প্রথম বর্ণ (g) লিখতে হয়। কোনো পদার্থ পানিতে দ্রবীভূত হলে সেই দ্রবণকে বলা হয় জলীয় দ্রবণ। জলীয় দ্রবণের ইংরেজি নাম (aqueous solution) এর প্রথম 2টি বর্ণ (aq) লিখতে হয়। উপরের বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস এবং উৎপন্ন পদার্থ পানি তরল তাই তাকে লিখতে হবে।

$$2H_2(g) + O_2(g) \longrightarrow 2H_2O(l)$$

রাসায়নিক সমীকরণ এর উদ্দেশ্য হচ্ছে কোন কোন পদার্থ বিক্রিয়া করে কোন কোন পদার্থ হয়েছে সেটি দেখানো। অনেক সময় সমতা না করেও সেটি দেখানো যেতে পারে।

6. তবে যদি কোনো বিক্রিয়ায় কতটুকু তাপ উৎপন্ন হয় বা কতটুকু তাপ শোষিত হয় তা সমীকরণে দেখাতে হয় তবে সেক্ষেত্রে রাসায়নিক বিক্রিয়ার সমতা করতে হবে এবং বিক্রিয়ক ও উৎপাদের ভৌত অবস্থা (যেমন- কঠিন, তরল, গ্যাসীয় অবস্থা, জলীয় অবস্থা ইত্যাদি) লিখতে হবে।

কঠিন কার্বন অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন করে। এক্ষেত্রে রাসায়নিক সমীকরণকে নিম্নরূপে লেখা যায়।

$$C(s) + O_2(g) \longrightarrow CO_2(g)$$

কার্বন অক্সিজেন কার্বন ডাইঅক্সাইড

কঠিন ক্যালসিয়াম কার্বনেট হাইড্রোক্লোরিক এসিডের জলীয় দ্রবণের সাথে বিক্রিয়া করে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, গ্যাসীয় কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং তরল পানি উৎপন্ন হয়।

$$CaCO_3(s) + HCl(aq) \longrightarrow CaCl_2(aq) + CO_2(g) + H_2O(l)$$

ক্যালসিয়াম কার্বনেট, হাইড্রোক্লোরিক এসিড, ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, কার্বন ডাই-অক্সাইড, পানি

কোনো কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তাপ প্রয়োগে সংঘটিত হয় সেক্ষেত্রে তীরের উপর একটি ডেলটা চিহ্ন (Δ) দিতে হবে। যেমন কঠিন ম্যাগনেসিয়াম নাইট্রেটকে তাপ প্রয়োগ করলে ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড, নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড গ্যাস এবং অক্সিজেন গ্যাস তৈরি হয়।

$$2Mg(NO_3)_2(s) \xrightarrow{\Delta} 2MgO(s) + 4NO_2(g) + O_2(g)$$

৬.৩.১ রাসায়নিক সমীকরণের সমতাকরণ

রাসায়নিক বিক্রিয়াকে সংক্ষিপ্তরূপে রাসায়নিক সমীকরণের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়। যেহেতু রাসায়নিক বিক্রিয়াতে বিক্রিয়ক এবং উৎপাদ ভরের সংরক্ষণসূত্র মেনে চলে তাই বিক্রিয়ার সমীকরণে বিক্রিয়ক পদার্থের বিভিন্ন মৌলের পরমাণুর সংখ্যা উৎপাদ পদার্থের বিভিন্ন মৌলের পরমাণুর সংখ্যার সমান থাকে। রাসায়নিক সমীকরণের তির চিহ্ন বা সমান চিহ্নের বাম পাশে কোনো মৌলের যে কয়টি পরমাণু থাকে তির চিহ্ন বা সমান চিহ্নের ডান পাশে মৌলের সেই কয়টি পরমাণু থাকলে আমরা ঐ রাসায়নিক সমীকরণ সমতাকরণ হয়েছে বলে বুঝে থাকি।

নিচের উদাহরণটি লক্ষ করো:

$$Mg + HCl \longrightarrow MgCl_2 + H_2$$

ম্যাগনেসিয়াম ও হাইড্রোক্লোরিক এসিডকে বিক্রিয়ক হিসেবে ব্যবহার করলে আমরা ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড ও হাইড্রোজেন পাই এটি সত্যি, কাজেই বিক্রিয়াটি সঠিক। কিন্তু দুইপাশে হাইড্রোজেন ও ক্লোরিন পরমাণুর সংখ্যা সমান নয়, তাই এই সমীকরণটির সমতাকরণ হয়নি।

বিক্রিয়া সমতাকরণের পদ্ধতি

বিভিন্ন মৌলের পরমাণুর সংখ্যা সমান করার জন্য বিক্রিয়ক এবং উৎপাদের সংকেতের সামনে প্রয়োজনীয় সংখ্যা (1, 2, 3, 4 ...) দিয়ে গুণ করতে হয় এবং পরমাণুর সংখ্যা সমান করার জন্য চেষ্টা করে যেতে হয়। সমীকরণের সমতা করার জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়ম নেই কিন্তু কিছু কৌশল অবলম্বন করা হয়। সেগুলো এরকম:

1. প্রথমে বিক্রিয়ক এবং উৎপাদের সঠিক সংকেত লিখে বিক্রিয়ার সমীকরণ লেখা হয়।
2. সমীকরণে সমতা না থাকলে বিভিন্ন বিক্রিয়ক এবং উৎপাদকে বিভিন্ন সংখ্যা দিয়ে গুণ করে তির চিহ্ন বা সমান চিহ্নের দুই পাশে মৌলের পরমাণুর সংখ্যা সমান করার চেষ্টা করা হয়।
3. প্রথমে যৌগিক অণুতে বিদ্যমান মৌলের পরমাণু সংখ্যার সমান করা হয় পরে মৌলিক অণুতে বিদ্যমান মৌলের পরমাণু সংখ্যার সমান করা হয়।
4. সমীকরণের উভয় পাশে প্রত্যেকটি মৌলের পরমাণু সংখ্যা সমান বা সমতা হলেই ঐ সমীকরণের সমতা হয়েছে বলে বিবেচিত হবে।

আমরা কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে সমতাকরণের প্রক্রিয়াটি বোঝানোর চেষ্টা করি।

উদাহরণ ১:

$$Mg + HCl \longrightarrow MgCl_2 + H_2$$

উপরের বিক্রিয়ায় যৌগিক অণু HCl এর মধ্যে Cl পরমাণু আছে 1টি কিন্তু ডান পাশে যৌগিক অণু $MgCl_2$ এর মধ্যে Cl পরমাণু আছে 2টি। কাজেই উভয় পাশে Cl পরমাণুর সংখ্যা সমান হয় নাই। আবার উপরের বিক্রিয়ায় বাম পাশে H পরমাণু আছে 1টি কিন্তু ডান পাশে H পরমাণু আছে 2টি। কাজেই উভয় পাশে H পরমাণুর সংখ্যা সমান হয়নি।
আবার উপরের বিক্রিয়ায় বাম পাশে Mg পরমাণু আছে 1টি কিন্তু ডান পাশে Mg পরমাণু আছে 1টি কাজেই উভয় পাশে Mg পরমাণুর সংখ্যা সমান হয়েছে।

প্রথমে সমীকরণের উভয় পাশে Cl পরমাণুর সংখ্যা সমান করার চেষ্টা করি এক্ষেত্রে বাম পাশের HCl কে 2 দিয়ে গুণ করি

$$Mg + 2HCl \longrightarrow MgCl_2 + H_2$$

উপরের বিক্রিয়ার বাম দিকের প্রতিটি পরমাণুর সংখ্যা এবং ডান দিকের প্রতিটি পরমাণুর সংখ্যা সমান হয়েছে। অতএব, রাসায়নিক বিক্রিয়ার বা রাসায়নিক সমীকরণের সমতা হয়েছে।

সমীকরণের সমতা হয়ে গেলে তাকে সমান চিহ্ন দ্বারাও লেখা যায়।

$$Mg + 2HCl = MgCl_2 + H_2$$

উদাহরণ ২:

$$Na_2CO_3 + HCl \longrightarrow NaCl + H_2O + CO_2$$

এই সমীকরণে সমতা নেই। কারণ বাম পাশে Na দুটি ডান পাশে Na একটি অতএব, ডান পাশে NaCl কে 2 দ্বারা গুণ করি

$$Na_2CO_3 + HCl \longrightarrow 2NaCl + H_2O + CO_2$$

এখনো সমতা হয়নি। ডান পাশে Cl দুটি বাম পাশে Cl একটি। বাম পাশের HCl কে 2 দ্বারা গুণ করি

$$Na_2CO_3 + 2HCl \longrightarrow 2NaCl + H_2O + CO_2$$

এখন উপরের বিক্রিয়ার বাম দিকের প্রতিটি পরমাণুর সংখ্যা এবং ডান দিকের প্রতিটি পরমাণুর সংখ্যা সমান হয়েছে। অতএব, রাসায়নিক বিক্রিয়ার বা রাসায়নিক সমীকরণের সমতা হয়েছে। সমীকরণের সমতা হয়ে গেলে তাকে সমান চিহ্ন দ্বারাও লেখা যায়।

$$Na_2CO_3 + 2HCl = 2NaCl + H_2O + CO_2$$

উদাহরণ ৩:

অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড হাইড্রোক্লোরিক এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড ও পানি উৎপন্ন হয়।

$$Al_2O_3 + HCl \longrightarrow AlCl_3 + H_2O$$

এই সমীকরণে সমতা নেই। Al কে সমান করার জন্য ডান পাশে $AlCl_3$ কে 2 দিয়ে গুণ করো।

$$Al_2O_3 + HCl \longrightarrow 2AlCl_3 + H_2O$$

এখনো সমতা হয়নি। Cl এর সমতাকরণের জন্য বাম পাশে HCl কে 6 দিয়ে গুণ দাও।

$$Al_2O_3 + 6HCl \longrightarrow 2AlCl_3 + H_2O$$

এখনো সমতা হয়নি। বাম পাশে অক্সিজেন (O) আছে তিনটি। ডান পাশে অক্সিজেন (O) আছে 1টি। বাম পাশে H আছে ছয়টি। ডান পাশে H আছে দুটি। সমতাকরণের জন্য ডান পাশের H_2O কে 3 দিয়ে গুণ দাও।

$$Al_2O_3 + 6HCl \longrightarrow 2AlCl_3 + 3H_2O$$

এবারে সমতা হয়ে গেছে।

$$Al_2O_3 + 6HCl = 2AlCl_3 + 3H_2O$$

৬.৩.২ মোল এবং রাসায়নিক সমীকরণ

নির্দিষ্ট পরিমাণ একটি বিক্রিয়ক অপর একটি বিক্রিয়কের নির্দিষ্ট পরিমাণের সাথে বিক্রিয়া করে নিদিষ্ট পরিমাণ উৎপাদ উৎপন্ন করে। রসায়নের যে শাখায় বিক্রিয়কের পরিমাণ থেকে উৎপাদের পরিমাণ এবং উৎপাদের পরিমাণ থেকে বিক্রিয়কের পরিমাণের হিসাব করা হয় তাকে স্টয়কিওমিতি (Stoichiometry) বলে। রাসায়নিক সমীকরণ থেকে মোলের হিসাব সংক্রান্ত যে তথ্যসমূহ লেখা যায় তা ঐ বিক্রিয়ার স্টয়কিওমিতি।

বিক্রিয়ার স্টয়কিওমিতি অনুযায়ী আমরা হিসাব করে বলতে পারি কতটি বিক্রিয়ক বিক্রিয়া করে কতটি উৎপাদ উৎপন্ন করেছে, কত মোল বিক্রিয়ক বিক্রিয়া করে কত মোল উৎপাদ উৎপন্ন করেছে, কতো গ্রাম বিক্রিয়ক বিক্রিয়া করে কত গ্রাম উৎপাদ উৎপন্ন করেছে।

$$2Mg(s) + O_2(g) \longrightarrow 2MgO(s)$$

ম্যাগনেসিয়াম অক্সিজেন ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড

স্টয়কিওমিতি অনুযায়ী উপরের বিক্রিয়ার বিভিন্ন পদার্থের নিচে নিচে আমরা নিম্নরূপ লিখতে পারি।

$2Mg(s)$ ম্যাগনেসিয়াম	+	$O_2(g)$ অক্সিজেন	$\longrightarrow$	$2MgO(s)$ ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড
2 মোল Mg পরমাণু		1 মোল O_2 অণু		2 মোল MgO অণু
$2\times6.023\times10^{23}$ টি Mg পরমাণু		6.023×10^{23} টি O_2 অণু		$2\times6.023\times10^{23}$ টি MgO অণু
2 × 24 = 48 গ্রাম		1×32 = 32 গ্রাম		2 × 40 = 80 গ্রাম

রাসায়নিক বিক্রিয়ার সমতাযুক্ত সমীকরণ এর নিচে প্রদত্ত এই সব হিসাব-নিকাশকেই বিক্রিয়ার স্টয়কিওমিতি বলা হয়। যদি বিক্রিয়ক এবং উৎপাদ উভয়েই গ্যাসীয় হয় তবে স্টয়কিওমিতিতে প্রমাণ অবস্থায় 1 মোল গ্যাসীয় পদার্থের আয়তন হয় 22.4 লিটার।

উদাহরণ

১. সমস্যা: 5 গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম ধাতু কত গ্রাম অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে সম্পূর্ণরূপে ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড তৈরি করে।

সমাধান: ম্যাগনেসিয়াম অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড তৈরি করে। এই বিক্রিয়ার সমতাযুক্ত সমীকরণ এবং স্টয়কিওমিতি পূর্বের পৃষ্ঠায় দেখানো হয়েছে। বিক্রিয়ার এই স্টয়কিওমিতি অনুযায়ী লেখা যায়:

48 গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম ধাতু বিক্রিয়া করে 32 গ্রাম অক্সিজেনের সাথে

কাজেই 1 গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম ধাতু বিক্রিয়া করে $\frac{1\times32}{48}$ গ্রাম অক্সিজেনের সাথে

5 গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম ধাতু বিক্রিয়া করে $\frac{1\times32\times5}{48} = 3.33$ গ্রাম অক্সিজেনের সাথে

---

২. সমস্যা: 2 গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম ধাতুর সাথে প্রয়োজনীয় পরিমাণ অক্সিজেন সরবরাহ করলে কত গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন হয়।

সমাধান: বিক্রিয়ার স্টয়কিওমিতি অনুযায়ী লেখা যায়:

48 গ্রাম Mg ধাতু থেকে উৎপন্ন হয় 80 গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড

1 গ্রাম Mg ধাতু থেকে উৎপন্ন হয় $\frac{80}{48}$ গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড

2 গ্রাম Mg ধাতু থেকে উৎপন্ন হয় $\frac{2\times80}{48}$ গ্রাম = 3.33 গ্রাম MgO

---

৩. সমস্যা: প্রয়োজনীয় পরিমাণ ম্যাগনেসিয়াম সরবরাহ করলে 10 গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন করতে কত গ্রাম অক্সিজেন প্রয়োজন?

সমাধান: বিক্রিয়ার স্টয়কিওমিতি অনুযায়ী লেখা যায়:

80 গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন হয় 32 গ্রাম অক্সিজেন থেকে

1 গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন হয় $\frac{32}{80}$ গ্রাম অক্সিজেন থেকে

10 গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন হয় $\frac{32\times10}{80}$ = 4 গ্রাম অক্সিজেন থেকে

৪. সমস্যা: 5টি N_2 অণু থেকে কতটি NH_3 অণু উৎপন্ন হবে?

সমাধান:

$$N_2(g) + 3H_2(g) \longrightarrow 2NH_3(g)$$

6.023×10^{23} টি অণু $3\times6.023\times10^{23}$ টি অণু $2\times6.023\times10^{23}$ টি অণু

বিক্রিয়ার সমীকরণ থেকে লিখতে পারি

6.023×10^{23} টি N_2 অণু থেকে উৎপন্ন হয় $2\times6.023\times10^{23}$ টি NH_3 অণু

অতএব, 1 টি N_2 অণু থেকে উৎপন্ন হয় $\frac{2\times6.023\times10^{23}}{6.023\times10^{23}}$ = 2টি NH_3 অণু

অতএব, 5 টি N_2 থেকে উৎপন্ন 2×5 = 10 টি NH_3 অণু

নিজে করো

কাজ: 6 মোল পানি উৎপন্ন করতে কত মোল O_2 প্রয়োজন হয়?

কাজ: প্রমাণ তাপমাত্রা ও চাপে 4 লিটার N_2 থেকে কত লিটার NH_3 পাওয়া যাবে? এখানে বিক্রিয়ক ও উৎপাদ সকল পদার্থ গ্যাসীয়।

৬.৪ লিমিটিং বিক্রিয়ক (Limiting Reactant)

রাসায়নিক বিক্রিয়ায় যে সকল পদার্থ অংশগ্রহণ করে তাদেরকে বিক্রিয়ক বলে এবং যে সকল পদার্থ উৎপন্ন হয় তাদেরকে উৎপাদ বলে। একাধিক বিক্রিয়কের মধ্যে যে বিক্রিয়কটির পরিমাণ স্টয়কিওমিতি পরিমাণ থেকে কম থাকে তাকে লিমিটিং বিক্রিয়ক বলে। কোন বিক্রিয়ক কতটুকু বিক্রিয়া করবে, কতটুকু অবশিষ্ট থাকবে এবং কোন উৎপাদ কতটুকু উৎপন্ন হবে ইত্যাদি বিষয় লিমিটিং বিক্রিয়কের পরিমাণ থেকে হিসাব করে বের করা হয়।

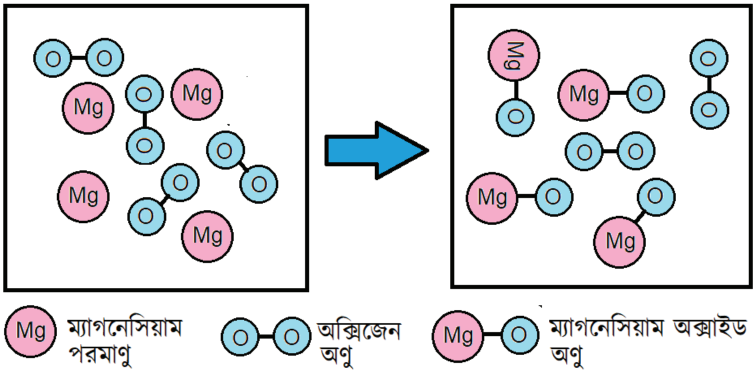

চিত্র ৬.০২: এখানে ম্যাগনেসিয়াম ধাতু লিমিটিং বিক্রিয়ক

উদাহরণ

১. সমস্যা: 4টি ম্যাগনেসিয়াম ধাতব পরমাণুর মধ্যে 4টি অক্সিজেন অণু মিশ্রিত করা হলো। এখানে কোন বিক্রিয়কটি লিমিটিং বিক্রিয়ক?

$2Mg$	+	O_2	$\longrightarrow$	$2MgO$
$2\times6.023\times10^{23}$ টি পরমাণু		6.023×10^{23} টি অণু		$2\times6.023\times10^{23}$ টি অণু

সমাধান:

উপরের সমীকরণ থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রতি 2টি Mg ধাতব পরমাণুর সাথে বিক্রিয়া করার জন্য প্রয়োজন 1টি O_2 অণু। কাজেই 4টি Mg ধাতব পরমাণুর সাথে বিক্রিয়া করার জন্য প্রয়োজন 2টি O_2 অণু। বিক্রিয়ার জন্য দেওয়া আছে 4টি O_2, কিন্তু বিক্রিয়া করেছে 2টি O_2। এখনো বিক্রিয়া পাত্রে উদ্বৃত্ত থেকে গেছে (4 - 2) = 2টি O_2 অণু। রাসায়নিক বিক্রিয়ায় যে বিক্রিয়ক বিক্রিয়া করে শেষ হয়ে যায় সেই বিক্রিয়কটি লিমিটিং বিক্রিয়ক হবে। এখানে ম্যাগনেসিয়াম বিক্রিয়া করে শেষ হয়ে গেছে কাজেই ম্যাগনেসিয়াম লিমিটিং বিক্রিয়ক।

যদি 70টি ম্যাগনেসিয়াম ধাতব পরমাণুর মধ্যে 30টি অক্সিজেন অণু মিশ্রিত করা হতো, তাহলে কোন বিক্রিয়কটি লিমিটিং বিক্রিয়ক হবে?

যেহেতু প্রতি 2টি Mg ধাতব পরমাণুর সাথে বিক্রিয়া করার জন্য প্রয়োজন 1টি O_2 অণু তাই 70টি ম্যাগনেসিয়াম ধাতব পরমাণুর সাথে বিক্রিয়া করার জন্য প্রয়োজন 35টি O_2 অণু। কিন্তু বিক্রিয়ার জন্য

২০২৩

দেওয়া আছে 30টি O_2 অণু অর্থাৎ অক্সিজেন অণুর পরিমাণ কম দেওয়া আছে। কাজেই এক্ষেত্রে অক্সিজেন লিমিটিং বিক্রিয়ক।

২. সমস্যা: 5 গ্রাম হাইড্রোজেন গ্যাসের মধ্যে 75 গ্রাম ক্লোরিন গ্যাস মিশ্রিত করা হলো, এখানে কোন বিক্রিয়কটি লিমিটিং বিক্রিয়ক? এবং বিক্রিয়া শেষে কোন বিক্রিয়ক কতটুকু উদ্বৃত্ত থাকবে বা অবশিষ্ট থাকবে?

$$\underset{2\ \text{গ্রাম}}{H_2} \qquad \underset{2\times35.5\ \text{গ্রাম} = 71\ \text{গ্রাম}}{Cl_2} \longrightarrow \underset{2\times36.5\ \text{গ্রাম} = 73\ \text{গ্রাম}}{2HCl}$$

সমাধান:

উপরের বিক্রিয়ার সমীকরণ থেকে লেখা যায়,

2 গ্রাম H_2 গ্যাসের সাথে বিক্রিয়া করার জন্য প্রয়োজন 71 গ্রাম Cl_2

অতএব, 5 গ্রাম H_2 গ্যাসের সাথে বিক্রিয়া করার জন্য প্রয়োজন $\frac{71\times5}{2}$ = 177.5 গ্রাম Cl_2

কিন্তু বিক্রিয়ার জন্য দেওয়া আছে 75 গ্রাম Cl_2 কাজেই Cl_2 এর পরিমাণ কম দেওয়া আছে। এক্ষেত্রে Cl_2 লিমিটিং বিক্রিয়ক।

নিজে করো

উপরের উদাহরণে কতটুকু H_2 অবশিষ্ট থাকবে বের করো।

৬.৫ উৎপাদের শতকরা পরিমাণ হিসাব (Calculation of the Percentage of Yield)

রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ব্যবহৃত বিক্রিয়কগুলো সব সময় 100% বিশুদ্ধ হয় না। যে বিক্রিয়ক সবচেয়ে বেশি বিশুদ্ধ তাকে অ্যানালার বা অ্যানালার গ্রেড পদার্থ বলে।

যদি কোনো পদার্থকে 99% বিশুদ্ধ করা যায় এবং এর চেয়ে আর বেশি বিশুদ্ধ করা সম্ভব না হয় তখন এই 99% বিশুদ্ধ পদার্থকেই অ্যানালার বলে। কোনো অবিশুদ্ধ পদার্থকে বিশুদ্ধ করার জন্য কেলাসন, পাতন, আংশিক পাতন, ক্রোমাটোগ্রাফি ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। এই বিশুদ্ধকরণ পদ্ধতি তোমরা পরবর্তী শ্রেণিতে শিখতে পারবে।

এক বা একাধিক বিশুদ্ধকরণ পদ্ধতি প্রয়োগ করেও অনেক পদার্থকে 100% বিশুদ্ধ করা যায় না। বিক্রিয়ক 100% বিশুদ্ধ না হলে লিমিটিং বিক্রিয়ক থেকে হিসাব করে যে পরিমাণ উৎপাদ হবার কথা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তার চেয়ে কম পরিমাণে উৎপাদ তৈরি হয়।

কোনো বিক্রিয়ায় উৎপাদের শতকরা পরিমাণকে নিচের সমীকরণের সাহায্যে বের করা যায়

$$\text{উৎপাদের শতকরা পরিমাণ} = \frac{\text{বিক্রিয়া হওয়ার পরে প্রাপ্ত প্রকৃত উৎপাদের পরিমাণ} \times 100}{\text{রাসায়নিক বিক্রিয়ায় সমীকরণ থেকে হিসাবকৃত উৎপাদের পরিমাণ}}$$

উদাহরণ

১. সমস্যা: 2 গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম ধাতু প্রয়োজনীয় পরিমাণ অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে 3.25 গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন হয়। উৎপাদের শতকরা পরিমাণ কতো?

$$2Mg(s) + O_2(g) \longrightarrow 2MgO(s)$$

2 × 24 = 48 গ্রাম   1×32 = 32 গ্রাম   2 × 40 = 80 গ্রাম

সমাধান:

সমীকরণ অনুযায়ী:

48 গ্রাম Mg থেকে উৎপন্ন হয় 80 গ্রাম MgO

কাজেই 2 গ্রাম Mg থেকে উৎপন্ন হয় $= \frac{2\times80}{48} = 3.33$ গ্রাম MgO

বিক্রিয়া হওয়ার পরে ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড প্রকৃত উৎপন্ন হয়েছে 3.25 গ্রাম

$$\text{অতএব, উৎপাদের শতকরা পরিমাণ} = \frac{\text{বিক্রিয়া হওয়ার পরে প্রাপ্ত প্রকৃত উৎপাদের পরিমাণ} \times 100}{\text{রাসায়নিক বিক্রিয়ায় সমীকরণ থেকে হিসাবকৃত উৎপাদের পরিমাণ}}$$

$$= \frac{3.25\times100}{3.33} = 97.6$$

নিজে করো

80 গ্রাম $CaCO_3$ কে তাপ দিয়ে 39 গ্রাম CaO পাওয়া যায়। উৎপাদের শতকরা পরিমাণ বের করো। Ca এর পারমাণবিক ভর 40, C এর পারমাণবিক ভর 12, O এর পারমাণবিক ভর 16।

পরীক্ষণ

250 মিলিলিটার (মিলি) আয়তনিক ফ্লাস্কে 0.1 মোলার সোডিয়াম কার্বনেট দ্রবণ প্রস্তুতি

মূলনীতি: সোডিয়াম কার্বনেট (Na_2CO_3) একটি প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ। কারণ সোডিয়াম কার্বনেটকে বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়, শুষ্ক অবস্থায় পাওয়া যায়, রাসায়নিক নিক্তিতে সরাসরি ওজন করা যায়, সোডিয়াম কার্বনেট দ্রবণের ঘনমাত্রা তৈরি করে রাখলে ঐ ঘনমাত্রা দীর্ঘদিন কোনো পরিবর্তন হয় না। একটি 250 মিলি আয়তনিক ফ্লাস্কে 0.1 মোলার সোডিয়াম কার্বনেটের দ্রবণ তৈরি করার জন্য নিচের হিসাব প্রয়োজন।

এখানে, V = 250 মিলিলিটার, S = 0.1 মোলার, M = 23×2 + 12 + 16×3 = 106, w =?

$$w = \frac{SVM}{1000}$$

$$w = \frac{0.1 \times 250 \times 106}{1000} \text{ গ্রাম}$$

$$w = 2.65 \text{ গ্রাম}$$

একটি আয়তনিক ফ্লাস্কে 2.65 গ্রাম সোডিয়াম কার্বনেট মেপে নিয়ে তার মধ্যে পানি যোগ করে দ্রবণের আয়তন 250 মিলিলিটার করলে 0.1 মোলার সোডিয়াম কার্বনেট দ্রবণ প্রস্তুত হয়ে যাবে। কিন্তু এই নির্দিষ্ট ঘনমাত্রার (মোলারিটির) দ্রবণ তৈরি করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। কারণ সঠিকভাবে 2.65 গ্রাম সোডিয়াম কার্বনেট মেপে নেওয়া অত্যন্ত কঠিন। অতএব, 0.1 মোলার ঘনমাত্রার কাছাকাছি কোনো ঘনমাত্রার দ্রবণ তৈরি করা হয়।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি: 250 মিলিলিটার আয়তনিক ফ্লাস্ক, ফানেল, ওজন বোতল, রাসায়নিক নিক্তি, ওয়াশ বোতল।

রাসায়নিক দ্রব্যাদি: বিশুদ্ধ সোডিয়াম কার্বনেট, পানি।

কার্যপদ্ধতি

1. একটি পরিষ্কার 250 মিলিলিটার আয়তনিক ফ্লাস্কের মুখে একটি পরিষ্কার ফানেল রাখা হলো।
2. শুষ্ক ওজন বোতলে কিছু পরিমাণ (2.65 গ্রামের বেশি) সোডিয়াম কার্বনেট নেওয়া হলো এবং রাসায়নিক নিক্তির সাহায্যে এর ওজন নেওয়া হলো।

২০২১

3. ওজন বোতলের সোডিয়াম কার্বনেট ফানেলের মধ্য দিয়ে আয়তনিক ফ্লাস্কে এমনভাবে ঢালা হলো যেন সোডিয়াম কার্বনেটসহ ওজন বোতলের ওজন পূর্বের ওজন অপেক্ষা 2.65 গ্রাম কম হয়।

4. ওয়াশ বোতল থেকে পাতিত পানি ফানেলের মাধ্যমে আয়তনিক ফ্লাস্কে আস্তে আস্তে যোগ করা হলো। অর্ধেক পানি ঢালার পর আয়তনিক ফ্লাস্কের মুখের ছিপি আটকিয়ে আয়তনিক ফ্লাস্ক ঝাঁকিয়ে সোডিয়াম কার্বনেটকে সম্পূর্ণভাবে দ্রবীভূত করা হলো। এরপর আরো পানি যোগ করে আয়তনিক ফ্লাস্কের 250 mL দাগ পর্যন্ত পানি দ্বারা পূর্ণ করা হলো।

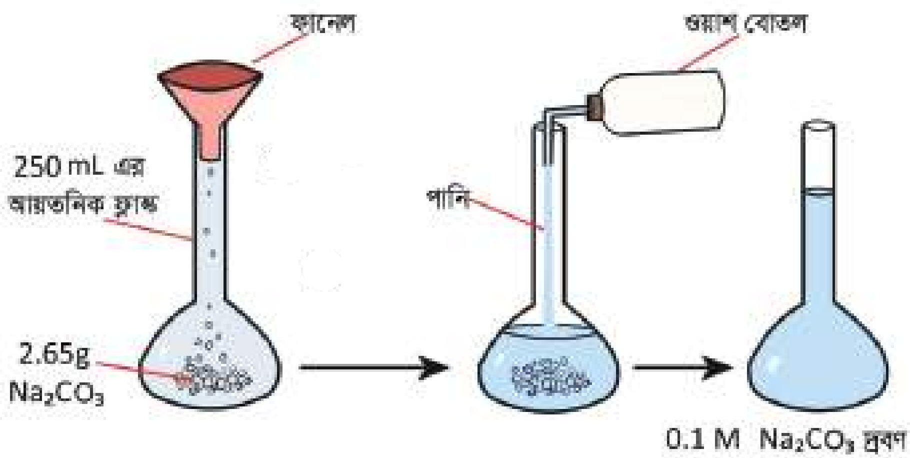

চিত্র ৬.০৩: 0.1 মোলার সোডিয়াম কার্বনেট দ্রবণ প্রস্তুতি

সতর্কতা

1. শুষ্ক ও বিশুদ্ধ সোডিয়াম কার্বনেট নেওয়া।
2. শুষ্ক ওজন বোতল নেওয়া।
3. বিশুদ্ধ পানি অর্থাৎ পাতিত পানি আয়তনিক ফ্লাস্কে যোগ করা।

শিক্ষার্থীর কাজ: উপরের ব্যবহারিক কার্যের ধারা অনুসারে তোমাদের ডাটা বা উপাত্তগুলো ব্যবহার করে তোমরা 250 মিলি আয়তনিক ফ্লাস্কে 0.1 মোলার সোডিয়াম কার্বনেট দ্রবণ প্রস্তুত করো।

পরীক্ষণ

তুঁতের কেলাস পানির শতকরা পরিমাণ নির্ণয়

মূলনীতি: তুঁতের রাসায়নিক নাম ব্লু ভিট্রিয়ল (Blue Vitriol) বা কপার সালফেট পেন্টাহাইড্রেট। এর সংকেত $CuSO_4.5H_2O$। কপার সালফেট ও 5 অণু পানির সমন্বয়ে তুঁতে গঠিত। এটি খাবার লবণ সোডিয়াম ক্লোরাইডের মতো কেলাস আকৃতির দানাদার পদার্থ। খাবার লবণের বর্ণ সাদা, তুঁতের বর্ণ নীল। তুঁতের মধ্যে 5 অণু পানি থাকে। তুঁতেকে উত্তপ্ত করলে ঐ 5 অণু পানি বাষ্প হয়ে উড়ে যায়। তখন তুঁতের মধ্যে কোনো পানি থাকে না এবং তুঁতের বর্ণ সাদা হয়ে যায়। এই 5 অণু পানিকে কেলাস পানি বলে।

$$\underset{\text{নীল বর্ণ}}{CuSO_4.5H_2O} \longrightarrow \underset{\text{সাদা বর্ণ}}{CuSO_4} + 5H_2O$$

প্রয়োজনীয় উপকরণ: তুঁতে (ব্লু ভিট্রিয়ল), ডেসিকেটর, নিক্তি, তুঁতে, সিরামিক বাটি, ত্রিপদী স্ট্যান্ড, তারজালি, বুনসেন বার্নার বা স্পিরিট ল্যাম্প।

কার্যপদ্ধতি

1. নিক্তি দিয়ে একটি পোর্সেলিন ক্রুসিবল মেপে নেওয়া হলো। ধরা যাক ক্রুসিবল এর ওজন a গ্রাম। এবার এই পোর্সেলিন ক্রুসিবলের মধ্যে কিছু তুঁতে নেওয়া হলো এবং তুঁতেসহ ক্রুসিবলের ওজন পাওয়া গেল b গ্রাম। কাজেই তুঁতের ওজন (b - a) গ্রাম।

2. একটি ত্রিপদী স্ট্যান্ডের উপর তারজালি স্থাপন করে তারজালির উপরে তুঁতেসহ ক্রুসিবলকে বুনসেন বার্নার বা স্পিরিট ল্যাম্প দিয়ে তাপ দেওয়া হলো।

চিত্র ৬.০৪: তুঁতের কেলাস পানির পরিমাণ নির্ণয়

3. তাপ প্রদান করার ফলে যে তুঁতের বর্ণ নীল ছিল সেই তুঁতের বর্ণ আস্তে আস্তে সাদা হয়ে যাবে। তাপ প্রয়োগের ফলে তুঁতে থেকে পানি অপসারিত হওয়ার কারণে তুঁতের বর্ণ সাদা হয়ে যাবে।

4. তুঁতের বর্ণ একেবারে সাদা হয়ে যাওয়ার পর বুনসেন বার্নার বা স্পিরিট ল্যাম্প বন্ধ করে তাপ দেওয়া বন্ধ করা হলো।

5. এবার পোর্সেলিন ক্রুসিবলকে দ্রুত ডেসিকেটরে নিয়ে যাওয়া হলো এবং দ্রুত শীতল করে পোর্সেলিন ক্রুসিবলের ওজন নেওয়া হলো। এটি দ্রুত করতে হবে, তা না হলে তুঁতে আবার পানি শোষণ করে নীল বর্ণ ধারণ করবে। ধরা যাক এই ওজন c গ্রাম।

তাহলে পানি অপসারিত হবার পর তুঁতের ওজন (c - a) গ্রাম
তুঁতে থেকে অপসারিত পানির পরিমাণ (b - a) - (c - a) গ্রাম
= (b - c) গ্রাম

হিসাব

(b - a) গ্রাম তুঁতে থেকে অপসারিত পানির পরিমাণ (b - c) গ্রাম

কাজেই 100 গ্রাম তুঁতে থেকে অপসারিত পানির পরিমাণ $\frac{(b-c)}{(b-a)} \times 100$ গ্রাম

তুঁতেতে কেলাস পানির শতকরা পরিমাণ $\frac{(b-c)}{(b-a)} \times 100$ %

সতর্কতা

পোর্সেলিন বাটিতে তুঁতে উত্তপ্ত করার সময় ধীরে ধীরে এবং সমানভাবে তাপ দিতে হবে। তাপ দিয়ে পানি বাষ্পীভূত করার পর দ্রুত পোর্সেলিনসহ তুঁতের ওজন নিতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ: তুঁতের কেলাস পানির শতকরা পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য এইরূপ একটি পরীক্ষাকার্য সম্পাদন করো।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. প্রমাণ অবস্থায় 2 গ্রাম হাইড্রোজেন গ্যাসের আয়তন কত লিটার?

(ক) 2.24 (খ) 11.2
(গ) 22.4 (ঘ) 44.8

২. নিচের কোনটি ক্যালসিয়াম ফসফেটের সংকেত?

(ক) $CaPO_4$ (খ) $Ca(PO_4)_2$
(গ) $Ca_2(PO_4)_3$ (ঘ) $Ca_3(PO_4)_2$

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

5 গ্রাম হাইড্রোজেন গ্যাসকে 75 গ্রাম ক্লোরিন গ্যাসের মধ্যে চালনা করা হলো।

৩. উদ্দীপকে ব্যবহৃত ক্লোরিন পরমাণুর সংখ্যা কতটি?

(ক) 1.27×10^{24} (খ) 2.54×10^{24}
(গ) 6.02×10^{23} (ঘ) 6.36×10^{23}

৪. উদ্দীপকের বিক্রিয়ায় অবশিষ্ট থাকে–

(ক) 1.44 মোল H_2 (খ) 1.44 মোল Cl_2
(গ) 2.89 মোল H_2 (ঘ) 2.89 মোল Cl_2

৫. CO_2 এর 2×10^{23} টি অণুর ভর কত?

(ক) 44g (খ) 22g
(গ) 14.6g (ঘ) 12g

৬. 10g $CaCO_3$ এ কয়টি অণু আছে?

(ক) 6.02×10^{23}টি (খ) 6.02×10^{22} টি
(গ) 6.02×10^{21} টি (ঘ) 2.58×10^{22}টি

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.

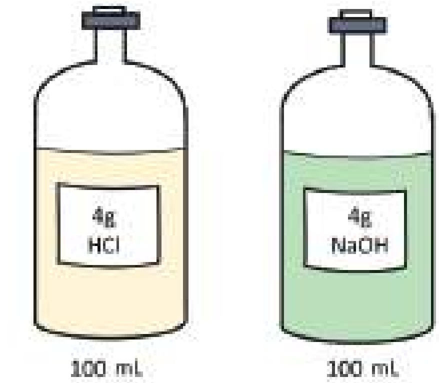

(ক) মোল কাকে বলে?

(খ) স্থূল সংকেত ও আণবিক সংকেত উদাহরণসহ লেখো।

(গ) উদ্দীপকের দ্রবণদ্বয়কে একত্রে মিশ্রিত করলে যে লবণ পাওয়া যায় তার সংযুক্তি নির্ণয় করে দেখাও।

(ঘ) উদ্দীপকের দ্রবণ দুটির মোলারিটি সমান হবে কিনা তার গাণিতিক যুক্তি দাও।

২. 10 গ্রাম $CaCO_3$ প্রস্তুত করার লক্ষ্যে 4.4 গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইড ও 5 গ্রাম ক্যালসিয়াম অক্সাইড মিশ্রিত করা হলো। বিক্রিয়ায় প্রত্যাশিত উৎপাদ পাওয়া গেল না।

(ক) রাসায়নিক সমীকরণ কাকে বলে?

(খ) কার্বন ডাইঅক্সাইড এর মোলার আয়তন ব্যাখ্যা করো।

(গ) বিক্রিয়ায় কত মোল কার্বন ডাইঅক্সাইড ব্যবহার করা হয়েছিল তা নিরূপণ করে দেখাও।

(ঘ) উদ্দীপকের বিক্রিয়ায় প্রত্যাশিত উৎপাদের পরিমাণ কম হওয়ার যৌক্তিক ব্যাখ্যা দাও।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. Na_2CO_3 এর সেমিমোলার দ্রবণ ব্যাখ্যা করো।

২. দ্রবণের মোলারিটি দ্রবের মোল সংখ্যার সাথে সম্পর্কিত ব্যাখ্যা করো।

৩. H_2SO_4 এর 100 মিলিলিটার ডেসিমোলার দ্রবণ কীভাবে তৈরি করা যায়? বর্ণনা করো।

২০২৫

সপ্তম অধ্যায়

রাসায়নিক বিক্রিয়া

(Chemical Reactions)

আমরা জানি, পদার্থের প্রকৃতি, ধর্ম এবং তাদের পরিবর্তন রসায়ন পাঠের মূল বিষয়। আমাদের চারপাশে বিভিন্ন পদার্থ প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। ভিন্ন অবস্থায় পরিণত হওয়াকে ভৌত পরিবর্তন এবং সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী নতুন পদার্থে পরিণত হওয়াকে রাসায়নিক পরিবর্তন বলে। এই পরিবর্তনগুলো ঘটে নানা ধরনের ভৌত পরিবর্তন ও রাসায়নিক বিক্রিয়ার কারণে। এই অধ্যায়ে রাসায়নিক বিক্রিয়ার প্রকারভেদ, রাসায়নিক বিক্রিয়ার হার ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- ভৌত পরিবর্তন ও রাসায়নিক বিক্রিয়ার পার্থক্য করতে পারব।
- পদার্থের পরিবর্তনকে বিশ্লেষণ করে রাসায়নিক বিক্রিয়া শনাক্ত করতে পারব।
- রাসায়নিক বিক্রিয়ার শ্রেণিবিভাগ, রেডক্স/নন-রেডক্স, একমুখী, উভমুখী, তাপ উৎপাদী, তাপহারী বিক্রিয়ার সংজ্ঞা দিতে পারব এবং বিক্রিয়ার বিভিন্ন প্রকার শনাক্ত করতে পারব।
- রাসায়নিক বিক্রিয়ায় উৎপন্ন পদার্থের পরিমাণকে লা-শাতেলিয়ারের নীতির আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরিবর্তন বিশ্লেষণ করে জারণ-বিজারণ বিক্রিয়ার প্রকার শনাক্ত করতে পারব।
- বাস্তবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংঘটিত বিক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বাস্তব ক্ষেত্রে সংঘটিত ক্ষতিকর বিক্রিয়াসমূহ নিয়ন্ত্রণ বা রোধের উপায় নির্ধারণ করতে পারব। (লোহার তৈরি জিনিসের মরিচা পড়া রোধের যথার্থ উপায় নির্ধারণ করতে পারব।)
- রাসায়নিক বিক্রিয়ার হার ব্যাখ্যা ও সংশ্লিষ্ট হারের তুলনা করতে পারব।
- বিভিন্ন পদার্থ ব্যবহার করে বিক্রিয়ার গতিবেগ বা হার পরীক্ষা ও তুলনা করতে পারব।
- দৈনন্দিন কাজে ধাতব বস্তু ব্যবহারে সচেতনতা প্রদর্শন করতে পারব।
- পরীক্ষার সাহায্যে বিক্রিয়ার হারের ভিন্নতা প্রদর্শন করতে পারব।
- অম্ল-ক্ষার প্রশমন বিক্রিয়া এবং অধঃক্ষেপণ বিক্রিয়া প্রদর্শন করতে পারব।

৭.১ পদার্থের পরিবর্তন (Changes of Matter)

আমরা সব সময় আমাদের চারপাশের নানা পদার্থ তাপ, চাপ কিংবা একে অন্যের সংস্পর্শে এসে পরিবর্তিত হতে দেখি। পদার্থের দুই ধরনের পরিবর্তন হয়—কখনো হয় ভৌত পরিবর্তন, কখনো বা রাসায়নিক পরিবর্তন।

৭.১.১ ভৌত পরিবর্তন

প্রতিটি রাসায়নিক পদার্থ এক বা একাধিক মৌল দিয়ে গঠিত। যদি কোনো পদার্থের অভ্যন্তরীণ রাসায়নিক গঠনের কোনো পরিবর্তন না ঘটে শুধু বাহ্যিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে তাকে ভৌত পরিবর্তন (Physical Change) বলে। যেমন—এক খণ্ড কঠিন বরফকে কক্ষ তাপমাত্রায় রেখে দিলে তা পরিবেশ থেকে তাপ গ্রহণ করে আস্তে আস্তে গলে তরল পানিতে পরিণত হয়। আবার, তরল পানিকে তাপ প্রদান করে 100°C এ উন্নীত করলে সেটি জলীয় বাষ্পে পরিণত হয়। এখানে কঠিন বরফ, পানি এবং জলীয় বাষ্প এ তিনটি পদার্থের আণবিক সংকেত H_2O। অর্থাৎ তরল পানি, কঠিন বরফ এবং গ্যাসীয় জলীয় বাষ্প তিনটিরই প্রতিটি অণুতে দুটি করে হাইড্রোজেন ও একটি করে অক্সিজেন পরমাণু থাকে। কাজেই তিনটি পদার্থ একই। শুধু এদের ভৌত অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে—বরফ কঠিন, পানি তরল এবং জলীয় বাষ্প গ্যাসীয়। এ ধরনের পরিবর্তনকে আমরা ভৌত পরিবর্তন বলব।

$$\text{বরফ (কঠিন)} \underset{\text{ঠান্ডা (-তাপ)}}{\overset{\text{+তাপ}}{\rightleftharpoons}} \text{পানি (তরল)} \underset{\text{ঠান্ডা (-তাপ)}}{\overset{\text{+তাপ}}{\rightleftharpoons}} \text{গ্যাস}$$

৭.১.২ রাসায়নিক পরিবর্তন

কখনো কখনো দেখা যায় যেকোনো পদার্থের বাহ্যিক তাপমাত্রা ও চাপের পরিবর্তন করলে কিংবা অন্য পদার্থের সংস্পর্শে আনলে তা পরিবর্তিত হয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী নতুন পদার্থে পরিণত হয়। এ ধরনের পরিবর্তনকে রাসায়নিক পরিবর্তন (Chemical Change) বলে। অর্থাৎ যে পরিবর্তনের ফলে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্মবিশিষ্ট নতুন পদার্থে পরিণত হয় তাকে রাসায়নিক পরিবর্তন বলে। রাসায়নিক পরিবর্তনে নতুন যে পদার্থ উৎপন্ন হয় তার অণুতে অবস্থিত মৌলগুলো পূর্বের পদার্থ থেকেই আসে। পূর্বের অণুর মধ্যে বন্ধনসমূহের ভাঙনের মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন আয়ন বা পরমাণুর সৃষ্টি হয়। পরবর্তীকালে আয়ন বা পরমাণুগুলোর মধ্যে নতুন বন্ধন গঠিত হয়ে নতুন অণুর সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ এক কথায় পুরোনো বন্ধনের ভাঙন এবং নতুন বন্ধনের গঠনই মূলত রাসায়নিক বিক্রিয়া বা রাসায়নিক পরিবর্তন। রান্নার কাজে আমরা যে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করি সে গ্যাসের প্রধান উপাদান হলো মিথেন (CH_4)। মিথেন গ্যাসকে অক্সিজেনে পোড়ালে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস, জলীয় বাষ্প এবং তাপ শক্তি উৎপন্ন হয়। এ ধরনের পরিবর্তনই রাসায়নিক পরিবর্তন।

$$CH_4(g) + O_2(g) \longrightarrow CO_2(g) + H_2O(l)$$

একইভাবে, ক্যালসিয়াম কার্বনেট হাইড্রোক্লোরিক এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, কার্বন ডাই-অক্সাইড ও পানি উৎপন্ন করে। এটিও রাসায়নিক পরিবর্তন।

$$CaCO_3\,(s) + 2HCl\,(aq) \longrightarrow CaCl_2\,(aq) + CO_2\,(g) + H_2O\,(l)$$

৭.২ রাসায়নিক বিক্রিয়ার শ্রেণিবিভাগ (Classification of Chemical Reactions)

রাসায়নিক বিক্রিয়াকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর ভিত্তি করে শ্রেণিবিভাগ করা যায়:

৭.২.১ রাসায়নিক বিক্রিয়ার দিক

বিক্রিয়ার দিকের উপর ভিত্তি করে রাসায়নিক বিক্রিয়াকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। **একমুখী বিক্রিয়া ও উভমুখী বিক্রিয়া।**

একমুখী বিক্রিয়া (Irreversible Reactions)

যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বিক্রিয়ক পদার্থগুলো উৎপাদে পরিণত হয়, কিন্তু উৎপাদ পদার্থগুলো পুনরায় বিক্রিয়কে পরিণত হয় না তাকে একমুখী বিক্রিয়া বলা হয়। যেমন: তুমি যদি ক্যালসিয়াম কার্বনেটকে একটি খোলা পাত্রে নিয়ে তাপ দাও তাহলে দেখবে ক্যালসিয়াম কার্বনেট ভেঙে গিয়ে কঠিন চুন ও গ্যাসীয় কার্বন ডাই-অক্সাইডে পরিণত হবে। গ্যাসীয় কার্বন ডাই-অক্সাইড বিক্রিয়া পাত্র থেকে অপসারিত হয় এ অবস্থায় কঠিন চুন পুনরায় ক্যালসিয়াম কার্বনেটে পরিণত হয় না। সুতরাং এটি একটি একমুখী বিক্রিয়া। একমুখী বিক্রিয়ার সমীকরণে বিক্রিয়ক ও উৎপাদের মধ্যে একটি ডানমুখী তির চিহ্ন ($\rightarrow$) ব্যবহার করা হয়।

$$CaCO_3\,(s) \xrightarrow{\text{তাপ}} CaO\,(s) + CO_2(g)$$

উভমুখী বিক্রিয়া (Reversible Reactions)

যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বিক্রিয়ক পদার্থ বিক্রিয়া করে উৎপাদে পরিণত হয় আবার উৎপাদ পদার্থগুলো বিক্রিয়া করে পুনরায় বিক্রিয়ক পদার্থে পরিণত হয়। এই ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়াকে উভমুখী বিক্রিয়া বলে। উভমুখী বিক্রিয়ায় বিক্রিয়ক হতে উৎপাদ হওয়ার বিক্রিয়াকে সম্মুখমুখী বিক্রিয়া এবং উৎপাদ

হতে বিক্রিয়কে পরিণত হওয়ার বিক্রিয়াকে পশ্চাৎমুখী বা বিপরীতমুখী বিক্রিয়া বলা হয়। উভমুখী বিক্রিয়ায় বিক্রিয়ক ও উৎপাদের মধ্যে বিপরীতমুখী দুটি অর্ধ তির চিহ্ন ($\rightleftharpoons$) ব্যবহার করে সমীকরণ উপস্থাপন করা হয়। যেমন: হাইড্রোক্লোরিক এসিডের উপস্থিতিতে ইথানল ও ইথানয়িক এসিড পরস্পরের সাথে বিক্রিয়া করে ইথাইল ইথানয়েট এস্টার ও পানি উৎপন্ন করে। অপরদিকে, উৎপন্ন ইথাইল ইথানয়েট এস্টার ও পানি পরস্পরের সাথে বিক্রিয়া করে ইথানল ও ইথানয়িক এসিড উৎপন্ন করে। একে নিম্নরূপে দেখানো যায়:

$$C_2H_5OH + CH_3COOH \xrightleftharpoons{HCl} CH_3COOC_2H_5 + H_2O$$

ইথানল ইথানয়িক এসিড ইথাইল ইথানয়েট এস্টার পানি

হাইড্রোজেন এবং আয়োডিন বিক্রিয়া করে হাইড্রোজেন আয়োডাইড উৎপাদ উৎপন্ন করে। আবার, উৎপাদ হাইড্রোজেন আয়োডাইড ভেঙে পুনরায় হাইড্রোজেন ও আয়োডিনে পরিণত হয়। কাজেই এ বিক্রিয়াটিও উভমুখী:

$$H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$$

আসলে উপর্যুক্ত শর্তে সব বিক্রিয়াই উভমুখী, তবে কিছু বিক্রিয়ার বেলায় সম্মুখমুখী বিক্রিয়ার তুলনায় বিপরীতমুখী বিক্রিয়ার পরিমাণ এত কম থাকে যে বিক্রিয়াকে একমুখী মনে হয়।

৭.২.২ রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তাপের পরিবর্তন

ইতঃপূর্বে তোমরা জেনেছ যে, তাপীয় পরিবর্তনের মাধ্যমে রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটিত হয়। তাপের শোষণ এবং তাপ উৎপন্ন হওয়ার উপর ভিত্তি করে রাসায়নিক বিক্রিয়াকে দুইভাগে ভাগ করা যায় যথা: তাপোৎপাদী বিক্রিয়া এবং তাপহারী বিক্রিয়া।

তাপোৎপাদী বিক্রিয়া (Exothermic Reactions)

যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তাপ উৎপন্ন হয় তাকে তাপোৎপাদী বিক্রিয়া বলে। যেমন: হেবার প্রণালিতে 1 মোল নাইট্রোজেন ও 3 মোল হাইড্রোজেন হতে 2 মোল অ্যামোনিয়া উৎপাদনের সময় 92 কিলোজুল তাপ উৎপন্ন হয়। বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ:

$$N_2(g) + 3H_2(g) \xrightleftharpoons[\substack{200\text{-}250\ atm \\ 450^\circ C\text{-}550^\circ C}]{Fe} 2NH_3(g) + 92\ kJ$$

নাইট্রোজেন হাইড্রোজেন অ্যামোনিয়া তাপ

২০২৩

এখানে Fe চূর্ণ প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। সমতাকৃত সমীকরণ অনুযায়ী একটি রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটিত হতে তাপের যে পরিবর্তন হয় তাকে বিক্রিয়া তাপ বলে। বিক্রিয়ার তাপকে ΔH দ্বারা প্রকাশ করা হয়। **ব্রিক্রিয়ায় তাপ উৎপাদন হলে ΔH এর মান ঋণাত্মক হয়।** কাজেই আমরা আগের বিক্রিয়াকে এভাবে লিখতে পারি:

$$N_2(g) + 3H_2(g) \xrightleftharpoons[\text{200-250 atm, } 450^\circ C\text{-}550^\circ C]{Fe} 2NH_3(g) \quad ; \quad \Delta H = -92\ kJ$$

নাইট্রোজেন		হাইড্রোজেন	200-250 atm 450°C-550°C	অ্যামোনিয়া	তাপ

তাপহারী বিক্রিয়া বা তাপশোষী বিক্রিয়া (Endothermic Reactions)

যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তাপশক্তির শোষন ঘটে সেই রাসায়নিক বিক্রিয়াকে তাপহারি বা তাপশোষী বিক্রিয়া বলে। যেমন- 1 মোল নাইট্রোজেন ও 1 মোল অক্সিজেন পরস্পরের সাথে বিক্রিয়া করে 2 মোল নাইট্রিক অক্সাইড উৎপন্ন হওয়ার সময় 180 kJ তাপ শোষিত হয়। এটি তাপশোষী বিক্রিয়া।

$$N_2(g) + O_2(g) + 180\ kJ \rightleftharpoons 2NO(g)$$

আমরা বিক্রিয়া তাপ ΔH ব্যবহার করেও লিখতে পারি। তাপশোষী বিক্রিয়ায় ΔH এর মান ধনাত্মক।

$$N_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2NO(g)\ ; \Delta H = +\ 180\ kJ$$

৭.২.৩ ইলেকট্রন স্থানান্তর

ইলেকট্রন স্থানান্তরের উপর ভিত্তি করে রাসায়নিক বিক্রিয়াকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা: রেডক্স বিক্রিয়া এবং নন-রেডক্স বিক্রিয়া।

রেডক্স (Redox) বিক্রিয়া

Reduction (বিজারণ) শব্দের এর প্রথমাংশ Red এবং Oxidation (জারণ) শব্দের প্রথমাংশ ox এর সমন্বয়ে গঠিত শব্দ হলো Redox অর্থাৎ এর নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে রেডক্স (Redox) অর্থ জারণ-বিজারণ। জারণ-বিজারণ বিক্রিয়ায় বিক্রিয়কসমূহের মধ্যে ইলেকট্রনের আদানপ্রদান ঘটে। একটি বিক্রিয়ক ইলেকট্রন ত্যাগ করে এবং অপর বিক্রিয়কটি সেই ইলেকট্রনকে গ্রহণ করে। সুতরাং জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া দুটি অর্ধাংশে বিভক্ত। এক অর্ধাংশে বিক্রিয়ক ইলেকট্রন ত্যাগ করে যাকে জারণ অর্ধবিক্রিয়া বলে। অপর অর্ধাংশে অন্য একটি বিক্রিয়ক ইলেকট্রন গ্রহণ করে যাকে বিজারণ অর্ধবিক্রিয়া

২০২৬

বলে। উল্লেখ্য যে, জারণ-বিজারণ বিক্রিয়ায় যে বিক্রিয়কটি ইলেকট্রন ত্যাগ করে তাকে বিজারক পদার্থ বলা হয় এবং যে বিক্রিয়কটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে তাকে জারক পদার্থ বলা হয়।

$$Na + \frac{1}{2} Cl_2 \longrightarrow NaCl$$

এই বিক্রিয়ায় Na ইলেকট্রন ত্যাগ করছে, সুতরাং Na বিজারক পদার্থ। অপরদিকে, Cl ইলেকট্রন গ্রহণ করেছে তাই Cl জারক পদার্থ।

যে বিক্রিয়ায় কোনো পরমাণুর ইলেকট্রনের দান ঘটে অর্থাৎ ঐ পরমাণুর ধনাত্মক চার্জের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় বা ঋণাত্মক চার্জের সংখ্যা হ্রাস পায় সেই বিক্রিয়াকে জারণ বিক্রিয়া বলে। যেমন-

$$Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+} + e^- \text{ [জারণ বিক্রিয়া]}$$
$$Na^0 \rightarrow Na^{1+} + e^- \text{ [জারণ বিক্রিয়া]}$$

যে বিক্রিয়ায় কোনো পরমাণুর ইলেকট্রনের গ্রহণ ঘটে অর্থাৎ ঐ পরমাণুর ধনাত্মক চার্জের সংখ্যা হ্রাস পায় বা ঋণাত্মক চার্জের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় সেই বিক্রিয়াকে বিজারণ বিক্রিয়া বলে। যেমন-

$$Cl^0 + e^- \rightarrow Cl^{1-} \text{ [বিজারণ বিক্রিয়া]}$$
$$Cu^{2+} + e^- \rightarrow Cu^{1+} \text{ [বিজারণ বিক্রিয়া]}$$

জারণ সংখ্যা: কোনো অণু বা যৌগমূলকের মধ্যে অবস্থিত পরমাণুগুলোর কোনোটি ইলেকট্রন ছেড়ে দেওয়ার আবার কোনোটি ইলেকট্রন গ্রহণ করার প্রবণতা দেখায়। অণু বা যৌগমূলকের মধ্যে অবস্থিত কোনো পরমাণুর ইলেকট্রন ছাড়ার প্রবণতাকে ধনাত্মক চিহ্নযুক্ত একটি সংখ্যা দিয়ে আর কোনো পরমাণুর ইলেকট্রন গ্রহণ করার প্রবণতাকে ঋণাত্মক চিহ্নযুক্ত সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করা হয়। অণু বা যৌগমূলকের মধ্যে অবস্থিত কোনো পরমাণুর এই ধনাত্মক বা ঋণাত্মক চিহ্নযুক্ত সংখ্যাকেই তার জারণ সংখ্যা (Oxidation Number) বলে।

একক পরমাণু যেমন: Na, Mg, Fe ইত্যাদিতে সংশ্লিষ্ট পরমাণুসমূহের জারণ সংখ্যা শূন্য ধরা হয়। আবার, একই পরমাণু দিয়ে গঠিত অণু যেমন: H_2, O_2, N_2, Cl_2, Br_2 ইত্যাদিতে সংশ্লিষ্ট পরমাণুসমূহের জারণ সংখ্যা শূন্য (0)।

$FeSO_4$ অণুতে Fe এর জারণ সংখ্যা +2 আবার Fe ধাতুতে Fe এর জারণ সংখ্যা শূন্য। HCl এ Cl এর জারণ সংখ্যা -1 আবার Cl_2 অণুতে এর জারণ সংখ্যা শূন্য (0)।

জারণ সংখ্যা নির্ণয়: একটি যৌগে কোনো একটি মৌলের জারণ সংখ্যা যৌগের অন্যান্য মৌলের জারণ সংখ্যার উপর নির্ভর করে। যৌগে কোনো একটি মৌলের জারণ সংখ্যা বের করার জন্য যৌগের অন্যান্য মৌলের জারণ সংখ্যা জানতে হয়।

২০২৩

টেবিল ৭.০১: বিভিন্ন যৌগে পরমাণুর জারণ সংখ্যা

জারণ সংখ্যার নিয়ম	যৌগের সংকেত	মৌল ও জারণ সংখ্যা
ধাতুসমূহের জারণ সংখ্যা ধনাত্মক এবং অধাতুসমূহের জারণ সংখ্যা ঋণাত্মক হয়।	NaCl	Na = +1 Cl = -1
নিরপেক্ষ পরমাণু বা মুক্ত মৌলের জারণ সংখ্যা শূন্য হয়।	Fe, H_2	Fe = 0 H = 0
নিরপেক্ষ যৌগে পরমাণুসমূহের মোট জারণ সংখ্যা শূন্য হয়।	H_2O	H = +1 O = -2 মোট = ০
আধানবিশিষ্ট আয়নে পরমাণুসমূহের মোট জারণ সংখ্যা আধান সংখ্যার সমান হয়।	SO_4^{-2}, $\overset{+}{N}H_4$	SO_4^{2-}= -2 NH_4^+ = +1
যৌগে ক্ষার ধাতুসমূহের জারণ সংখ্যা +1 হয়।	KCl, K_2CO_3	K = +1
যৌগে মৃৎক্ষার ধাতুসমূহের জারণ সংখ্যা +2 হয়।	CaO, $MgSO_4$	Ca = +2 Mg = +2
ধাতব হ্যালাইডে হ্যালোজেনের জারণ সংখ্যা -1 হয়।	$MgCl_2$, LiCl	Cl = -1
অধিকাংশ যৌগে হাইড্রোজেনের জারণ সংখ্যা +1 কিন্তু ধাতব হাইড্রাইডে হাইড্রোজেনের জারণ সংখ্যা -1 হয়।	NH_3, $LiAlH_4$	H = +1 H = -1
অধিকাংশ যৌগে (অক্সাইডে) অক্সিজেনের জারণ সংখ্যা -2 কিন্তু পার-অক্সাইডে অক্সিজেনের জারণ সংখ্যা -1 হয় এবং সুপার-অক্সাইডে অক্সিজেনের জারণ সংখ্যা $-\frac{1}{2}$।	K_2O, CaO K_2O_2, H_2O_2 NaO_2' KO_2	O = -2 O = -1 O = $-\frac{1}{2}$

কোনো অণু বা আয়নে সংশ্লিষ্ট পরমাণুর জারণ সংখ্যা নিচের পদ্ধতিতে নির্ণয় করা যায়:

1. যৌগ বা আয়নে অবস্থিত যে পরমাণুটির জারণ সংখ্যা বের করতে হবে ধরে নেই তার জারণ সংখ্যা x।

2. যৌগ বা আয়নের সকল মৌলের জারণ সংখ্যাকে তাদের নিজ নিজ পরমাণু সংখ্যা দ্বারা গুণ করে তাদের সমষ্টি বের করতে হবে।

3. জারণ সংখ্যার সমষ্টি হবে অণুর ক্ষেত্রে শূন্য (0) এবং আয়নের ক্ষেত্রে তার চিহ্নসহ চার্জ সংখ্যার সমান। এখান থেকে পরমাণুর জারণ সংখ্যা x বের করা যাবে। যেমন: ধরা যাক $KMnO_4$ অণুতে কেন্দ্রীয় পরমাণু Mn এর জারণ মান বের করতে হবে। ধরা যাক, Mn এর জারণ মান ধরো x,

K এর জারণ মান +1 এবং O এর জারণ মান -2 নিয়ে সকল মৌলের জারণ সংখ্যাকে তাদের পরমাণু সংখ্যা দ্বারা গুণ করে যোগ করো। উক্ত যোগফল হবে $KMnO_4$ এর জারণ সংখ্যার সমান। $KMnO_4$ একটি আধান নিরপেক্ষ অণু, সুতরাং এর আধান শূন্য, কাজেই

$$(+1)\times1 + x\times1 + (-2)\times4 = 0$$

বা $x = 7$

অর্থাৎ Mn এর জারণ সংখ্যা +7

4. সাধারণত ধাতব হাইড্রাইড (যেমনঃ LiH, $LiAlH_4$) ব্যতীত সকল ক্ষেত্রে H এর জারণ সংখ্যা +1। হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড (H_2O_2), সোডিয়াম পার-অক্সাইড (Na_2O_2) এ অক্সিজেনের জারণ সংখ্যা -1, সুপার-অক্সাইড যেমন: সোডিয়াম সুপার-অক্সাইড (NaO_2), পটাশিয়াম সুপার-অক্সাইড (KO_2) এ অক্সিজেনের জারণ সংখ্যা $-\frac{1}{2}$ হয়। এছাড়া সকল ক্ষেত্রে অক্সিজেনের জারণ সংখ্যা -2।

H_2SO_4 এ S এর জারণ সংখ্যা নির্ণয়:

ধরি, H_2SO_4 এ S এর জারণ সংখ্যা = x

অতএব, $(+1)\times2 + x + (-2)\times4 = 0$

$x = 6$

অতএব, H_2SO_4 এ S এর জারণ সংখ্যা = +6।

একক কাজ

নিম্নলিখিত যৌগে লাল বর্ণে লেখা মৌলের জারণ সংখ্যা নির্ণয় করো: $CuSO_4$, HNO_3, H_3PO_4, MnO_2, $K_2Cr_2O_7$, $Na_2S_2O_3$ এবং CuI

দেওয়া আছে, Cu এর জারণ মান = +2, O এর জারণ মান = -2, H এর জারণ মান = +1, K এর জারণ মান = +1, Na এর জারণ মান = +1, I এর জারণ মান = -1

জারণ সংখ্যা এবং যোজনী একই বিষয় নয়, জারণ সংখ্যা হলো পরমাণু বা আয়নে উপস্থিত চার্জ সংখ্যা (চিহ্নসহ)। এটি ধনাত্মক বা ঋণাত্মক, পূর্ণসংখ্যা, শূন্য এমনকি ভগ্নাংশও হতে পারে। শুধু তাই নয়, একই মৌলের জারণ সংখ্যা বিভিন্ন যৌগে বিভিন্ন হতে দেখা যায়। অন্যদিকে যোজনী হলো একটি মৌল অন্য মৌলের সাথে যুক্ত হওয়ার সামর্থ্য। যোজনী ধনাত্মক বা ঋণাত্মক হয় না, এটি সর্বদাই পূর্ণসংখ্যা হয়। শুধু নিষ্ক্রিয় গ্যাসের যোজনী শূন্য হয়।

জারণ-বিজারণ একটি যুগপৎ ক্রিয়া

তোমরা জানো, যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ইলেকট্রনের দান ঘটে তাকে জারণ বিক্রিয়া এবং যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ইলেকট্রনের গ্রহণ ঘটে তাকে বিজারণ বিক্রিয়া বলা হয়। আবার, যে পদার্থ ইলেকট্রন ত্যাগ করে তাদেরকে বিজারক এবং যে পদার্থ ইলেকট্রন গ্রহণ করে তাদেরকে জারক পদার্থ বলে। জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া একই সাথে সংঘটিত হয়।

আমরা নিচের বিক্রিয়াটি বিবেচনা করতে পারি:

$$Na + \frac{1}{2} Cl_2 \longrightarrow NaCl$$

এখানে বিজারক পদার্থ Na তার বাইরের শেলের 1টি ইলেকট্রন ত্যাগ করে জারণ অর্ধবিক্রিয়া সম্পন্ন করেছে। অপরদিকে বিজারক Na যে ইলেকট্রন ত্যাগ করেছে, জারক পদার্থ Cl সেই ইলেকট্রনকে গ্রহণ করে বিজারণ অর্ধবিক্রিয়া সম্পন্ন করেছে।

জারণ অর্ধবিক্রিয়া $Na^0 \rightarrow Na^+ + e^-$
বিজারণ অর্ধবিক্রিয়া $Cl^0 + e^- \rightarrow Cl^-$

এই দুই অর্ধ-বিক্রিয়াকে যোগ করলে জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া পাওয়া যায়:

জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া: $Na^0 + Cl^0 \rightarrow Na^+ + Cl^- \equiv NaCl$

এখানে স্পষ্টত জারণে বিজারক পদার্থ ইলেকট্রন ত্যাগ করেছে, অপরদিকে বিজারণে জারক পদার্থ ঐ ইলেকট্রন গ্রহণ করেছে। যদি জারক পদার্থ Cl ইলেকট্রন গ্রহণ না করতো তাহলে বিজারক পদার্থ Na ইলেকট্রন দান করতে পারত না। কাজেই বলা যায় জারণ যখনই ঘটবে সাথে সাথে সেখানে বিজারণও ঘটবে। অর্থাৎ জারণ-বিজারণ একটি যুগপৎ প্রক্রিয়া (Simultaneous Process)।

যেহেতু বিজারক ইলেকট্রন দান করে এবং জারক উক্ত ইলেকট্রন গ্রহণ করে কাজেই বলা যায় জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া মানেই ইলেকট্রন স্থানান্তর প্রক্রিয়া।

বেশ কিছু বিক্রিয়া আছে যেখানে জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া ঘটে। সেগুলো হচ্ছে:

1. সংযোজন বিক্রিয়া
2. বিয়োজন বিক্রিয়া
3. প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া
4. দহন বিক্রিয়া

1. সংযোজন বিক্রিয়া (Addition Reaction): যে জারণ-বিজারণ বিক্রিয়ায় দুই বা ততোধিক রাসায়নিক পদার্থ পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে একটিমাত্র উৎপাদ উৎপন্ন করে তাকে সংযোজন বিক্রিয়া বলে। যেমন: ফেরাস ক্লোরাইডের সাথে ক্লোরিন যুক্ত হয়ে ফেরিক ক্লোরাইড উৎপন্ন করে।

$$2FeCl_2(aq) \quad + \quad Cl_2(g) \longrightarrow FeCl_3(aq)$$

আবার, হাইড্রোজেন গ্যাস নাইট্রোজেন গ্যাসের সাথে যুক্ত হয়ে অ্যামোনিয়া গ্যাস উৎপন্ন করে। এটিও সংযোজন বিক্রিয়ার উদাহরণ।

$$N_2 \quad + \quad 3H_2 \longrightarrow 2NH_3$$

তবে যেসব সংযোজন বিক্রিয়ায় শুধু মৌলিক পদার্থ যুক্ত হয়ে যৌগ গঠন করে, তাদেরকে সংশ্লেষণ বিক্রিয়াও বলে। সুতরাং অ্যামোনিয়া গ্যাস উৎপন্ন করার বিক্রিয়াটি একাধারে সংযোজন বা সংশ্লেষণ বিক্রিয়া হিসেবে বিবেচিত।

2. বিয়োজন বিক্রিয়া (Decomposition Reaction): যে বিক্রিয়ায় একটি যৌগ ভেঙে একাধিক যৌগ বা মৌল উৎপন্ন হয় তাকে বিয়োজন বিক্রিয়া বলা হয়। যেমন: ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইডকে তাপ দিলে তা বিয়োজিত হয়ে ফসফরাস ট্রাইক্লোরাইড ও ক্লোরিন উৎপন্ন করে। এটি বিয়োজন বিক্রিয়া।

$$\underset{\text{ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইড}}{PCl_5} \xrightarrow{\text{তাপ}} \underset{\text{ফসফরাস ট্রাইক্লোরাইড}}{PCl_3} + \underset{\text{ক্লোরিন}}{Cl_2}$$

আবার, পানিকে তড়িৎবিশ্লেষণ করলে একটি অণু ভেঙে দুটি অণুতে পরিণত হয়। অ্যানোডে অক্সিজেন গ্যাস ও ক্যাথোডে হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয়। এটিও বিয়োজন বিক্রিয়ার উদাহরণ:

$$\underset{\text{পানি}}{2H_2O(l)} \xrightarrow{\text{তড়িৎবিশ্লেষণ}} \underset{\text{হাইড্রোজেন}}{2H_2(g)} + \underset{\text{অক্সিজেন}}{O_2(g)}$$

3. প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া (Substitution or Displacement Reaction): কোনো অধিক সক্রিয় মৌল বা যৌগমূলক অপর কোনো কম সক্রিয় মৌল বা যৌগমূলককে প্রতিস্থাপন করে নতুন যৌগ উৎপন্ন করার প্রক্রিয়াকে প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া বলে। যেমন: জিংক ধাতু সালফিউরিক এসিডের হাইড্রোজেনকে প্রতিস্থাপিত করে জিংক সালফেট ও হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করে। এটি প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার উদাহরণ:

$$Zn(s) \quad + \quad H_2SO_4(l) \longrightarrow \underset{\text{জিংক সালফেট}}{ZnSO_4(aq)} + H_2(g)$$

4. দহন বিক্রিয়া (Combustion Reaction): কোনো মৌল বা যৌগকে বাতাসের অক্সিজেনের উপস্থিতিতে পুড়িয়ে তার উপাদান মৌলের অক্সাইডে পরিণত করার প্রক্রিয়াকে দহন বিক্রিয়া বলে। দহন বিক্রিয়ায় সব সময় তাপ উৎপন্ন হয়। এই প্রক্রিয়ায় ইলেকট্রন এর আদান-প্রদান ঘটে। যেমন- প্রাকৃতিক গ্যাস বা মিথেন বাতাসের অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়ায় করে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও পানি উৎপন্ন করে। এটি দহন বিক্রিয়ার উদাহরণ:

চিত্র ৭.০১: জ্বালানির দহন

$$CH_4(g) + 2O_2(g) \longrightarrow CO_2(g) + 2H_2O(g) + \text{তাপ}$$

একইভাবে S, C, Mg ও H_2 কে দহন করলে তাদের অক্সাইড উৎপন্ন হয় এবং তাপ উৎপন্ন হয়।

$$S(s) + O_2(g) \longrightarrow SO_2(g) + \text{তাপ}$$
$$C(s) + O_2(g) \longrightarrow CO_2(g) + \text{তাপ}$$
$$2Mg(s) + O_2(g) \longrightarrow 2MgO(g) + \text{তাপ}$$
$$2H_2(g) + O_2(g) \longrightarrow 2H_2O(g) + \text{তাপ}$$

দহন বিক্রিয়ার প্রতিক্ষেত্রেই অক্সিজেন ইলেকট্রন গ্রহণ করে অপর যৌগ বা মৌল ইলেকট্রন ত্যাগ করে। সুতরাং দহন বিক্রিয়া জারণ-বিজারণ বিক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত।

নন-রেডক্স (Non Redox) বিক্রিয়া

এমন অনেক রাসায়নিক বিক্রিয়া দেখা যায় যেখানে ইলেকট্রনের আদান-প্রদান ঘটে না। এ ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়াকে নন-রেডক্স বিক্রিয়া বলে। এ ধরনের বিক্রিয়ায় যেহেতু ইলেকট্রনের আদান-প্রদান ঘটে না সুতরাং বিক্রিয়ায় কোনো পরমাণুর জারণ সংখ্যার হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটে না। নিম্নে বিভিন্ন প্রকার নন-রেডক্স বিক্রিয়া দেখানো হলো যেমন: (1) **প্রশমন বিক্রিয়া** (2) **অধঃক্ষেপণ বিক্রিয়া ইত্যাদি।**

1. প্রশমন বিক্রিয়া (Neutralization Reaction): একটি এসিড ও একটি ক্ষার পরস্পরের সাথে বিক্রিয়া করে প্রশমিত হয়ে লবণ ও পানি উৎপন্ন করে। এই বিক্রিয়াকে প্রশমন বিক্রিয়া বলা হয়। এ ধরনের বিক্রিয়াকে এসিড-ক্ষার বিক্রিয়াও বলা হয়। যেমন- HCl ও NaOH পরস্পরের সাথে বিক্রিয়া করে NaCl লবণ ও পানি উৎপন্ন করে। এটি একটি প্রশমন বিক্রিয়া। একে এভাবে দেখানো যায়:

$$HCl(aq) + NaOH(aq) \longrightarrow NaCl(aq) + H_2O(l)$$

প্রশমন বিক্রিয়ায় সর্বদাই তাপ উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ প্রশমন বিক্রিয়া তাপোৎপাদী বিক্রিয়া এবং এসিড ও ক্ষার উভয়ই তীব্র হলে এই তাপের মান হয় $\Delta H = -57.34$ kJ। প্রশমন বিক্রিয়ায় এসিড হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) সরবরাহ করে এবং ক্ষার হাইড্রোক্সাইড আয়ন (OH^-) সরবরাহ করে। এরপর উক্ত আয়ন দুটি পরস্পরের সাথে বিক্রিয়া করে পানি উৎপন্ন করে। NaCl জলীয় দ্রবণে Na^+ এবং Cl^- আয়ন হিসেবে থাকে।

$$H^+ + Cl^- + Na^+ + OH^- \longrightarrow Na^+ + Cl^- + H_2O$$

এই দ্রবণে উপস্থিত Na^+ ও Cl^- আয়নদ্বয় বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে না। এদেরকে দর্শক আয়ন বলে। প্রশমন বিক্রিয়ার প্রকৃত সমীকরণ হলো:

$$H^+ + OH^- \longrightarrow H_2O + 57.34 \text{ kJ}$$

সুতরাং প্রশমন বিক্রিয়া বলতে আমরা H^+ আয়ন ও OH^- আয়নের সহযোগে পানি উৎপন্ন করার বিক্রিয়াকে বুঝে থাকি।

আবার, এসিড হিসেবে আমরা যেকোনো তীব্র এসিড নিই না কেন প্রতি ক্ষেত্রে সে হাইড্রোজেন আয়ন H^+ সরবরাহ করবে এবং ক্ষার হিসেবে যেকোনো তীব্র ক্ষার নিলে সেটি হাইড্রোক্সাইড OH^- সরবরাহ করবে। অতঃপর এরা পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে পানি উৎপন্ন করবে। **1 মোল পানি উৎপন্ন করতে যে পরিমাণ তাপ উৎপন্ন হয় তাকে প্রশমন তাপ বলে।** হিসাব করে দেখা গেছে 1 মোল পানি উৎপন্ন করার জন্য 57.34 kJ তাপ উৎপন্ন হয়।

পরীক্ষণ

পরীক্ষণের মাধ্যমে প্রশমন বিক্রিয়া প্রদর্শন।

এসিড ও ক্ষার বিক্রিয়া করে লবণ ও পানি উৎপন্ন করে, এই বিক্রিয়াকে প্রশমন বিক্রিয়া বলা হয়। একটি কাচপাত্র বা বিকারে 10 mL NaOH দ্রবণ নাও। অপর একটি বিকারের মধ্যে HCl দ্রবণ নাও। বিকারের দ্রবণের মধ্যে একটি নীল লিটমাস পেপার নিমজ্জিত করো। এবার ড্রপার ব্যবহার করে বাম হাত দিয়ে HCl দ্রবণকে ধীরে ধীরে NaOH দ্রবণের মধ্যে ঢালতে থাকো। একই সাথে ডান হাত দিয়ে একটি কাচদণ্ড দিয়ে নেড়ে নেড়ে HCl দ্রবণকে NaOH দ্রবণের মধ্যে মিশ্রিত করো। যে মুহূর্তে লিটমাস পেপারের রং লাল হয়ে যাবে, সেই মুহূর্তে মনে করতে হবে বিকারের NaOH দ্রবণ HCl দ্রবণ দ্বারা প্রশমিত হয়ে গেল।

$$HCl(aq) + NaOH(aq) \longrightarrow NaCl(aq) + H_2O(l)$$

2. অধঃক্ষেপণ বিক্রিয়া (Precipitation Reaction): একই দ্রাবকে দুটি যৌগ মিশ্রিত করলে তারা পরস্পরের সাথে বিক্রিয়া করে যে উৎপাদগুলো উৎপন্ন করে তাদের মধ্যে কোনোটি যদি ঐ দ্রাবকে অদ্রবণীয় বা খুবই কম পরিমাণে দ্রবণীয় হয় তবে তা বিক্রিয়া পাত্রের তলায় কঠিন অবস্থায় তলানি হিসেবে জমা হয়। এ তলানিকে অধঃক্ষেপ (precipitate) বলে। **যে বিক্রিয়ায় দ্রবণীয় বিক্রিয়ক পদার্থ বিক্রিয়া করে অদ্রবণীয় কঠিন উৎপাদে পরিণত হয় তাকে অধঃক্ষেপণ বিক্রিয়া বলে।**

যেমন: সোডিয়াম ক্লোরাইডের (NaCl) জলীয় দ্রবণের মধ্যে সিলভার নাইট্রেট ($AgNO_3$) জলীয় দ্রবণ যোগ করলে তাদের মধ্যে বিক্রিয়া ঘটে, ফলে সিলভার ক্লোরাইড (AgCl) এবং সোডিয়াম নাইট্রেট ($NaNO_3$) উৎপন্ন হয়। পানিতে $NaNO_3$ এর দ্রবণীয়তা বেশি। তাই $NaNO_3$ পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। কিন্তু পানিতে AgCl এর দ্রবণীয়তা অত্যন্ত কম বলে তা বিক্রিয়ার পর পাত্রের তলায় অধঃক্ষেপ হিসেবে জমা হয়।

$$NaCl(aq) + AgNO_3(aq) \longrightarrow AgCl(s)\downarrow + NaNO_3(aq)$$

সোডিয়াম সালফেট (Na_2SO_4) দ্রবণে বেরিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণ যোগ করলে বেরিয়াম সালফেট ($BaSO_4$) ও সোডিয়াম ক্লোরাইড উৎপন্ন করে। বেরিয়াম সালফেট অধঃক্ষিপ্ত হয়।

$$Na_2SO_4(aq) + BaCl_2(aq) \longrightarrow BaSO_4(s)\downarrow + 2NaCl(aq)$$

তবে কিছু অধঃক্ষেপণ বিক্রিয়া রয়েছে যেখানে ইলেকট্রনের স্থানান্তর ঘটে। এ সম্পর্কে পরবর্তী শ্রেণিতে জানতে পারবে।

পরীক্ষণ

পরীক্ষণের মাধ্যমে অধঃক্ষেপণ বিক্রিয়া প্রদর্শন।

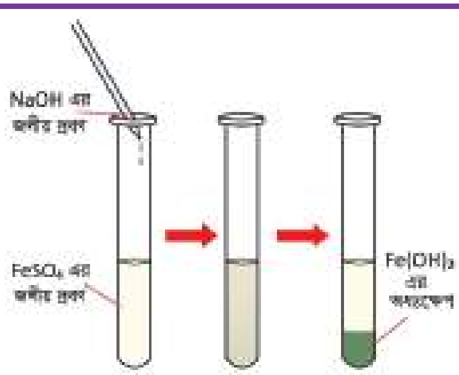

চিত্র ৭.০২: অধঃক্ষেপণ বিক্রিয়া

একটি পরীক্ষা নলে 2-3 মিলি ফেরাস সালফেট দ্রবণে ফোঁটায় ফোঁটায় NaOH দ্রবণ যোগ করো। দেখবে দ্রবণে ধীরে ধীরে সবুজ বর্ণের অধঃক্ষেপ তৈরি হচ্ছে এবং তা নিচে জমা পড়ছে। তরল $FeSO_4$ দ্রবণ তরল NaOH দ্রবণের সাথে বিক্রিয়া করে কঠিন $Fe(OH)_2$ এর অধঃক্ষেপ তৈরি করছে।

$$FeSO_4 + NaOH \longrightarrow Fe(OH)_2\downarrow + Na_2SO_4$$

যে যৌগের অধঃক্ষেপ উৎপন্ন হয় বিক্রিয়ায় সেই যৌগের ডানপাশে নিচের দিকে তির চিহ্ন (↓) দ্বারা বোঝানো হয়।

৭.৩ বিশেষ ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়া (Special Types of Chemical Reactions)

কিছু কিছু রাসায়নিক বিক্রিয়া দেখতে পাওয়া যায় যেগুলো Redox এবং Non-Redox শ্রেণিবিভাগের মধ্যে পড়ে না। নিচে কিছু বিশেষ ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়া আলোচনা করা হলো।

আর্দ্র বিশ্লেষণ বিক্রিয়া বা পানি বিশ্লেষণ (Hydrolysis) বিক্রিয়া

কোনো রাসায়নিক ব্রিক্রিয়ায় ব্রিক্রিয়ক হিসেবে পানি অন্য কোনো যৌগের সাথে বিক্রিয়া করে উৎপাদ উৎপন্ন করলে তাকে আর্দ্র বিশ্লেষণ বিক্রিয়া বলে। যেমন:

$$SiCl_4 + H_2O \longrightarrow Si(OH)_4 + 4HCl$$

এখানে $SiCl_4$ এবং H_2O বিক্রিয়া করছে। অতএব, এটি আর্দ্র বিশ্লেষণ বিক্রিয়া। আর্দ্র বিশ্লেষণ বিক্রিয়ায় অনেক সময় অস্বচ্ছ দ্রবণীয় যৌগ উৎপন্ন করে। সেক্ষেত্রে বিক্রিয়াটি অধঃক্ষেপণ হিসেবেও বিবেচিত হতে পারে। নিম্নের বিক্রিয়াকে আর্দ্র বিশ্লেষণ বিক্রিয়াও বলা যায় আবার অধঃক্ষেপণ বিক্রিয়াও বলা যায়। যেমন:

$$AlCl_3(s) + 3H_2O(l) \longrightarrow Al(OH)_3(s) + 3HCl(aq)$$

এখানে, $Al(OH)_3$ পানিতে অদ্রবণীয়।

পানিযোজন (Hydration) বিক্রিয়া

অনেক সময় দেখা যায়, আয়নিক যৌগগুলো কেলাস বা স্ফটিক গঠনের জন্য এক বা একাধিক পানির অণুর সাথে যুক্ত হয়। এ ধরনের বিক্রিয়াকে পানিযোজন বিক্রিয়া বলে। যৌগগুলোর সাথে যে কয়টি পানির অণু যুক্ত হয় তাদেরকে কেলাস পানি বলে। যেমন: কপার সালফেট ($CuSO_4$) এর সাথে 5 অণু পানি ($5H_2O$) যুক্ত হয়ে পেন্টা হাইড্রেট কপার সালফেট ($CuSO_4.5H_2O$) উৎপন্ন হয়।

$$CuSO_4 + 5H_2O \longrightarrow CuSO_4.5H_2O$$

(পেন্টা হাইড্রেট কপার সালফেট)

এরকম আরও অনেক উদাহরণ রয়েছে:

২০২৬

$ZnSO_4 + 7H_2O \longrightarrow ZnSO_4.7H_2O$ (হেপ্টা হাইড্রেট জিংক সালফেট)

$FeSO_4 + 7H_2O \longrightarrow FeSO_4.7H_2O$ (হেপ্টা হাইড্রেট ফেরাস সালফেট)

$CaCl_2 + 6H_2O \longrightarrow CaCl_2.6H_2O$ (হেক্সা হাইড্রেট ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড)

$MgCl_2 + 7H_2O \longrightarrow MgCl_2.7H_2O$ (হেপ্টা হাইড্রেট ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড)

পানিযোজন বিক্রিয়া মূলত সংযোজন বিক্রিয়ার মতো। তবে সংযোজন বিক্রিয়ায় ইলেকট্রনের আদান-প্রদান ঘটে কিন্তু পানিযোজনে ইলেকট্রনের আদানপ্রদান ঘটে না।

সমানুকরণ (Isomerisation) বিক্রিয়া

যদি দুটি যৌগের আণবিক সংকেত একই থাকে কিন্তু গাঠনিক সংকেত ভিন্ন হয় তবে তাদেরকে পরস্পরের সমানু বলা হয়। একটি সমানু থেকে অপর একটি সমানু তৈরির প্রক্রিয়াকে সমানুকরণ বিক্রিয়া বলে। যেমন, H_4N_2CO আণবিক সংকেত দ্বারা ভিন্ন গাঠনিক সংকেত বিশিষ্ট দুটি যৌগকে প্রকাশ করা হয়। যৌগ দুটি হলো: NH_4CNO (অ্যামোনিয়াম সায়ানেট) ও ইউরিয়া ($H_2N\text{-}CO\text{-}NH_2$)। এরা পরস্পরের সমানু। অ্যামোনিয়াম সায়ানেটকে তাপ দিলে তা ইউরিয়াতে পরিণত হয়।

$$NH_4CNO \xrightarrow{\text{তাপ}} H_2N\text{-}CO\text{-}NH_2$$

পলিমারকরণ (Polymerization) বিক্রিয়া

প্রভাবক, উচ্চ চাপ ও তাপের প্রভাবে যখন এক বা একাধিক যৌগের অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে একটি বৃহদাকার অণু তৈরি করে তখন তাকে পলিমারকরণ বিক্রিয়া বলে। এক্ষেত্রে বৃহদাকার অণুটিকে পলিমার অণু এবং ক্ষুদ্র অণুটিকে মনোমার অণু বলা হয়। যে বিক্রিয়ায় অসংখ্য মনোমার থেকে পলিমার উৎপন্ন হয় তাকে পলিমারকরণ বিক্রিয়া বলে। 1000 atm চাপে 200 ^{0}C তাপমাত্রায় ও O_2 প্রভাবকের উপস্থিতিতে ইথিলিনের অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু যুক্ত হয়ে বৃহৎ পলিমার অণু পলিথিন উৎপন্ন করে। এ বিক্রিয়া হচ্ছে ইথিলিনের পলিমারকরণ বিক্রিয়া। এখানে ইথিলিন মনোমার এবং পলিথিন পলিমার অণু হিসেবে বিবেচিত। এখানে n দ্বারা ইথিলিনের অসংখ্য অণুর সংখ্যা বোঝায়।

$$\underset{\text{ইথিলিন}}{n(CH_2{=}CH_2)} \xrightarrow[200°C,\ 1000\ atm]{O_2} \underset{\text{পলিথিন}}{(\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-})_n}$$

৭.৪ বাস্তব ক্ষেত্রে সংঘটিত কয়েকটি রাসায়নিক বিক্রিয়ার উদাহরণ (Examples of a Few Real Life Chemical Reactions)

৭.৪.১ বাস্তব ক্ষেত্রে সংঘটিত রাসায়নিক বিক্রিয়া

আমরা প্রতিদিন অনেক ঘটনা পর্যবেক্ষণ করি যেগুলো বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ার কারণে ঘটে থাকে। যেমন:

1. লোহায় মরিচা পড়া

আমরা লোহার (আয়রন বা Fe) তৈরি বিভিন্ন যন্ত্রপাতি যেমন: ছুরি, কাঁচি, বঁটি, দা ইত্যাদি ব্যবহার করি। এসব যন্ত্রপাতি বাতাসে মুক্ত অবস্থায় রেখে দিলে এদের পৃষ্ঠে মরিচা পড়ে। এখানে আয়রন বাতাসের অক্সিজেন ও জলীয় বাষ্পের সাথে বিক্রিয়া করে আর্দ্র ফেরিক অক্সাইড বা মরিচা তৈরি করে। এতে ধাতুর পৃষ্ঠতল ক্ষয় হয়। মরিচা ঝাঁঝরা জাতীয় পদার্থ হওয়ায় এর ভিতর দিয়ে বাতাসের অক্সিজেন এবং জলীয় বাষ্প ঢুকে লোহার পৃষ্ঠকে ক্রমাগত ক্ষয় করতে থাকে। এভাবে লোহার তৈরি পুরো জিনিসটিই এক সময় নষ্ট হয়ে যায়।

$$2Fe + 1.5O_2 + 3H_2O \longrightarrow 2Fe(OH)_3$$

$$2Fe(OH)_3 \longrightarrow \underset{\text{মরিচা}}{Fe_2O_3.nH_2O}$$

মরিচায় পানির অণুর সংখ্যা নির্দিষ্ট নয়। সুতরাং মরিচার রাসায়নিক সংকেত $Fe_2O_3.nH_2O$। n এর মান 1, 2, 3 ইত্যাদি যেকোনো পূর্ণ সংখ্যা হতে পারে।

2. তামা (Cu) ও অ্যালুমিনিয়াম (Al) এর ক্ষয়রোধ

লোহার তৈরি দ্রব্যাদি ছাড়াও আমরা দৈনন্দিন প্রয়োজনে কপার-আলুমিনিয়াম এর দ্রব্যাদি ব্যবহার করে থাকি। Cu ও Al এর দ্রব্যাদি বাতাসের অক্সিজেনের সংস্পর্শে এলে প্রথমে তাদের উপর CuO ও Al_2O_3 এর একটি আস্তরণ পড়ে। পরবর্তীতে বাতাসের অক্সিজেন উক্ত আস্তরণ ভেদ করে আর Cu বা Al সংস্পর্শে আসতে পারে না। ফলে আর বিক্রিয়া সাধিত হয় না। সুতরাং Cu বা Al এর ক্ষয় সাধিত হয় না। এরূপে CuO ও Al_2O_3 যথাক্রমে Cu ও Al কে রক্ষা করে।

3. পিঁপড়া বা মৌমাছির কামড়ের জ্বালা নিরাময়

পিঁপড়া বা মৌমাছি কামড়ালে ক্ষতস্থানে জ্বালা যন্ত্রণা করে। এ যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য আমরা ক্ষতস্থানে চুন লাগাই। এর কারণ কী? পিঁপড়ার মুখ বা মৌমাছির হুলে এক ধরনের এসিড থাকে যেটি জ্বালা-যন্ত্রণার সৃষ্টি করে। ক্ষতস্থানে চুন (ক্ষারক) যোগ করার ফলে এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে সেটি প্রশমিত হয়। ফলে জ্বালা-যন্ত্রণা বন্ধ হয়ে যায়।

4. শ্বসন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শক্তি উৎপাদন

আমাদের শরীরের প্রতিটি কোষে শ্বসন প্রক্রিয়া সাধিত হয়। শ্বসনে মূলত গ্লুকোজ ($C_6H_{12}O_6$) অণু অক্সিজেন দ্বারা জারিত হয়ে (O_2 এর সাথে বিক্রিয়া করে)

কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2), পানি (H_2O) ও শক্তি উৎপন্ন করে।

$$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \longrightarrow 6CO_2 + 6H_2O + \text{শক্তি}$$

মানুষের শরীরের বিপাক ক্রিয়ায় অনেকের পাকস্থলীতে অতিরিক্ত HCl তৈরি হয়। অতিরিক্ত HCl কে প্রশমিত করার জন্য রোগীকে ডাক্তার এন্টাসিড জাতীয় ওষুধ খেতে বলেন। এন্টাসিড হলো $Mg(OH)_2$ ও $Al(OH)_3$ এর মিশ্রণ। এই ক্ষারক দুটি অতিরিক্ত HCl কে প্রশমিত করে এবং রোগী এসিডিটি থেকে মুক্তি পায়। এন্টাসিডের বিক্রিয়া এরকম:

$$2HCl + Mg(OH)_2 \longrightarrow MgCl_2 + 2H_2O$$

$$3HCl + Al(OH)_3 \longrightarrow AlCl_3 + 3H_2O$$

5. জ্বালানি হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাস

প্রাকৃতিক গ্যাস জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। প্রাকৃতিক গ্যাসে বেশির ভাগই মিথেন থাকে। মিথেন গ্যাসকে অক্সিজেনে পোড়ালে CO_2 এবং জলীয় বাষ্প ও তাপশক্তি উৎপন্ন হয়। CNG, ডিজেল, পেট্রল, কেরোসিন, অকটেন ইত্যাদি জ্বালানিকে পোড়ালেও একইভাবে CO_2 এবং জলীয়বাষ্প ও তাপশক্তি উৎপন্ন হয়।

$$CH_4 + 2O_2 \longrightarrow CO_2 + 2H_2O + \text{শক্তি}$$

৭.৪.২ বাস্তব ক্ষেত্রে সংঘটিত কতিপয় ক্ষতিকর বিক্রিয়া রোধ করার উপায়

আমাদের চারপাশের অনেক কিছুই প্রতিনিয়ত রাসায়নিক বিক্রিয়া করে ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে কিংবা নষ্ট হচ্ছে। আমরা আমাদের রসায়নের জ্ঞান ব্যবহার করে অনেক ক্ষেত্রেই অনেক কিছু রক্ষা করতে পারি। যেমন:

(i) মরিচার ক্ষয় থেকে আয়রনকে রক্ষার জন্য লোহার তৈরি দ্রব্যাদির উপর রং দিলে সেটি আর বাতাসের সংস্পর্শে আসতে পারে না, ফলে মরিচা পড়তে পারে না।

তড়িৎ বিশ্লেষণের মাধ্যমে লোহার তৈরি দ্রব্যের উপর লোহা অপেক্ষা কম সক্রিয় অপর একটি ধাতুর প্রলেপ দিয়ে ইলেকট্রোপ্লেটিং করে লোহার তৈরি দ্রব্যাদিকে মরিচার হাত হতে রক্ষা করা যায়। কোনো ধাতুর উপর জিংকের প্রলেপ দেওয়াকে গ্যালভানাইজিং এবং টিনের প্রলেপ দেওয়াকে টিন প্লেটিং বলে।

তড়িৎ বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি ধাতুর উপর অন্য একটি ধাতুর প্রলেপ দেওয়ার প্রক্রিয়াগুলোকে ইলেকট্রোপ্লেটিং বলে। এভাবে ধাতব পৃষ্ঠকে রক্ষা করা যায়।

(ii) বর্ষাকালে ছাদ বা বাড়ির আঙিনা পিচ্ছিল হয়। তখন আমরা বালি ফেলে দিয়ে পিচ্ছিলতা কমানোর চেষ্টা করি। ছাদ বা আঙিনাকে পিচ্ছিল করে ক্ষার জাতীয় পদার্থ। সুতরাং এ ক্ষারকে প্রশমিত করার জন্য এসিড জাতীয় পদার্থ যোগ করতে হবে। বালু (SiO_2) অম্লধর্মী। তাই বালু যোগ করার ফলে অম্ল-ক্ষার প্রশমন বিক্রিয়ার মাধ্যমে পিচ্ছিলতা দূর হয়।

(iii) সেলাই করার সুচকে নারিকেল তেলের ভিতর ডুবিয়ে রাখা হয়। কারণ সুচ যাতে বাতাসের অক্সিজেন ও জলীয় বাষ্পের সাথে রাসায়নিক বিক্রিয়া করে ক্ষয় না হয়। এভাবে লোহার তৈরি সুচে মরিচা পড়া রোধ করা যায়।

৭.৫ বিক্রিয়ার গতিবেগ বা বিক্রিয়ার হার (Rate of Reaction)

আমরা জানি, সকল রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বিক্রিয়ক পদার্থ উৎপাদে পরিণত হয়। কোনো কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বিক্রিয়ক উৎপাদে পরিণত হতে 1 সেকেন্ডের কম সময় লাগে। আবার, কোনো কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বিক্রিয়ক উৎপাদে পরিণত হতে অনেক বেশি সময় লাগে।

একক সময়ে যে পরিমাণ বিক্রিয়ক উৎপাদে পরিণত হয় তাকে বিক্রিয়ার হার বলে।

চিত্র ৭.০৩: বিভিন্ন গতিসম্পন্ন বিক্রিয়া: লোহার মরিচা, মোমবাতির প্রজ্বালন, বোমা বিস্ফোরণ

যেমন: NaCl দ্রবণে $AgNO_3$ যোগ করার পর 1 সেকেন্ডের কম সময়ে AgCl এর সাদা অধঃক্ষেপ উৎপন্ন করে। আবার, লোহার তৈরি একটি ব্রিজে মরিচা পড়তে অনেক দিন সময় লাগে।

বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্পন্ন হতে বিভিন্ন সময় নেয়। যে বিক্রিয়া অল্প সময়ে সংঘটিত হয় সে বিক্রিয়ার গতিবেগ বা হার বেশি, আবার যে বিক্রিয়ায় অনেক বেশি সময়ে সংঘটিত হয় সে বিক্রিয়ার গতিবেগ বা হার কম।

অনুসন্ধান

বিক্রিয়ার হার পরীক্ষা

চারটি টেস্টটিউব বা চারটি স্বচ্ছ কাচের গ্লাস নাও এবং তাদেরকে 1, 2, 3 ও 4 নম্বর দিয়ে চিহ্নিত করো। প্রতিটি টেস্টটিউবে আনুমানিক 0.5 মি.গ্রা. সোডিয়াম কার্বনেট (Na_2CO_3) অথবা কাপড় কাচা সোডা নাও। এখন 1 ও 2 নম্বর টেস্টটিউবে স্বাভাবিক পানি এবং 3 ও 4 নম্বর টেস্টটিউবে গরম পানি ঢেলে নাও। 2 ও 4 নম্বর টেস্টটিউবে 1 মিলি লেবুর রস (Citric acid) অথবা ভিনেগার (4-10% Acetic acid) যুক্ত করে নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলো লক্ষ করো।

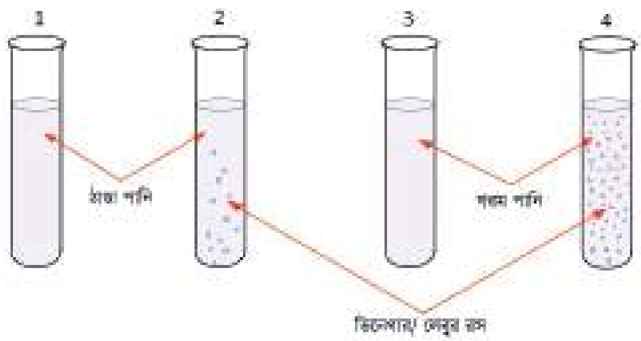

চিত্র ৭.০৪: সোডিয়াম কার্বনেট দ্রবণের সাথে ভিনেগার বা এসিটিক এসিডের বিক্রিয়া

1. কোন কোন টেস্টটিউবে গ্যাসের বুদ্‌বুদ্‌ উৎপন্ন হয়?
2. কোন কোন টেস্টটিউবে গ্যাসের বুদ্‌বুদ্‌ উৎপন্ন হয় না?
3. কোন টেস্টটিউবে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে গ্যাসের বুদ্‌বুদ্‌ উৎপন্ন হয়?
4. কোন টেস্টটিউবে সবচেয়ে কম পরিমাণে গ্যাসের বুদবুদ উৎপন্ন হয়?

চিন্তা করো: 2 ও 4 নম্বর টেস্টটিউবের একটিতে বেশি পরিমাণে গ্যাস নির্গত হয় কেন?

উপরের পরীক্ষা থেকে তুমি বুঝতে পারবে যে, একটি নির্দিষ্ট সময়ে সকল টেস্টটিউবে সমান পরিমাণ গ্যাস নির্গত হয় না। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট সময়ে সকল টেস্টটিউবে সমপরিমাণ উৎপাদ উৎপন্ন হয় না অথবা সমপরিমাণ বিক্রিয়ক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে না।

৭.৫.১ লা-শাতেলিয়ার নীতি (Le Chatelier's Principle)

আমরা জানি, উভমুখী বিক্রিয়ায় বিক্রিয়ক পদার্থগুলো পরস্পরের সাথে বিক্রিয়া করে উৎপাদে পরিণত হয়, এই বিক্রিয়াকে সম্মুখবর্তী বিক্রিয়া বলে। আবার, উৎপাদ পদার্থগুলো পরস্পরের সাথে বিক্রিয়া করে বিক্রিয়কে পরিণত হয়, এই বিক্রিয়াকে পশ্চাৎমুখী বিক্রিয়া বলে। বিক্রিয়ার শুরুতে সম্মুখবর্তী বিক্রিয়ার হার অনেক বেশি থাকে। যতই সময় যেতে থাকে সম্মুখবর্তী বিক্রিয়ার হার ততই কমতে থাকে।

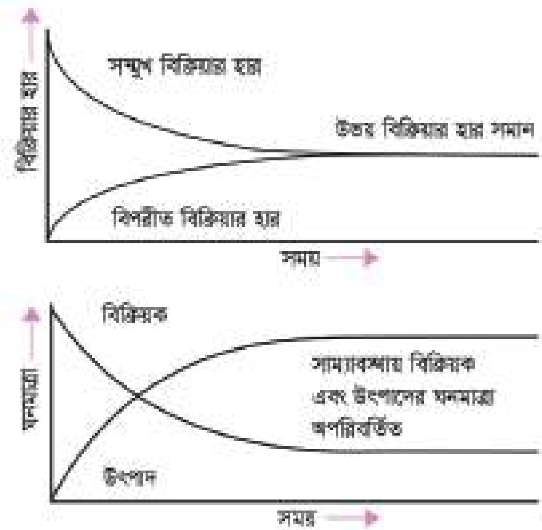

চিত্র ৭.০৫: বিক্রিয়ায় সাম্যাবস্থা

আবার, বিক্রিয়ার শুরুতে পশ্চাৎমুখী বিক্রিয়ার হার কম থাকে। যতই সময় পার হয় পশ্চাৎমুখী বিক্রিয়ার হার ততই বাড়তে থাকে। এক সময় সম্মুখবর্তী বিক্রিয়ায় হার এবং পশ্চাৎমুখী বিক্রিয়ায় হার সমান হয়ে যায়। এ অবস্থাকে উভমুখী বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থা বলা হয়। একই ভাবে সময়ের সাথে সাথে বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা কমতে থাকে এবং উৎপাদের ঘনমাত্রা বৃদ্ধি পায়। একসময় উভয়ের ঘনমাত্রা স্থিতিশীল হয় এবং সময়ের সাথে অপরিবর্তিত থাকে।

সাম্যাবস্থায় সম্মুখবর্তী বিক্রিয়া এবং পশ্চাৎমুখী বিক্রিয়া চলতে থাকে, যে পরিমাণ বিক্রিয়ক সম্মুখবর্তী বিক্রিয়ায় উৎপাদে পরিণত হয়েছে, পশ্চাৎমুখী বিক্রিয়ায় উৎপাদ থেকে ঠিক সেই পরিমাণ বিক্রিয়ক

উৎপন্ন হয়েছে (চিত্র ৭.০৫)। কাজেই সাম্যাবস্থায় বাহ্যিকভাবে মনে হয় বিক্রিয়াটি বুঝি থেমে গেছে, কিন্তু বাস্তবে সেটি থেমে নেই। তবে সাম্যাবস্থায় বিক্রিয়ার নিয়ামক তাপ, চাপ, ঘনমাত্রা এগুলো পরিবর্তন করলে সাম্যাবস্থাও পরিবর্তিত হয়ে যায়। উভমুখী বিক্রিয়ায় সাম্যাবস্থায় উৎপাদের পরিমাণ বৃদ্ধি বা হ্রাস লা-শাতেলিয়ার নীতি দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। লা-শাতেলিয়ার নীতিটি হচ্ছে:

যদি কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া সাম্যাবস্থায় থাকে এবং সেই অবস্থায় কোনো বাহ্যিক পরিবর্তন যেমন চাপ, তাপমাত্রা বা পদার্থের ঘনমাত্রার পরিবর্তন ঘটে, তখন বিক্রিয়াটির বিদ্যমান সাম্যাবস্থা পরিবর্তিত হয়ে নতুন সাম্যাবস্থা তৈরি হয় যা বাহ্যিক পরিবর্তনের প্রভাবকে প্রশমিত করে।

লা-শাতেলিয়ার নীতির ব্যাখ্যা

তাপ, চাপ কিংবা ঘনমাত্রার প্রভাবে সাম্যাবস্থার কী ধরনের পরিবর্তন হয় লা-শাতেলিয়ার নীতির মাধ্যমে সেটি খুব সহজে ব্যাখ্যা করা যায়।

সাম্যাবস্থার উপর তাপের প্রভাব

একটি উভমুখী বিক্রিয়া বিবেচনা করা যাক:

$$N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3 + 92\ kJ$$

এই বিক্রিয়ার সম্মুখমুখী অংশটি তাপ উৎপাদী, অর্থাৎ যখন N_2 এবং H_2 বিক্রিয়ক তখন উৎপাদ NH_3 উৎপন্ন হওয়ার সময় বিক্রিয়াটি তাপ উৎপাদন করে। এই বিক্রিয়ার বিপরীতমুখী অংশটি তাপহারী, অর্থাৎ NH_3 কে ভেঙে N_2 এবং H_2 উৎপন্ন করার সময় তাপ শোষিত হয়, কাজেই এর জন্য তাপ প্রয়োগ করতে হয়। আমরা এখন লা-শাতেলিয়ার নীতির ভিত্তিতে দেখতে চাই এই উভমুখী বিক্রিয়ায় তাপ প্রয়োগ করা হলে কী ঘটবে। লা-শাতেলিয়ার নীতি অনুযায়ী তাপ প্রয়োগ করা হলে তাপ বৃদ্ধিজনিত ফলাফল প্রশমিত হতে হবে। তাপ প্রয়োগ করা হলে যদি সম্মুখমুখী তাপ উৎপাদী বিক্রিয়াটি বৃদ্ধি পায় তা হলে আরও বেশি তাপ উৎপাদিত হবে এবং ফলাফল প্রশমিত না হয়ে আরও বৃদ্ধি পাবে। যদি বিপরীতমুখী তাপহারী বিক্রিয়াটি বৃদ্ধি পায় তাহলে সেটি তাপ শোষণ করে তাপ বৃদ্ধিজনিত ফলাফল প্রশমিত করবে। কাজেই লা-শাতেলিয়ার নীতি অনুযায়ী আমরা বলতে পারি তাপমাত্রা বৃদ্ধি করা হলে বিপরীতমুখী তাপহারী বিক্রিয়াটি বৃদ্ধি পাবে। অন্যভাবে বলা যায়, তাপোৎপাদী বিক্রিয়ায় তাপ প্রয়োগ করলে সাম্য ডানদিক থেকে বামদিকে সরে যায় অর্থাৎ NH_3 ভেঙে N_2 ও H_2 উৎপন্ন করে।

একই যুক্তিতে আমরা বলতে পারি, বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থায় তাপমাত্রা হ্রাস করা হলে সম্মুখমুখী তাপ উৎপাদী বিক্রিয়াটি বৃদ্ধি পাবে এবং তাপ হ্রাসজনিত ফলাফল প্রশমিত করবে। অর্থাৎ সাম্য বাম দিক থেকে ডানদিকে সরে যাবে। যে সকল বিক্রিয়ায় তাপের পরিবর্তন হয় না সে সকল বিক্রিয়ায় সাম্যাবস্থার উপর তাপমাত্রার কোনো প্রভাব নেই।

এবারে আরেকটি বিক্রিয়া বিবেচনা করা যাক। এই বিক্রিয়ার সম্মুখমুখী অংশটি তাপহারী এবং বিপরীতমুখী অংশটি তাপ উৎপাদী।

$$N_2 + O_2 + 180\ kJ \rightleftharpoons 2NO$$

এই বিক্রিয়ায় তাপ প্রয়োগ করা হলে সম্মুখমুখী তাপহারী বিক্রিয়া বৃদ্ধি পাবে, কিংবা সাম্য বামদিক থেকে ডানদিকে সরে যাবে অর্থাৎ N_2 ও O_2 বিক্রিয়া করে NO উৎপন্ন হবে। আবার, সাম্যাবস্থায় তাপমাত্রা হ্রাস করা হলে বিপরীতমুখী তাপ উৎপাদী বিক্রিয়া বৃদ্ধি পাবে অর্থাৎ সাম্য ডানদিক থেকে বামদিকে সরে যাবে অর্থাৎ NO ভেঙে N_2 এবং O_2 উৎপন্ন হবে।

সাম্যাবস্থার উপর চাপের প্রভাব

যে সকল বিক্রিয়ায় বিক্রিয়ক ও উৎপাদের মধ্যে যেকোনো একটি গ্যাসীয় বা সবই গ্যাসীয় অবস্থায় থাকে সেসব বিক্রিয়ায় সাম্যাবস্থার উপর চাপের প্রভাব থাকে। সাম্যাবস্থায় বিক্রিয়কের মোট মোল সংখ্যা এবং উৎপাদের মোট মোল সংখ্যার পরিবর্তন হলে সাম্যাবস্থার উপর চাপের প্রভাব থাকবে। যেমন:

$$N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$$

লা-শাতেলিয়ার নীতি অনুসারে সাম্যাবস্থায় চাপ প্রয়োগ করা হলে চাপ বৃদ্ধিজনিত ফলাফল প্রশমিত হতে হবে। একই আয়তনে গ্যাসের মোল সংখ্যা বেশি হলে চাপ বেশি হয় এবং মোল সংখ্যা কম হলে চাপ কম হয়। উপরের উভমুখী বিক্রিয়ায় বাম দিকে গ্যাসীয় উৎপাদে মোল সংখ্যা বেশি (1+3 = 4) এবং ডান দিকে কম (2)। কাজেই চাপ বৃদ্ধিজনিত ফলাফল প্রশমিত করার জন্য বিক্রিয়াটির গ্যাসীয় উপাদান বেশি মোল থেকে কম মোলের দিকে যেতে হবে। অর্থাৎ বিক্রিয়ার সম্মুখমুখী অংশটি বৃদ্ধি পেয়ে N_2 ও H_2 বিক্রিয়া করে NH_3 উৎপন্ন করবে। অন্যভাবে বলতে পারি, বেশি মোল থেকে কম মোলের দিকে সাম্য সরে যাবে। কাজেই সাম্যাবস্থায় চাপ কমিয়ে দিলে লা-শাতেলিয়ার নীতি অনুসারে চাপ হ্রাসজনিত ফলাফল প্রশমিত করার জন্য বা চাপ বাড়ানোর জন্য কম মোল থেকে বেশি মোলের দিকে সাম্য সরে যাবে।

আমরা আরও একটি উভমুখী বিক্রিয়া বিবেচনা করতে পারি:

$$N_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2NO(g)$$

এই বিক্রিয়ায় বিক্রিয়কের মোট মোল সংখ্যা $1 + 1 = 2$ এবং উৎপাদের মোল সংখ্যাও 2, অর্থাৎ এই বিক্রিয়ায় মোলের পরিবর্তন হয় না, কাজেই চাপেরও পরিবর্তন হয় না। অন্যভাবে বলতে পারি, এই বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থায় চাপের কোনো প্রভাব নেই।

সাম্যাবস্থার উপর ঘনমাত্রার প্রভাব

সকল বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থার উপর বিক্রিয়কের ঘনমাত্রার প্রভাব রয়েছে। বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থায় যে কোনো একটি বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা বাড়ালে লা-শাতেলিয়ার নীতি অনুসারে বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা কমিয়ে পরিবর্তনের ফলাফলকে প্রশমিত করার জন্য উৎপাদের পরিমাণ বৃদ্ধি হতে হবে। আমরা বলতে পারি, এখানে বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থা ডানদিকে অগ্রসর হয়। একইভাবে বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থায় যেকোনো একটি উৎপাদের ঘনমাত্রা বাড়ানো হলে উৎপাদের পরিমাণ কমানোর জন্য বিক্রিয়াটি বিপরীত দিকে ঘটতে থাকে এবং বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা বৃদ্ধি হতে থাকে। অন্যভাবে বলতে পারি, সাম্যাবস্থা বামদিকে অগ্রসর হয়।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ভিনেগারে কোন এসিডটি উপস্থিত থাকে?
(ক) সাইট্রিক এসিড (খ) এসিটিক এসিড
(গ) টারটারিক এসিড (ঘ) এসকরবিক এসিড

২. মৌমাছি কামড় দিলে ক্ষতস্থানে কোনটি ব্যবহার করা যেতে পারে?
(ক) কলিচুন (খ) ভিনেগার
(গ) খাবার লবণ (ঘ) পানি

৩. এন্টাসিড জাতীয় ওষুধ সেবনে কোন ধরনের বিক্রিয়া সম্পন্ন হয়?
(ক) প্রশমন (খ) দহন
(গ) সংযোজন (ঘ) প্রতিস্থাপন

৪. $H_2SO_4 + MgO \longrightarrow$ লবণ + পানি; বিক্রিয়াটিতে-

(i) তাপ উৎপন্ন হয়

(ii) ইলেকট্রন স্থানান্তর ঘটে

(iii) অধঃক্ষেপ পড়ে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii ও iii

(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

রসায়ন পরীক্ষাগারে নিচের বিক্রিয়ার মাধ্যমে ফেরিক ক্লোরাইড প্রস্তুত করা হলো:

$$2FeCl_2 + Cl_2 = 2FeCl_3$$

৫. উদ্দীপকে কোন ধরনের বিক্রিয়াটি সংঘটিত হয়েছে?

(ক) সংযোজন বিক্রিয়া (খ) প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া

(গ) বিয়োজন বিক্রিয়া (ঘ) দহন বিক্রিয়া

৬. উদ্দীপকের বিক্রিয়াটিতে-

i. $FeCl_2$ জারিত হয়

ii. Cl_2 জারক হিসেবে কাজ করে

iii. $FeCl_3$ অধঃক্ষিপ্ত হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. অপু ও সেতু উভয়ের বাসায় রান্নার কাজে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করা হয়। অপুর বাসার পাত্রের নিচে কালো দাগ পড়লেও সেতুর বাসার পাত্রের নিচে কোনো দাগ নেই।

(ক) একমুখী বিক্রিয়া কাকে বলে?

(খ) রাসায়নিক সাম্যাবস্থা বলতে কী বোঝায়?

(গ) রান্নার সময় তাদের বাসায় সম্পন্ন বিক্রিয়াটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো।

(ঘ) উদ্দীপকের কোন বাসায় রান্নার কাজে গ্যাসের অপচয় হয় বলে তুমি মনে করো? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

২.

$$Na + \frac{1}{2} Cl_2 \longrightarrow NaCl$$

$$Zn + H_2SO_4 \longrightarrow ZnSO_4 + H_2$$

(ক) সমাণুকরণ বিক্রিয়া কাকে বলে?
(খ) উভমুখী বিক্রিয়া উদাহরণসহ লেখো।
(গ) দ্বিতীয় বিক্রিয়াটির উৎপাদ যৌগটিতে সালফারের জারণ সংখ্যা নির্ণয় করো।
(ঘ) উদ্দীপকে প্রথম বিক্রিয়াটিতে জারণ-বিজারণ যুগপৎ ঘটে-বিশ্লেষণ করো।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. $CaCO_3$ এর বিয়োজন বিক্রিয়া খোলাপাত্রে একমুখী কিন্তু আবদ্ধ পাত্রে উভমুখী ব্যাখ্যা করো।
২. তীব্র অম্ল এবং তীব্র ক্ষারের বিক্রিয়ায় প্রশমন তাপের মান ধ্রুব কেন? ব্যাখ্যা করো।
৩. মৌমাছির হুল ফোটানোর স্থানে চুন প্রয়োগ করা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো।

অষ্টম অধ্যায়

রসায়ন ও শক্তি

(Chemistry and Energy)

সপ্তম অধ্যায়ে আমরা দেখেছি বেশির ভাগ বিক্রিয়া সংঘটিত হওয়ার সময় তাপ নির্গত হয়। যেমন- কাঠ, কয়লা, প্রকৃতিক গ্যাস পুড়িয়ে আমরা রান্না করি, গাড়ি চালাই। অর্থাৎ এক্ষেত্রে তাপ নির্গত হয়। প্রশ্ন হলো, এই তাপের উৎস কোথায়। প্রত্যেকটি রাসায়নিক বস্তু এক ধরনের শক্তি ধারণ করে যা বিক্রিয়ার মাধ্যমে তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। পদার্থের এই অন্তর্নিহিত শক্তিকে রাসায়নিক শক্তি বলে। পদার্থের মধ্যে এ রাসায়নিক শক্তি কীভাবে থাকে? আবার কীভাবেই বা এ শক্তি আমাদের কাজে লাগে? টর্চের ব্যাটারি দ্বারা আমরা বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে আলো জ্বালাই। খনিজ তেল পুড়িয়ে তা থেকে তাপশক্তি উৎপন্ন হয়। এ শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। এসব কীভাবে ঘটে? এ নিয়ে অবশ্যই তোমাদের মনে প্রশ্ন জাগে। বিভিন্ন দেশে পারমাণবিক শক্তি ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে। এ সবগুলোর সাথেই রসায়ন তথা রাসায়নিক বিক্রিয়া অথবা নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া জড়িত। আবার, এ বিক্রিয়াগুলোর কিছু বিরূপ প্রভাব আছে পরিবেশ ও আমাদের শরীরের উপর। এ সমস্ত বিষয়ই এ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- রাসায়নিক বিক্রিয়ার সাথে শক্তি উৎপাদনের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারব।
- শক্তি উৎপাদনে জ্বালানির বিশুদ্ধতার গুরুত্ব অনুধাবন, পরিবেশ সুরক্ষায় এগুলোর ব্যবহার সীমিত রাখতে ও উপযুক্ত জ্বালানি নির্বাচনে সচেতনতার পরিচয় দিতে পারব।
- নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে রাসায়নিক বিক্রিয়া-সংশ্লিষ্ট সমস্যা চিহ্নিত করে তা অনুসন্ধানের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন এবং এর কার্যকারিতা মূল্যায়ন করতে পারব।
- রাসায়নিক বিক্রিয়ার সংঘটনে এবং শক্তি উৎপাদনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ও আত্মবিশ্বাসের সাথে দায়িত্বশীল সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হব।
- জারণ-বিজারণ বিক্রিয়ার ইলেকট্রনীয় মতবাদ ব্যবহার করে চলবিদ্যুতের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বিদ্যুৎ ব্যবহার করে বিক্রিয়া সংঘটন করতে পারব।
- বিভিন্ন পদার্থের তড়িৎ বিশ্লেষণে উৎপাদিত পদার্থ এবং এর বাণিজ্যিক ব্যবহার সম্পর্কে মতামত দিতে পারব।
- গ্যালভানিক কোষের তড়িৎদ্বার গঠন করতে পারব।
- তড়িৎ বিশ্লেষ্য কোষ ও গ্যালভানিক কোষের মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- তড়িৎ রাসায়নিক কোষের প্রয়োগ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্পর্কে মতামত দিতে পারব।
- তাপহারী ও তাপ উৎপাদী বিক্রিয়ার পরীক্ষা করতে পারব।
- রাসায়নিক দ্রব্যের ক্ষতিকর দিকসমূহ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারব।
- বিশুদ্ধ জ্বালানি ব্যবহারে আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারব।
- দ্রবণ ও রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তাপের পরিবর্তন পরীক্ষার সাহায্যে দেখাতে পারব।

৮.১ রাসায়নিক শক্তি (Chemical Energy)

৮.১.১ রাসায়নিক শক্তির উৎস

আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি যে, পদার্থের মধ্যে অণু ও পরমাণু থাকে। একটি বস্তুতে এ অণু বা পরমাণুগুলো পরস্পরের সাথে যে শক্তির সাহায্যে যুক্ত থাকে তাদেরকে রাসায়নিক শক্তি বলে।

তোমরা এই অধ্যায়ে এসব রাসায়নিক শক্তি সম্পর্কে জানবে।

বন্ধন শক্তি (Bond Energy)

বস্তু বা যৌগে বন্ধনে আবদ্ধ একটি পরমাণুর সাথে আরেকটি পরমাণু যে আকর্ষণ শক্তির মাধ্যমে যুক্ত থাকে তাকে বন্ধন শক্তি বলে।

সোডিয়াম ক্লোরাইডে সোডিয়াম আয়ন ও ক্লোরাইড আয়নের মধ্যে আয়নিক বন্ধন বিদ্যমান। কার্বন ডাই-অক্সাইড অণুতে কার্বন ও অক্সিজেনের মধ্যে সমযোজী বন্ধন বিদ্যমান। আবার, একটি লোহার টুকরায় আয়রন পরমাণুসমূহের মধ্যে ধাতব বন্ধন বিদ্যমান। এসব বন্ধনে একটি পরমাণুর সাথে আরেকটি পরমাণু যে আকর্ষণ শক্তির মাধ্যমে যুক্ত থাকে তাকেই বন্ধন শক্তি বলে।

আন্তঃআণবিক শক্তি

সমযোজী যৌগের অণুসমূহ একে অপরের সাথে যে আকর্ষণ শক্তির মাধ্যমে যুক্ত থাকে তাকে আন্তঃআণবিক শক্তি (Intermolecular Energy) বলা হয়। যেমন- পানি একটি সমযোজী যৌগ। একটি পানির অণুর সাথে আশপাশের অন্যান্য পানির অণুসমূহ আন্তঃআণবিক আকর্ষণ শক্তির মাধ্যমে যুক্ত থাকে।

অন্যদিকে, সোডিয়াম ক্লোরাইডের আয়নিক যৌগে একটি সোডিয়াম আয়নের চারদিকে 6টি ক্লোরাইড আয়ন অবস্থান করে। এখানে একটি সোডিয়াম ও 6টি ক্লোরাইড আয়নের মধ্যে আকর্ষণ বিদ্যমান থাকে। আবার প্রত্যেকটি ক্লোরাইড আয়নের চারদিকে 6টি সোডিয়াম আয়ন অবস্থান করে। এখানে প্রত্যেকটি ক্লোরাইড আয়ন ও 6টি সোডিয়াম আয়নের মধ্যে আকর্ষণ বিদ্যমান থাকে।

আয়নিক যৌগে আয়নসমূহের মধ্যে যে আকর্ষণ শক্তি থাকে ঐ আকর্ষণ শক্তি সমযোজী যৌগের আন্তঃআণবিক শক্তির চেয়ে বেশি। এজন্য আয়নিক পদার্থের গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক সমযোজী পদার্থের গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক অপেক্ষা বেশি।

এজন্য আয়নিক যৌগসমূহ সাধারণত কক্ষ তাপমাত্রায় কঠিন অবস্থায় থাকে আর সমযোজী যৌগসমূহ সাধারণত কক্ষ তাপমাত্রায় তরল বা বায়বীয় অবস্থায় থাকে। তবে অনেক সমযোজী যৌগ আছে যেগুলো কক্ষ তাপমাত্রায় কঠিন অবস্থায় থাকে। যেমন: ন্যাপথলিন।

একই মৌলের পরমাণু থেকে উৎপন্ন সমযোজী অণুসমূহের (যেমন– H_2) আন্তঃআণবিক শক্তির চেয়ে দুইটি ভিন্ন মৌলের পরমাণু দিয়ে গঠিত অণুর (যেমন HCl) আন্তঃআণবিক শক্তি বেশি হয়।

রাসায়নিক বিক্রিয়ায় শক্তির রূপান্তর

প্রত্যেক পদার্থের মধ্যে কিছু না কিছু শক্তি বিদ্যমান থাকে। সপ্তম অধ্যায়ে বিক্রিয়ায় আমরা দেখেছি কোনো কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ায় শক্তি নির্গত হয় আবার কোনো কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ায় শক্তি শোষিত হয়। অর্থাৎ রাসায়নিক বিক্রিয়ায় শক্তির রূপান্তর ঘটে। একটি বিক্রিয়ায় শক্তির রূপান্তর বিভিন্ন রূপে হতে পারে। যেমন– তাপশক্তি, আলোক শক্তি, বিদ্যুৎ শক্তি, শব্দ শক্তি ইত্যাদিতে রূপান্তরিত হতে পারে।

শক্তি পরিমাপের একক

পূর্বে শক্তি মাপার জন্য ক্যালরি (Calorie) বা কিলো ক্যালরি (kilo Calorie) একক ব্যবহার করা হতো। 1 গ্রাম পানির তাপমাত্রা 1°C বাড়াতে যে পরিমাণ তাপশক্তি প্রদান করতে হয় তাকে এক ক্যালরি (সংক্ষেপে Cal) বলে। 1 হাজার ক্যালরিকে 1 কিলো ক্যালরি বলে। কিলো ক্যালরিকে সংক্ষেপে kCal দিয়ে প্রকাশ করা হয়।

বর্তমানে সকল ধরনের শক্তির একক হিসেবে জুল (Joule) কে আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। কোনো বস্তুর উপর 1 নিউটন বল প্রয়োগ করলে যদি বলের দিকে 1 মিটার সরণ ঘটে তবে তার জন্য প্রয়োজনীয় কাজকে 1 জুল বলে। একে সংক্ষেপে J দিয়ে প্রকাশ করা হয়। 1 হাজার জুলকে 1 কিলোজুল (kJ) বলে।

জুল ও ক্যালোরির সম্পর্ক হচ্ছে: 1 Cal = 4.18 J

৮.১.২ তাপের পরিবর্তনের ভিত্তিতে রাসায়নিক বিক্রিয়ার শ্রেণিবিভাগ

কিছু কিছু বিক্রিয়া স্বঃতস্ফূর্তভাবে ঘটে আবার কিছু কিছু বিক্রিয়া শক্তি প্রয়োগ করে ঘটাতে হয়। যে সকল বিক্রিয়া স্বঃতস্ফূর্তভাবে ঘটে সেসব বিক্রিয়ায় বিক্রিয়ক উৎপাদে পরিণত হবার সময়ে তাপ উৎপন্ন হয়। তাপের পরিবর্তনের ভিত্তিতে রাসায়নিক বিক্রিয়া দুই ধরনের- (i) তাপোৎপাদী বিক্রিয়া (ii) তাপহারী বিক্রিয়া। তাপোৎপাদী বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে ΔH এর মান ঋণাত্মক (negative) এবং তাপহারী বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে ΔH এর মান ধনাত্মক (positive) হয়।

এখানে H হলো heat content বা বস্তুর ধারণকৃত তাপ।

একটি পদার্থ একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি ধারণ করে। এই শক্তিকে অভ্যন্তরীণ শক্তিও (Internal Energy) বলে। একটি বিক্রিয়ায় বিক্রিয়কসমূহের মোট অভ্যন্তরীণ শক্তিকে H_1 দ্বারা এবং উৎপাদসমূহের মোট অভ্যন্তরীণ শক্তিকে H_2 দ্বারা চিহ্নিত করা হলে ঐ বিক্রিয়ার তাপ শক্তির পরিবর্তন-

ΔH = উৎপাদসমূহের মোট অভ্যন্তরীণ শক্তি (H_2) – বিক্রিয়কসমূহের মোট অভ্যন্তরীণ শক্তি (H_1)

তাপোৎপাদী বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে বিক্রিয়কসমূহের মোট অভ্যন্তরীণ শক্তি H_1 উৎপাদসমূহের মোট অভ্যন্তরীণ শক্তি H_2 থেকে বেশি। কাজেই এ বিক্রিয়াতে বিক্রিয়া তাপ বা শক্তির পরিবর্তন $\Delta H = H_2 - H_1$ এর মান ঋণাত্মক। এইসব বিক্রিয়ায় তাপ নির্গত হয়।

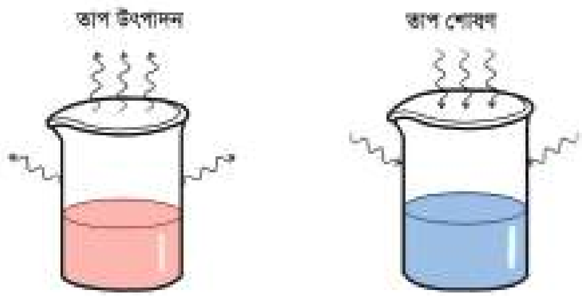

চিত্র ৮.০১: তাপ উৎপাদন ও তাপ শোষণ

যেমন- কোনো বিক্রিয়ায় বিক্রিয়কসমূহের মোট অভ্যন্তরীণ শক্তি 50 kJ/mol এবং উৎপাদসমূহের মোট অভ্যন্তরীণ শক্তি 20 kJ/mol হলে $\Delta H = (20 - 50)$ kJ/mol = -30 kJ/mol অর্থাৎ 30kJ/mol তাপ নির্গত হয়।

আবার, তাপহারী বিক্রিয়ায় ক্ষেত্রে বিক্রিয়কসমূহের মোট অভ্যন্তরীণ শক্তি H_1 উৎপাদসমূহের মোট অভ্যন্তরীণ শক্তি H_2 থেকে কম। কাজেই এ বিক্রিয়াতে তাপ শক্তির পরিবর্তন $\Delta H = H_2 - H_1$ এর মান ধনাত্মক। এ ধরনের বিক্রিয়ায় শক্তি প্রয়োগ করা না হলে বিক্রিয়া ঘটে না।

যেমন: কোনো বিক্রিয়ায় বিক্রিয়কসমূহের মোট অভ্যন্তরীণ শক্তি 70 kJ/mol এবং উৎপাদসমূহের মোট অভ্যন্তরীণ শক্তি 80 kJ/mol হলে $\Delta H = (80 - 70)$ kJ/mol = +10 kJ/mol। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে কমপক্ষে 10 kj শক্তি প্রয়োগ করতে হবে। তা না হলে বিক্রিয়া ঘটবে না।

তাপোৎপাদী বিক্রিয়া (Exothermic Reactions)

যে বিক্রিয়ায় তাপ উৎপন্ন হয় তাকে তাপোৎপাদী বিক্রিয়া বলা হয়। তাপোৎপাদী বিক্রিয়ার সমীকরণ লেখার সময় বিক্রিয়ার ডানপাশে উৎপাদের সাথে + চিহ্ন দিয়ে তাপ লেখা যেতে পারে কিংবা ΔH দিয়ে বিক্রিয়ায় উৎপাদিত তাপ প্রকাশ করা যেতে পারে, এক্ষেত্রে ΔH এর মান ঋণাত্মক হবে। তোমরা দেখেছ, কোনো কিছু রান্না করতে চুলাতে জ্বালানি হিসেবে যে গ্যাস ব্যবহার করি তা পোড়ালে তাপ উৎপন্ন হয়। আবার শুকনা চুন পানিতে যোগ করলে তা গরম হয়ে ওঠে। রান্নার গ্যাসের প্রধান উপাদান হলো মিথেন (CH_4)। এ গ্যাস পোড়ালে প্রতি 1 মোল মিথেন গ্যাস বাতাসের অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে কার্বন ডাই-অক্সাইড আর পানি উৎপন্ন হয়। সেই সাথে 890 kJ তাপও উৎপন্ন হয়।

$$CH_4(g) + 2O_2(g) \longrightarrow CO_2(g) + 2H_2O(g) + 890\ kJ/mol$$

মিথেন অক্সিজেন কার্বন ডাই-অক্সাইড জলীয় বাষ্প

বা

$$CH_4(g) + 2O_2(g) \longrightarrow CO_2(g) + 2H_2O(g)\ ;\ \Delta H = -890\ kJ/mol$$

মিথেন অক্সিজেন কার্বন ডাই-অক্সাইড জলীয় বাষ্প

আবার, শুকনা চুন হলো ক্যালসিয়াম অক্সাইড (CaO)। ক্যালসিয়াম অক্সাইডে পানি যোগ করলে ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড $Ca(OH)_2$ উৎপন্ন হয়। সেই সাথে 63.95 kJ/mol তাপ উৎপন্ন হয়। সেজন্যই এ মিশ্রণ গরম হয়ে ওঠে।

$$CaO(s) + 2H_2O(l) \longrightarrow Ca(OH)_2(aq) + 63.95\ kJ/mol$$

ক্যালসিয়াম অক্সাইড পানি ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড

বা

$$CaO(s) + 2H_2O(l) \longrightarrow Ca(OH)_2(aq)\ ;\ \Delta H = -63.95\ kJ/mol$$

ক্যালসিয়াম অক্সাইড পানি ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড

উপরের দুটি উদাহরণেই বিক্রিয়কের অভ্যন্তরীণ শক্তি উৎপাদের অভ্যন্তরীণ শক্তি থেকে বেশি। তাই বিক্রিয়ক যখন উৎপাদে পরিণত হয় তখন অতিরিক্ত শক্তিটুকু তাপশক্তি আকারে নির্গত হয়।

তাপহারী বিক্রিয়া (Endothermic Reactions)

তাপ প্রদান করে যে বিক্রিয়া ঘটানো হয় সেই বিক্রিয়াকে তাপহারী বিক্রিয়া বলা হয়। তাপহারী বিক্রিয়াকে তাপশোষী বিক্রিয়াও বলা হয়। তাপহারী বিক্রিয়ার সমীকরণ লেখার সময় বিক্রিয়ার বামপাশে বিক্রিয়কের সাথে + চিহ্ন দিয়ে তাপ লেখা যেতে পারে। কিন্তু ΔH দিয়ে লিখলে ΔH এর মান ধনাত্মক হবে। গ্রামে শামুক বা ঝিনুকের খোলস থেকে চুন তৈরি করা হয়। অনেকগুলো শামুক বা ঝিনুকের খোলস একসাথে জড়ো করে আগুন জ্বালিয়ে সেগুলোকে উত্তপ্ত করা হয়। এতে খোলসগুলো থেকে চুন তৈরি

চিত্র ৮.০২: ঝিনুকের খোলস থেকে চুন তৈরি

হয়। আসলে ঝিনুক বা শামুকের খোলসগুলোতে প্রায় 98% ক্যালসিয়াম কার্বনেট ($CaCO_3$) থাকে। আগুনের তাপে এ ক্যালসিয়াম কার্বনেট ভেঙে গিয়ে ক্যালসিয়াম অক্সাইড এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড তৈরি হয়। ক্যালসিয়াম অক্সাইড হচ্ছে চুন, সেটি পড়ে থাকে আর কার্বন ডাই-অক্সাইড বাতাসের সাথে মিশে যায়।

$$CaCO_3(s) + 176.8\ kJ/mole \longrightarrow CaO(s) + CO_2(g)$$

ক্যালসিয়াম কার্বনেট   ক্যালিসয়াম অক্সাইড   কার্বন ডাই-অক্সাইড

বা

$$CaCO_3(s) \longrightarrow CaO(s) + CO_2(g)\ ;\ \Delta H = 176.8\ kJ/mole$$

ক্যালসিয়াম কার্বনেট   ক্যালিসয়াম অক্সাইড   কার্বন ডাই-অক্সাইড

৮.১.৩ বন্ধন শক্তি হিসাব করে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তাপের পরিবর্তনের হিসাব

রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তাপের পরিবর্তন বা ΔH এর মান দুইভাবে হিসাব করা হয়। (১) অভ্যন্তরীণ শক্তি ব্যবহার করে এবং (২) বন্ধন শক্তি ব্যবহার করে।

যদি অভ্যন্তরীণ শক্তি ব্যবহার করা হয় তাহলে উৎপাদসমূহের মোট অভ্যন্তরীণ শক্তি থেকে বিক্রিয়কসমূহের মোট অভ্যন্তরীণ শক্তি বাদ দিয়ে ΔH এর মান হিসাব করা হয়। আর যদি বন্ধন শক্তি ব্যবহার করা হয় তাহলে বিক্রিয়কসমূহের মোট বন্ধন শক্তি থেকে উৎপাদসমূহের মোট বন্ধন শক্তি বাদ দিয়ে ΔH এর মান হিসাব করা হয়। যেভাবে হিসাব করা হউক না কেন, বিক্রিয়ার ΔH এর মান একই থাকে।

একটি যৌগের যেকোনো দুইটি পরমাণুর মধ্যকার বন্ধন ভেঙে পরমাণু দুটিকে আলাদা করতে যে শক্তি দিতে হয় তাকে বন্ধন শক্তি বলে। আবার কোনো যৌগের যেকোনো দুইটি পরমাণুর মধ্যে বন্ধন তৈরি হলে যে শক্তি নির্গত হয় তাকেও বন্ধন শক্তি বলে।

রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার সময় বিক্রিয়কগুলোর মধ্যে যে বন্ধনগুলো আছে সেই বন্ধনগুলো ভেঙে যায় এবং উৎপাদগুলোর মধ্যে নতুন নতুন বন্ধন তৈরি হয়। বিক্রিয়কগুলোর বন্ধন ভাঙার জন্য শক্তি দিতে হয় এবং উৎপাদগুলোর বন্ধন তৈরি হলে শক্তি নির্গত হয়।

যেকোনো বিক্রিয়ায় বিক্রিয়কগুলোর মোট বন্ধন শক্তিকে B_1 দিয়ে এবং উৎপাদসমূহের মোট বন্ধন শক্তিকে B_2 দিয়ে চিহ্নিত করা হলে ঐ বিক্রিয়ার তাপ শক্তির পরিবর্তন:

ΔH = বিক্রিয়কগুলোর মোট বন্ধন শক্তি B_1 – উৎপাদগুলোর মোট বন্ধন শক্তি B_2
= (বিক্রিয়কগুলোর বন্ধন ভাঙার জন্য দেওয়া মোট শক্তি B_1)
– (উৎপাদনগুলোর বন্ধন তৈরি হওয়ার জন্য নির্গত হওয়া মোট শক্তি B_2)

২০২৫

তাপ উৎপাদী বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে B_1 এর মান B_2 থেকে কম। এজন্য তাপ উৎপাদী বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে ΔH এর মান ঋণাত্মক। অন্যদিকে তাপহারী বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে B_1 এর মান B_2 থেকে বেশি। এজন্য তাপহারী বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে ΔH এর মান ধনাত্মক। নিচের তালিকায় কিছু বন্ধনের বন্ধন শক্তি উপস্থাপন করা হলো।

টেবিল ৮.০১: বন্ধন এবং বন্ধন শক্তি

বন্ধন	বন্ধন শক্তি (কিলোজুল/মোল)	বন্ধন	বন্ধন শক্তি (কিলোজুল/মোল)
C-H	414	N-H	391
C-Cl	326	O-H	464
C-C	344	O=O	498
C=C	615	C≡C	812
N≡N	946	Cl-Cl	244
Br-Br	193	I-I	151
O-O	143	H-H	436
H-Cl	431	H-Br	366
H-I	299	H-F	563
C=O	724	C-O	350

8.01 তালিকা থেকে দেখা যায়, O=O এর বন্ধন শক্তি 498 কিলোজুল/মোল। এ তথ্য থেকে বোঝা যায় 1 মোল O=O বন্ধনকে ভাঙতে 498 কিলোজুল তাপ দিতে হয়। অথবা অন্যভাবে বলা যায় 1 মোল O=O বন্ধন তৈরি হতে 498 কিলোজুল তাপ নির্গত হয়।

উদাহরণ

সমস্যা: $CH_4 + Cl_2 \rightarrow CH_3Cl + HCl$ বিক্রিয়ার বিক্রিয়া তাপের পরিবর্তন (ΔH) হিসাব করো।

দেওয়া আছে, C-H বন্ধন শক্তি 414 কিলোজুল/মোল, C-Cl বন্ধন শক্তি 326 কিলোজুল/মোল, Cl–Cl বন্ধন শক্তি 244 কিলোজুল/মোল, H-Cl বন্ধন শক্তি 431 কিলোজুল/মোল।

সমাধান: $CH_4 + Cl_2 \rightarrow CH_3Cl + HCl$ এই বিক্রিয়ায় বিক্রিয়কগুলোর এক মোল C-H বন্ধন ও এক মোল Cl-Cl বন্ধন ভেঙেছে এবং উৎপাদসমূহের এক মোল C-Cl বন্ধন ও এক মোল H-Cl বন্ধন তৈরি হয়েছে।

কাজেই, বিক্রিয়কগুলোর বন্ধন ভাঙার জন্য প্রদত্ত মোট শক্তি = (414 + 244) kJ = 658 kJ

উৎপাদগুলোর বন্ধন তৈরি হতে নির্গত মোট শক্তি = (326 + 431) kJ = 757 kJ

কাজেই বিক্রিয়া তাপের পরিবর্তন, ΔH = (658 − 757) kJ = -99 kJ

যেহেতু ΔH এর মান ঋণাত্মক সেহেতু এটি তাপ উৎপাদী বিক্রিয়া। এই বিক্রিয়ায় 99 কিলোজুল/মোল তাপ উৎপন্ন হয়।

৮.২ রাসায়নিক শক্তির ব্যবহার (Uses of Chemical Energy)

রাসায়নিক শক্তিকে বিভিন্ন শক্তিতে রূপান্তরিত করে আমরা বিভিন্নভাবে ব্যবহার করতে পারি।

৮.২.১ রাসায়নিক শক্তিকে অন্য প্রকারের শক্তিতে রূপান্তর

রাসায়নিক শক্তি তাপ, আলো, বিদ্যুৎ, শব্দ বা যান্ত্রিক ইত্যাদি যেকোনো শক্তিতে রূপান্তর হতে পারে। নিচে কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো।

জ্বালানি পোড়ানো

কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস, কাঠ ইত্যাদি পোড়ালে আমরা তাপ ও আলো পাই। তাপ ও আলো মূলত এ পদার্থগুলোর মধ্যে বিদ্যমান রাসায়নিক শক্তি থেকে পাওয়া যায়। দহন বা পোড়ানো হলো কোনো পদার্থকে বায়ুর অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করানো। প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান উপাদান হলো মিথেন (CH_4)। মিথেনে যখন দহন ঘটে অর্থাৎ মিথেনকে যখন অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া ঘটানো হয় তখন কার্বন ডাই-অক্সাইড, জলীয় বাষ্প, তাপ এবং আলো সৃষ্টি হয়।

আতশ-বাজি

তোমরা বড় কোনো অনুষ্ঠানের রাতে আকাশে যে আতশবাজি দেখো সেখান থেকে আলো ও শব্দ পাওয়া যায়। আতশবাজির ভিতরে যে রাসায়নিক পদার্থগুলো থাকে তাদের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে। ফলে রাসায়নিক শক্তি আলো ও শব্দ এ দুই শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

ড্রাই সেল

তোমরা সবাই ব্যাটারি দেখেছ। টর্চলাইট, দেওয়াল ঘড়ি, কম্পিউটারের মাউস বা টেলিভিশনের রিমোট ইত্যাদিতে যে পেনসিল ব্যাটারি ব্যবহার করা হয়, সেগুলো আসলে ড্রাই সেল (ব্যাটারি বা ড্রাই সেল সম্বন্ধে এ অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে আমরা আরও জানতে পারব)। ড্রাই সেলের মধ্যে যে সকল রাসায়নিক পদার্থ থাকে তাদের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে। আর এই রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে রাসায়নিক শক্তি বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

ডেনিয়েল সেল

জিংক সালফেট লবণের দ্রবণের মধ্যে জিংক ধাতুর দণ্ড এবং কপার সালফেট লবণের দ্রবণের মধ্যে কপার ধাতুর দণ্ড ব্যবহার করে ডেনিয়েল সেল তৈরি করা হয়। এতে নিচের বিক্রিয়া ঘটে:

$$Zn(s) + CuSO_4(aq) \longrightarrow ZnSO_4(aq) + Cu(s)$$

এ বিক্রিয়ার মাধ্যমে রাসায়নিক শক্তি বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

৮.২.২ রাসায়নিক শক্তি থেকে রূপান্তরিত বিভিন্ন শক্তির ব্যবহার

ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি, পদার্থের মধ্যে রাসায়নিক শক্তি সঞ্চিত থাকে। এ শক্তিকে পরবর্তীকালে বিভিন্ন শক্তিতে রূপান্তর করে আমরা বিভিন্ন কাজে লাগাই। পৃথিবীতে সকল প্রকার শক্তির মাঝে রাসায়নিক শক্তি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়।

রান্নার কাজে আমরা জ্বালানি হিসেবে কাঠ বা প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করি। কাঠ বা প্রাকৃতিক গ্যাস পোড়ালে এদের ভিতরের রাসায়নিক শক্তি তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। কাঠ পোড়ালে যে তাপ পাওয়া যায় সে তাপ ব্যবহার করে রান্না করা হয়, ইটের ভাটায় ইটসহ মাটির বিভিন্ন পাত্র তৈরি করা হয়। লোহা, ইস্পাত বা সিরামিকস প্রভৃতি কারখানায় প্রচুর তাপের প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে কয়লা, পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস ইত্যাদি খনিজ জ্বালানি তাপ ইঞ্জিনে ব্যবহার করা হয়। এ জ্বালানি ইঞ্জিনের দহন চেম্বারে পুড়িয়ে যে তাপশক্তি উৎপন্ন হয় তাকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে মোটর গাড়ি, জাহাজ, বিমান, রেলগাড়ি ইত্যাদি চালানো হয়।

রাসায়নিক শক্তির কথা বলতে গেলে প্রথমেই সালোকসংশ্লেষণ এর উল্লেখ করতে হয়। উদ্ভিদের সবুজ অংশে ক্লোরোফিল থাকে, এই ক্লোরোফিলের সহায়তায় সূর্যের আলো উদ্ভিদে মাটি থেকে মূল দিয়ে শোষিত পানি ও বায়ু থেকে শোষিত কার্বন ডাই-অক্সাইডের মধ্যে বিক্রিয়া ঘটিয়ে গ্লুকোজ ($C_6H_{12}O_6$) নামক শর্করা তৈরি করে, সেই সাথে অক্সিজেনও উৎপন্ন হয়। এ অক্সিজেন উদ্ভিদ থেকে বের হয়ে বাতাসে মিশে যায়। এ বিক্রিয়াটিকেই আমরা সালোকসংশ্লেষণ বলি। তবে সালোকসংশ্লেষণ ঘটাতে উদ্ভিদ যে সূর্যালোক ব্যবহার করে তা রাসায়নিক শক্তি হিসেবে শর্করার মধ্যে সঞ্চিত হয়।

$$\underset{\text{কার্বন ডাই-অক্সাইড}}{6CO_2} + \underset{\text{পানি}}{12H_2O} \xrightarrow[\text{ক্লোরোফিল}]{\text{সূর্যালোক}} \underset{\text{গ্লুকোজ}}{C_6H_{12}O_6} + \underset{\text{অক্সিজেন}}{6O_2} + \underset{\text{পানি}}{6H_2O}$$

চিত্র ৮.০৩: সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া

এছাড়া উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহে প্রোটিন ও চর্বি জাতীয় পদার্থ তৈরি হয়। এগুলোতেও রাসায়নিক শক্তি মজুদ থাকে। মানুষ ও অন্যান্য প্রাণিকুল এগুলো খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহকে রাসায়নিক যন্ত্র বলা যেতে পারে যেখানে উদ্ভিদ এ শর্করা, প্রোটিন ও চর্বি জাতীয় খাদ্য থেকে রাসায়নিক শক্তি উৎপন্ন হয়। এ শক্তি তাপশক্তি বা অন্যান্য প্রকার শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এ শক্তি ব্যবহার করে উদ্ভিদ ও প্রাণিকুল বিভিন্ন জৈবিক কার্যকলাপ করে। কাজেই বুঝতেই পারছো রাসায়নিক শক্তি ছাড়া প্রাণের অস্তিত্ব অসম্ভব।

৮.২.৩ রাসায়নিক শক্তির যথাযথ ব্যবহার

পেট্রোলিয়াম, কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস এগুলোকে জীবাশ্ম জ্বালানি বলে। এসব জ্বালানির মাঝে রাসায়নিক শক্তি জমা থাকে। এসব জ্বালানির দহন ঘটিয়ে বা জ্বালানিকে অক্সিজেনে পুড়িয়ে জ্বালানির মধ্যে বিদ্যমান রাসায়নিক শক্তি থেকে আমরা তাপশক্তি পাই। এই তাপশক্তি ব্যবহার করে আমরা রান্না, গাড়ি চালানো, বিদ্যুৎ উৎপাদনসহ নানা ধরনের কাজ করি।

এসব জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ালে একদিকে যেমন আমরা তাপশক্তি পাই, অন্যদিকে এই জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে প্রচুর পরিমাণে কার্বন মনো-অক্সাইড ও কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন করে। এই গ্যাসগুলো পরিবেশের ক্ষতি করে। প্রতিবছর জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানোর ফলে 21.3 বিলিয়ন টন কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হচ্ছে। কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রিনহাউজ গ্যাস অর্থাৎ এটি তাপ ধারণ করে যার ফলে বিশ্ব ধীরে ধীরে উষ্ণ হয়ে উঠছে। আবার কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস বৃষ্টির পানির সাথে বিক্রিয়া করে কার্বনিক এসিড (H_2CO_3) তৈরি করছে, যা বৃষ্টির পানির সাথে মাটিতে পড়ছে। একে আমরা **এসিড বৃষ্টি** বলি। এসিড বৃষ্টি পরিবেশের অনেক ক্ষতি করে। জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট এ সকল কারণে এক সময় পৃথিবীতে জীবের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়বে। তাই জীবাশ্ম জ্বালানির পরিমিত ব্যবহার করা উচিত। কোনোভাবেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার করা উচিত নয়। পৃথিবীতে যে পরিমাণ জীবাশ্ম জ্বালানি আছে তার চেয়ে বেশি জীবাশ্ম জ্বালানি তৈরি হবে না। জীবাশ্ম জ্বালানি অতিরিক্ত ব্যবহার করলে এক সময় জীবাশ্ম জ্বালানি শেষ হয়ে যাবে। জীবাশ্ম জ্বালানির পরিমিত ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারলে অর্থাৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার না করলে পৃথিবীতে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহারের উপর চাপ কমবে এবং পরিবেশের জন্যও কল্যাণকর হবে।

৮.২.৪ জ্বালানির বিশুদ্ধতার গুরুত্ব

রাসায়নিক শক্তির আধার হিসেবে আমরা নানা ধরনের জ্বালানি ব্যবহার করি। বিশেষ করে কাঠ, প্রাকৃতিক গ্যাস, পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি আমরা প্রতিনিয়ত ব্যবহার করে যাচ্ছি। এ সমস্ত জ্বালানি বিশুদ্ধ হওয়া একান্ত জরুরি। স্বল্প বায়ুর উপস্থিতিতে এসব জ্বালানি পোড়ালে কার্বন ডাই-অক্সাইডের সাথে কার্বন মনোক্সাইড উৎপন্ন হয়, যেটি বিষাক্ত একটি গ্যাস। এ গ্যাস আমাদের শরীরের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। প্রকৃতিতে যে জ্বালানি পাওয়া যায়, সেগুলো মূলত অবিশুদ্ধ থাকে। এর সাথে নাইট্রোজেন, সালফার, ফসফরাস প্রভৃতি মৌলের বিভিন্ন যৌগ মিশ্রিত থাকে। সেজন্য বাজারে এসব জ্বালানি ছাড়ার আগে যথেষ্ট পরিমাণে বিশুদ্ধ করে নেওয়া দরকার। বিশুদ্ধ না করে এসব জ্বালানি পোড়ালে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের সাথে এসব মৌলের অক্সাইডও বাতাসে চলে আসে। এসব অক্সাইড বৃষ্টির পানির সাথে মিশে এসিড তৈরি করে। ফলে তখন যে বৃষ্টি হয় তার সাথে এ এসিডগুলো যথেষ্ট পরিমাণে মিশ্রিত থাকে। এ বৃষ্টিকে এসিড বৃষ্টি বলে। এসিড বৃষ্টি সৃষ্টিতে সংশ্লিষ্ট রাসায়নিক বিক্রিয়াসমূহ:

$$CO_2 + H_2O \longrightarrow H_2CO_3$$

কার্বন ডাই-অক্সাইড   পানি   কার্বনিক এসিড

$$2SO_2 + O_2 \longrightarrow 2SO_3$$

সালফার ডাই-অক্সাইড   অক্সিজেন   সালফার ট্রাইঅক্সাইড

$$2SO_3 + 2H_2O \longrightarrow 2H_2SO_4$$

সালফার ট্রাই-অক্সাইড   পানি   সালফিউরিক এসিড

$$4\ NO_2 + 2H_2O + O_2 \longrightarrow 4HNO_3$$

নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড   পানি   অক্সিজেন   নাইট্রিক এসিড

এসিড বৃষ্টি পরিবেশের জন্য খুবই ক্ষতিকর। গাছপালা মরে যায়। জলাশয়ের পানি অম্লযুক্ত হয়ে যায়। ফলে মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণীর টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়ে। এছাড়া যানবাহন থেকে নির্গত ধোঁয়ায় কার্বন মনোক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড ও অব্যবহৃত জ্বালানি (যেমন–মিথেন) ইত্যাদি থাকে। সূর্যের আলোর উপস্থিতিতে এগুলো নানা রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষাক্ত গ্যাসের ধোঁয়া সৃষ্টি করে। এদেরকে 'ফটোকেমিক্যাল ধোঁয়া' (photochemical smog) বলে যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

২০২৩

৮.২.৫ রাসায়নিক শক্তি ব্যবহারের নেতিবাচক প্রভাব

আমরা শক্তি পাবার জন্য জ্বালানি পোড়াচ্ছি। মূলত আমরা জ্বালানি পোড়ানোর মাধ্যমে রাসায়নিক শক্তিকে ব্যবহার করছি। যদিও বর্তমান বিশ্বে সৌরশক্তি, নিউক্লিয়ার শক্তি, বায়ু শক্তি, স্রোতের শক্তিকেও কাজে লাগানো হচ্ছে, তবু জীবাশ্ম জ্বালানিই আমাদের প্রয়োজনীয় শক্তির সিংহভাগ জোগান দেয়। আমরা আগেই বলেছি, প্রতিবছর জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানোর ফলে 21.3 বিলিয়ন টন কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হচ্ছে। গাছ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে। এছাড়া আরও কিছু প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় এর অনেকটা ব্যবহার হয়। বাকিটুকু পৃথিবীতে থেকে যায়। কার্বন ডাই-অক্সাইড ভারী গ্যাস বলে তা বায়ুমণ্ডলের নিচের অংশেই থাকে। কার্বন ডাই-অক্সাইড বায়ুর অন্যান্য উপাদানের সাথে বিক্রিয়াও করে না। কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রচুর পরিমাণে তাপশক্তি ধারণ করতে পারে। ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা দিনে দিনে বেড়ে যাচ্ছে। একে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন (global warming) বলে। বৈশ্বিক উষ্ণায়নে পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাবার কারণে মেরু অঞ্চলের বরফ গলে সেটি সমুদ্রের পানির উচ্চতা বাড়িয়ে দিচ্ছে। যে কারণে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অনেক দেশের বিশাল অংশ পানির নিচে ডুবে যাবে। কার্বন ডাই-অক্সাইড ছাড়াও আরও কিছু গ্যাস আছে যেগুলো পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি করছে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির এ ঘটনাকে 'গ্রিনহাউস প্রভাব' বলে (greenhouse effect)। আর এ সকল গ্যাসকে গ্রিনহাউস গ্যাস বলে। কার্বন ডাইঅক্সাইডের ভূমিকা এক্ষেত্রে অন্যান্য গ্যাসের চেয়ে অনেক বেশি। তোমরা ইতোমধ্যে জেনেছ, জ্বালানি পোড়ানোর ফলে সৃষ্ট গ্যাসগুলো এসিড বৃষ্টি সৃষ্টি করে। এছাড়া তোমরা জেনেছ যে জ্বালানি পোড়ানোর ফলে সৃষ্ট গ্যাসগুলো ফটোকেমিক্যাল ধোঁয়াও সৃষ্টি করছে।

৮.২.৬ ইথানলকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার

ইথানলের অপর নাম ইথাইল অ্যালকোহল। এর রাসায়নিক সংকেত CH_3-CH_2-OH। জীবাশ্ম জ্বালানি যেমন কেরোসিন, ডিজেল, পেট্রল প্রভৃতির মতো ইথানলকে পোড়ালেও তাপ উৎপন্ন হয়। তাই জীবাশ্ম জ্বালানির মতো ইথানলকেও তাপ ইঞ্জিনে ব্যবহার করে কলকারখানা, গাড়ি, বিমান, জাহাজ প্রভৃতি চালানো যেতে পারে। উত্তর আমেরিকাসহ অনেক দেশে জীবাশ্ম জ্বালানির সাথে ইথানলকে মিশিয়ে তাপ ইঞ্জিনে ব্যবহার করা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের সব গাড়িতে পেট্রলের সাথে শতকরা 10 ভাগ ইথানল মিশিয়ে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তাই আমরা যত ইথানলকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করব ততই জীবাশ্ম জ্বালানির উপর চাপ কমবে।

৮.৩ তড়িৎ-রাসায়নিক প্রক্রিয়া (Electro-chemical process)

৮.৩.১ তড়িৎ রাসায়নিক কোষ (Electrochemical cell)

জ্বালানি পুড়িয়ে যেমন রাসায়নিক শক্তিকে তাপশক্তিতে রূপান্তরিত করা হয় তেমনি এই তাপশক্তিকে আবার বিদ্যুৎ শক্তিতে পরিণত করা যায়। এবার আমরা জানব কীভাবে রাসায়নিক শক্তিকে সরাসরি বিদ্যুৎ শক্তিতে এবং বিদ্যুৎ শক্তিকে ব্যবহার করে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটানো যায়। যে যন্ত্রের সাহায্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে রাসায়নিক শক্তিকে সরাসরি বিদ্যুৎ শক্তিতে অথবা বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহার করে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটানো হয় তাকে তড়িৎ রাসায়নিক কোষ বলে। তড়িৎ রাসায়নিক কোষে একই বা দুইটি ভিন্ন তড়িৎ বিশ্লেষ্যের দ্রবণে দুইটি ধাতব দণ্ড বা একটি ধাতব দণ্ড ও একটি গ্রাফাইট দণ্ড আংশিক ডুবানো থাকে। অতঃপর দণ্ড দুটিকে একটি ধাতব তার দিয়ে সরাসরি বা ব্যাটারির মাধ্যমে সংযোগ দেওয়া হয়। কোষে ব্যবহৃত ধাতব দণ্ড বা গ্রাফাইট দণ্ডকে তড়িৎদ্বার বা ইলেকট্রোড (Electrode) বলা হয়।

তড়িৎ রাসায়নিক কোষ দুই প্রকার। যথা-

(i) **তড়িৎ বিশ্লেষ্য কোষ (Electrolytic Cell):** যে কোষে বাইরের কোনো উৎস থেকে তড়িৎ প্রবাহিত করে কোষের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটানো যায় সেই কোষকে তড়িৎ বিশ্লেষ্য কোষ বলে।

(ii) **গ্যালভানিক কোষ (Gavlanic Cell):** যে কোষে রাসায়নিক পদার্থসমূহ বিক্রিয়া করে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করে সেই কোষকে গ্যালভানিক কোষ বলা হয়।

বিদ্যুৎ পরিবাহী (Conductor)

যে সকল পদার্থ বিদ্যুৎ পরিবহণ করতে পারে তাদেরকে বিদ্যুৎ পরিবাহী পদার্থ বলে। যেমন– ধাতু, গ্রাফাইট, গলিত লবণ, লবণের দ্রবণ, এসিড ও ক্ষারের দ্রবণ প্রভৃতি বিদ্যুৎ পরিবাহীর উদাহরণ।

বিদ্যুৎ পরিবহণের কৌশলের উপর নির্ভর করে বিদ্যুৎ পরিবাহী দুই প্রকার হতে পারে। যথা: (i) ইলেকট্রনীয় বিদ্যুৎ পরিবাহী এবং (ii) তড়িৎ বিশ্লেষ্য বিদ্যুৎ পরিবাহী।

ইলেকট্রনীয় বিদ্যুৎ পরিবাহী (Electronic Conductor)

যেসব পদার্থে ইলেকট্রনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ পরিবাহিত হয় সেসব পরিবাহীকে ইলেকট্রনীয় বিদ্যুৎ পরিবাহী বলে। তোমরা জানো ধাতুর মধ্যে ধাতব বন্ধন বিদ্যমান। এখানে প্রচুর পরিমাণে মুক্ত ইলেকট্রন থাকে। গ্রাফাইটেও মুক্ত ইলেকট্রন থাকে। এসব পদার্থে ইলেকট্রনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ পরিবাহিত হয়। তাই এসব পরিবাহীকে ইলেকট্রনীয় বিদ্যুৎ পরিবাহী বলে। যেমন– লোহা (Fe), কপার (Cu), নিকেল (Ni), গ্রাফাইট ইত্যাদি ইলেকট্রনীয় বিদ্যুৎ পরিবাহী।

২০২৩

তড়িৎ বিশ্লেষ্য (Electrolyte)

যেসব পদার্থ কঠিন অবস্থায় বিদ্যুৎ পরিবহণ করে না কিন্তু গলিত বা দ্রবীভূত অবস্থায় বিদ্যুৎ পরিবহণ করে এবং বিদ্যুৎ পরিবহণের সাথে সাথে ঐ পদার্থের রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটায় তাদেরকে তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ বলে। তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ গলিত বা দ্রবীভূত অবস্থায় আয়নিত হয় থাকে। এই আয়নের মাধ্যমে তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ বিদ্যুৎ পরিবহণ করে। আয়নিক যৌগ এবং কিছু পোলার সমযোজী যৌগ গলিত বা দ্রবীভূত অবস্থায় তড়িৎ বিশ্লেষ্য পরিবাহী হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সোডিয়াম ক্লোরাইড ($NaCl$), কপার সালফেট ($CuSO_4$), সালফিউরিক এসিড (H_2SO_4), ইথানয়িক এসিড (CH_3COOH) ইত্যাদি গলিত বা দ্রবীভূত অবস্থায় বিদ্যুৎ পরিবহণ করে।

তড়িৎ বিশ্লেষ্য আবার দুই প্রকার। যথা:

(i) তীব্র তড়িৎ বিশ্লেষ্য (Strong Electrolyte): যে সকল তড়িৎ বিশ্লেষ্য দ্রবণে বা গলিত অবস্থায় সম্পূর্ণরূপে আয়নিত হয় তাদেরকে তীব্র তড়িৎ বিশ্লেষ্য বলে। যেমন–সোডিয়াম ক্লোরাইড ($NaCl$), কপার সালফেট ($CuSO_4$), সালফিউরিক এসিড (H_2SO_4) ইত্যাদি।

(ii) মৃদু তড়িৎ বিশ্লেষ্য (Weak Electrolyte): যে সকল তড়িৎ বিশ্লেষ্য দ্রবণে খুব অল্প পরিমাণে আয়নিত হয় থাকে তাদেরকে মৃদু তড়িৎ বিশ্লেষ্য বলে। যেমন- অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড, ইথানয়িক এসিড (CH_3COOH) ইত্যাদি।

তড়িৎদ্বার (Electrode)

তড়িৎ রাসায়নিক কোষে বিগলিত বা দ্রবীভূত তড়িৎ বিশ্লেষ্যের মধ্যে যে দুটি ইলেকট্রনীয় পরিবাহী অর্থাৎ ধাতব দণ্ড বা গ্রাফাইট দণ্ড অর্ধেক ডুবানো থাকে তাদেরকে তড়িৎদ্বার বলা হয়। তড়িৎ রাসায়নিক কোষে একটি তড়িৎদ্বারে পরমাণু বা ঋণাত্মক আয়ন ইলেকট্রন ত্যাগ করে। অর্থাৎ এ তড়িৎদ্বারে জারণ বিক্রিয়া সংঘটিত হয়। অপর তড়িৎ দ্বারে ধনাত্মক আয়ন ইলেকট্রন গ্রহণ করে। অর্থাৎ এ তড়িৎদ্বারে বিজারণ বিক্রিয়া সংঘটিত হয় এবং সম্পূর্ণ কোষের মধ্যে জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া সংঘটিত হয়। যে তড়িৎদ্বারে জারণ বিক্রিয়া ঘটে তাকে অ্যানোড তড়িৎদ্বার আর যে তড়িৎদ্বারে বিজারণ বিক্রিয়া ঘটে তাকে ক্যাথোড তড়িৎদ্বার বলে।

৮.৩.২ তড়িৎ বিশ্লেষ্য কোষ, তড়িৎ বিশ্লেষণ ও তড়িৎ বিশ্লেষণের কৌশল

তড়িৎ বিশ্লেষ্য কোষে (Electrolytic cell) বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহার করে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটানো হয়। গলিত বা দ্রবীভূত অবস্থায় তড়িৎ বিশ্লেষ্যের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ পরিবহণের সময় উক্ত তড়িৎ বিশ্লেষ্যের যে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে তাকে তড়িৎ বিশ্লেষণ (Electrolysis) বলা হয়।

যেমন–গলিত সোডিয়াম ক্লোরাইডের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ চালনা করলে অ্যানোডে ক্লোরিন গ্যাস আর ক্যাথোডে সোডিয়াম ধাতু উৎপন্ন হয়। একে সোডিয়াম ক্লোরাইডের তড়িৎ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া বলে।

$$2NaCl(l) \longrightarrow 2Na(s) + Cl_2(g)$$

গলিত সোডিয়াম ক্লোরাইডের তড়িৎ বিশ্লেষণের কৌশল

একটি কাচ বা চিনামাটির পাত্রে গলিত সোডিয়াম ক্লোরাইড নেওয়া হয়। গলিত সোডিয়াম ক্লোরাইডের মধ্যে সোডিয়াম আয়ন (Na^+) ও ক্লোরাইড (Cl^-) আয়ন থাকে। তরল পদার্থের অন্যান্য কণার মতো সোডিয়াম আয়ন ও ক্লোরাইড আয়ন চলাচল (migrate) করতে পারে। গলিত সোডিয়াম ক্লোরাইডের মধ্যে দুটি ধাতব দণ্ড বা গ্রাফাইট দণ্ড অর্ধেক ডুবানো হয়। এ দণ্ড দুটির একটিকে ব্যাটারির ধনাত্মক প্রান্তে এবং অপরটিকে ব্যাটারির ঋণাত্মক প্রান্তের সাথে যুক্ত করলে ব্যাটারির ধনাত্মক প্রান্তের সাথে যুক্ত ধনাত্মক তড়িৎদ্বার বা অ্যানোড ঋণাত্মক আধান যুক্ত Cl^- আয়নকে আকর্ষণ করবে, অন্যদিকে ব্যাটারির ঋণাত্মক প্রান্তের সাথে যুক্ত ঋণাত্মক তড়িৎদ্বার বা ক্যাথোড ধনাত্মক আধানযুক্ত Na^+ আয়নকে আকর্ষণ করবে। Cl^- আয়ন অ্যানোডে ইলেকট্রন ত্যাগ করে ক্লোরিন গ্যাসে পরিণত হয়।

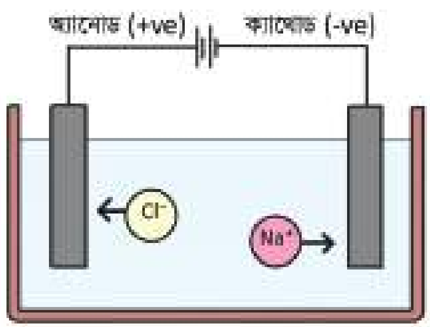

চিত্র ৮.০৪: তড়িৎ বিশ্লেষ্য কোষে সোডিয়াম ক্লোরাইডের তড়িৎ বিশ্লেষণ

অ্যানোডে জারণ বিক্রিয়া:

$$Cl^- \longrightarrow \frac{1}{2}Cl_2 + e^-$$

অন্যদিকে Na^+ ক্যাথোড থেকে ইলেকট্রন গ্রহণ করে ধাতব সোডিয়ামে পরিণত হয়।

ক্যাথোডে বিজারণ বিক্রিয়া:

$$Na^+ + e^- \longrightarrow Na$$

ক্যাথোড কর্তৃক যে আয়ন আকর্ষিত হয় তাকে ক্যাটায়ন বলে এবং অ্যানোড কর্তৃক যে আয়ন আকর্ষিত হয় তাকে অ্যানায়ন বলে।

লিটমাস পেপারের সাহায্যে অ্যানোডের ক্লোরিন গ্যাস শনাক্তকরণ

গলিত NaCl এর তড়িৎ বিশ্লেষণের সময় অ্যানোডে উৎপন্ন গ্যাস একটি টেস্টটিউবে সংগ্রহ করে তার মুখে ভিজা নীল লিটমাস পেপার ধরলে লিটমাস পেপারের বর্ণ লাল বর্ণে পরিণত হবে এবং ক্লোরিন গ্যাসের উপস্থিতি প্রমাণ করবে।

$$Cl_2 + H_2O \longrightarrow HCl + HOCl$$
ক্লোরিন   পানি   হাইড্রোক্লোরিক এসিড   হাইপোক্লোরাস এসিড

যেহেতু ক্লোরিন পানির সাথে বিক্রিয়া করে হাইড্রোক্লোরিক এসিড এবং হাইপোক্লোরাস এসিড উৎপন্ন করে তাই নীল লিটমাস লাল লিটমাসে পরিণত হয়।

গাঢ় NaCl দ্রবণের তড়িৎ বিশ্লেষণ

গাঢ় সোডিয়াম ক্লোরাইডের দ্রবণে NaCl আয়নিত হয়ে Na^+ ও Cl^- আয়ন উৎপন্ন করে।

$$NaCl \longrightarrow Na^+ + Cl^-$$
সোডিয়াম ক্লোরাইড   সোডিয়াম আয়ন   ক্লোরাইড আয়ন

গলিত সোডিয়াম ক্লোরাইডের মতো এখানে শুধু এ দুটি আয়নই থাকে না। এখানে পানির অণুও সামান্য পরিমাণে আয়নিত হয়ে H^+ এবং OH^- তৈরি করে।

$$H_2O \longrightarrow H^+ + OH^-$$
পানি   হাইড্রোজেন আয়ন   হাইড্রোক্সাইড আয়ন

তড়িৎ বিশ্লেষ্য কোষে সোডিয়াম ক্লোরাইডের তড়িৎ বিশ্লেষণের সময় বিদ্যুৎ প্রবাহকালে Na^+ ও H^+ একই সাথে ক্যাথোডের দিকে যাবে। আমরা জানি, Na^+ আয়নের চেয়ে H^+ আয়নের ইলেকট্রন গ্রহণ করার প্রবণতা বেশি তাই ক্যাথোডে H^+ একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে H পরমাণুতে পরিণত হয়। দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু পরস্পর যুক্ত হয়ে H_2 অণু উৎপন্ন করে।

ক্যাথোড তড়িৎদ্বারে বিক্রিয়া

$$H^+ + e^- \rightarrow H \text{ (বিজারণ ক্রিয়া)}$$
$$H + H \rightarrow H_2$$

অ্যানোডে একই সাথে Cl^- ও OH^- যায়। আমরা জানি OH^- এর ইলেকট্রন দানের প্রবণতা Cl^- আয়নের চেয়ে বেশি থাকলেও দ্রবণে Cl^- আয়নের ঘনমাত্রা OH^- আয়নের ঘনমাত্রার চেয়ে অনেক বেশি বলে OH^- এর চেয়ে Cl^- আয়ন আগে অ্যানোডে ইলেকট্রন ত্যাগ করে। একটি Cl^- আয়ন অ্যানোড তড়িৎদ্বারে একটি ইলেকট্রন ত্যাগ করে একটি Cl পরমাণুতে পরিণত হয়। দুটি ক্লোরিন পরমাণু একসাথে যুক্ত হয়ে Cl_2 অণু উৎপন্ন করে।

অ্যানোড তড়িৎদ্বারে বিক্রিয়া

$$Cl^- \rightarrow Cl + e^- \text{ (জারণ ক্রিয়া)}$$
$$Cl + Cl \rightarrow Cl_2$$

পাত্রে Na^+ ও OH^- থেকে যায়। ফলে Na^+ ও OH^-একত্র হয়ে NaOH ক্ষার উৎপন্ন করে।

এভাবে কোনো দ্রবণে একের অধিক প্রকারের ক্যাটায়ন ও অ্যানায়ন উপস্থিত থাকলে ক্যাথোডে কোন ক্যাটায়ন আগে গিয়ে চার্জমুক্ত হবে বা অ্যানোডে কোন অ্যানায়ন আগে গিয়ে চার্জমুক্ত হবে তা তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। যেমন-

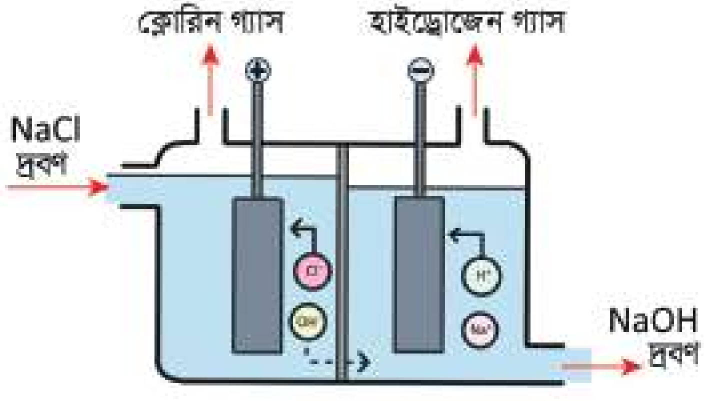

চিত্র ৮.০৫: সোডিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণের তড়িৎ বিশ্লেষণ

(i) ক্যাটায়ন বা অ্যানায়নের চার্জমুক্ত হওয়ার প্রবণতা

তড়িৎ বিশ্লেষণের সময় দ্রবণে একের অধিক প্রকার ক্যাটায়ন থাকলে ক্যাটায়নসমূহের মধ্যে কোনটি আগে ক্যাথোডে গিয়ে ইলেকট্রন গ্রহণ করে চার্জমুক্ত হবে, কোনটি পরে ইলেকট্রন গ্রহণ করে চার্জমুক্ত হবে তার উপর ভিত্তি করে ক্যাটায়নসমূহকে একটি সারণিতে সাজানো হয়েছে। এই সারণিকে ধাতুর সক্রিয়তা সিরিজ বা ধাতুর তড়িৎ রাসায়নিক সারি বলা হয়। এই সারির যেকোনো দুটি মৌলের মধ্যে যে ধাতুটি উপরে অবস্থিত সেই ধাতুটি অধিক সক্রিয় অর্থাৎ সেই ধাতুটি দ্রুত বিক্রিয়া করে। আবার, এই সারির যেকোনো দুটি মৌলের আয়নের মধ্যে যে আয়নটির অবস্থান নিচে অবস্থিত সেটি আগে ইলেকট্রন গ্রহণ করে আগে চার্জমুক্ত হবে অর্থাৎ আগে বিজারিত হবে। যেমন– Na^+ এবং H^+ এর মধ্যে H^+ এর অবস্থান সারির নিচে অবস্থিত কাজেই H^+ আগে ইলেকট্রন গ্রহণ করে চার্জমুক্ত হবে অর্থাৎ আগে বিজারিত হবে। আবার, Zn^{2+} এবং Fe^{2+} এর মধ্যে তড়িৎ রাসায়নিক সারিতে Fe^{2+} এর অবস্থান নিচে কাজেই Fe^{2+} আগে ইলেকট্রন গ্রহণ করে চার্জমুক্ত হবে অর্থাৎ আগে বিজারিত হবে।

টেবিল ৮.০২: তড়িৎ রাসায়নিক সারণি

ক্যাটায়ন	অ্যানায়ন
Li^+	NO_3^-
K^+	SO_4^{2-}
Na^+	Cl^-
Mg^{2+}	Br^-
Al^{3+}	I^-
Zn^{2+}	OH^-
Fe^{2+}	
Sn^{2+}	
Pb^{2+}	
H^+	
Cu^{2+}	
Ag^+	
Au^{3+}	

অনুরূপভাবে তড়িৎ বিশ্লেষণের সময় একের অধিক অ্যানায়ন থাকলে

অ্যানোডের অ্যানায়নসমূহের মধ্যে কোনটি আগে ইলেকট্রন ত্যাগ করে চার্জমুক্ত হবে, কোনটি পরে ইলেকট্রন ত্যাগ করে চার্জমুক্ত হবে তার উপর ভিত্তি করে অ্যানায়নসমূহকেও আরও একটি সারণিতে সাজানো হয়েছে। এই সারণিকে অ্যানায়নের তড়িৎ রাসায়নিক সারি বলা হয়। এই সারিতে যেকোনো দুটি আয়নের মধ্যে যে আয়নটি নিচে অবস্থিত সেটি আগে ইলেকট্রন ত্যাগ করে চার্জমুক্ত হবে অর্থাৎ আগে জারিত হবে। যেমন: SO_4^{2-} এবং Cl^- এর মধ্যে Cl^- সারির নিচে অবস্থিত। কাজেই Cl^- আগে ইলেকট্রন ত্যাগ করে চার্জমুক্ত হবে অর্থাৎ আগে জারিত হবে। আবার, Cl^- এবং OH^- এর মধ্যে OH^- তড়িৎ রাসায়নিক সারির নিচে অবস্থিত। কাজেই OH^- আগে ইলেকট্রন ত্যাগ করে চার্জমুক্ত হবে অর্থাৎ আগে জারিত হবে।

(ii) ক্যাটায়ন ও অ্যানায়নের ঘনমাত্রার প্রভাব

দ্রবণে একের অধিক ক্যাটায়ন বা অ্যানায়ন থাকলে চার্জমুক্ত হওয়ার প্রবণতার চেয়ে ঘনমাত্রার প্রভাব অনেক বেশি কার্যকর হয়। যেমন– কক্ষ তাপমাত্রায় 0.1 মোলার NaCl এর জলীয় দ্রবণে অ্যানায়ন Cl^- এর ঘনমাত্রা হবে 0.1 মোলার। অন্যদিকে, পানির বিয়োজনে উৎপন্ন OH^- আয়নের ঘনমাত্রা হবে 10^{-7} মোলার। অর্থাৎ Cl^- আয়নের ঘনমাত্রা OH^- আয়নের ঘনমাত্রার চেয়ে 10^6 গুণ বেশি। চার্জমুক্ত হবার প্রবণতার সারিতে OH^- আয়নের অবস্থান Cl^- আয়নের নিচে হওয়ায় OH^- আয়নের আগে চার্জমুক্ত হবার প্রবণতা বেশি। কিন্তু Cl^- আয়নের ঘনমাত্রা বেশি হওয়ায় Cl^- আয়ন আগে চার্জমুক্ত হয়।

(iii) তড়িৎদ্বারের প্রকৃতি

তড়িৎবিশ্লেষ্য কোষে তড়িৎদ্বারের প্রকৃতি অনেক সময় চার্জমুক্ত হওয়ার জন্য উপরের দুইটি নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটায়। তোমরা দেখেছ NaCl এর জলীয় দ্রবণে দুই ধরনের ক্যাটায়ন থাকে। একটি Na^+ আয়ন, অপরটি H^+ আয়ন। যদি প্লাটিনাম তড়িৎদ্বার ব্যবহার করা হয় তবে চার্জমুক্ত হবার প্রবণতা অনুযায়ী ক্যাথোডে H^+ আয়ন আগে চার্জমুক্ত হয়ে H_2 গ্যাস উৎপন্ন হয়। আর যদি পারদকে ক্যাথোডরূপে ব্যবহার করা হয় তবে Na^+ আয়ন আগে চার্জমুক্ত হয়।

বিশুদ্ধ পানির তড়িৎ বিশ্লেষণ

বিশুদ্ধ পানিকে তড়িৎ বিশ্লেষণ করতে তড়িৎ বিশ্লেষণ কোষে নিষ্ক্রিয় ধাতুর অ্যানোড ও ক্যাথোড ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে প্লাটিনাম ধাতুর পাত অ্যানোড ও ক্যাথোড হিসেবে ব্যবহার করা হয়। পানি সামান্য পরিমাণে নিম্নরূপে আয়নিত অবস্থায় থাকে:

$$4H_2O \rightleftharpoons 4H^+ + 4OH^-$$

পানির বিয়োজন মাত্রা বৃদ্ধি করার জন্য পানিতে কয়েক ফোঁটা সালফিউরিক এসিড যোগ করা হয়।

এখন ব্যাটারির মাধ্যমে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করলে অ্যানোড হাইড্রোক্সিল আয়ন (OH^-) কে আকর্ষণ করে আর ক্যাথোড হাইড্রোজেন আয়নকে (H^+) আকর্ষণ করে। তড়িৎদ্বার দুইটিতে নিম্নরূপ বিক্রিয়া ঘটে।

ক্যাথোড তড়িৎদ্বারে বিক্রিয়া: $4H^+ + 4e^- \rightarrow 2H_2$ (বিজারণ ক্রিয়া)

অ্যানোড তড়িৎদ্বারে বিক্রিয়া: $4OH^- \rightarrow O_2 + 2H_2O + 4e^-$ (জারণ ক্রিয়া)

অর্থাৎ ক্যাথোডে হাইড্রোজেন গ্যাস আর অ্যানোডে অক্সিজেন গ্যাস উৎপন্ন হয়।

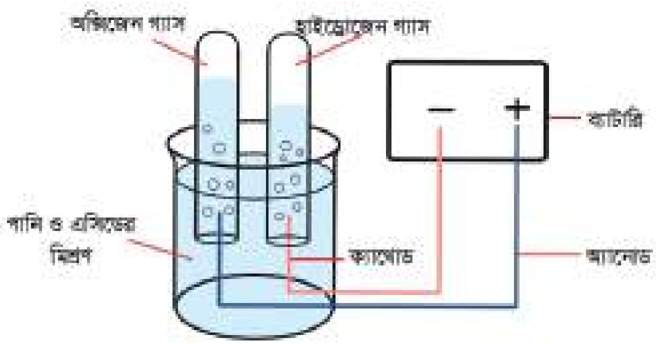

চিত্র ৮.০৬: পানির তড়িৎ বিশ্লেষণ

তোমরা হয়তো ভাবছ এখানে কয়েক ফোঁটা সালফিউরিক এসিড কেন ব্যবহার করা হলো? তোমরা জানো একটি পূর্ণ বর্তনী তৈরি না হলে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় না। অ্যানোড, ক্যাথোড বা ব্যাটারির মধ্যে ইলেকট্রনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। কিন্তু তরলের মধ্যে আয়নের মাধ্যমে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। পানি খুবই অল্প পরিমাণে আয়নিত হয়। তাই বিশুদ্ধ পানি বিদ্যুৎ অপরিবাহীর মতো আচরণ করে। বিদ্যুৎ পরিবাহিতা বাড়াতে তাই সামান্য পরিমাণ সালফিউরিক এসিড ব্যবহার করা হয়।

৮.৩.৩ তড়িৎ বিশ্লেষণের ব্যবহার

বর্তমানে সমস্ত পৃথিবীতে শিল্পকারখানার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। আর শিল্পজগতে তড়িৎ বিশ্লেষেণের ভূমিকা বলে শেষ করা যাবে না। অনেক মূল্যবান যৌগের উৎপাদনে, আকরিক থেকে ধাতু নিষ্কাশনে, অবিশুদ্ধ ধাতুকে বিশুদ্ধ ধাতুতে পরিণত করতে, যে সকল ধাতু সহজে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় তাদের ক্ষয় থেকে রক্ষা করতে, লোহার উপর মরিচা পড়া ঠেকাতে, এক ধাতুর উপর অন্য ধাতুর প্রলেপ দিতে তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় আর তড়িৎ বিশ্লেষণ করতে তড়িৎ বিশ্লেষ্য কোষ ব্যবহার করা হয়। নিচে তড়িৎ বিশ্লেষণের কিছু ব্যবহার দেখানো হলো।

ধাতু নিষ্কাশন: ক্ষার ধাতু, মৃৎক্ষার ধাতু, অ্যালুমিনিয়াম ধাতু প্রভৃতি সক্রিয় ধাতুসমূহ তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে নিষ্কাশন করা হয়। সাধারণত এ সকল ধাতুর যৌগের তরলে অথবা দ্রবণে তড়িৎদ্বার ব্যবহার করে বিদ্যুৎ প্রবাহ চালনা করলে ক্যাথোডে ধাতু নিষ্কাশিত হয়। যেমন– গলিত সোডিয়াম

ক্লোরাইডের তড়িৎ বিশ্লেষণের সময় ক্যাথোডে সোডিয়াম ধাতু এবং অ্যানোডে ক্লোরিন গ্যাস (Cl_2) পাওয়া যায়।

গলিত বিশুদ্ধ অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড বা অ্যালুমিনা (Al_2O_3) এর তড়িৎ বিশ্লেষণ করলে ক্যাথোডে অ্যালুমিনিয়াম ধাতু ও অ্যানোডে অক্সিজেন গ্যাস উৎপন্ন হয়।

$$Al_2O_3 \rightleftharpoons 2Al^{3+} + 3O^{2-}$$

অ্যানোডে বিক্রিয়া: $3O^{2-} \rightarrow \frac{3}{2} O_2 + 6e^-$

ক্যাথোডে বিক্রিয়া: $2Al^{3+} + 6e^- \rightarrow 2Al$

ধাতু বিশুদ্ধকরণ: আকরিক থেকে ধাতু নিষ্কাশনের পর প্রাপ্ত ধাতুতে যথেষ্ট পরিমাণে ভেজাল দ্রব্য মিশ্রিত থাকে। এ সকল ধাতুকে বিশুদ্ধ করতে তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতি অত্যন্ত কার্যকর। কপার, জিংক, লেড, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি ধাতুকে বিশুদ্ধকরণের জন্য তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। যে ভেজাল মিশ্রিত ধাতু থেকে ভেজাল অপসারণ করে আমরা বিশুদ্ধ ধাতু তৈরি করতে চাই সেই ভেজাল মিশ্রিত ধাতুর দণ্ডকে ব্যাটারির ধনাত্মক প্রান্তের সাথে যুক্ত করা হয়। যে ধাতুকে বিশুদ্ধ করতে চাই ঐ ধাতুর একটি বিশুদ্ধ দণ্ড ব্যাটারির ঋণাত্মক প্রান্তের সাথে যুক্ত করা হয়। এরপর তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করলে ভেজাল মিশ্রিত অবিশুদ্ধ ধাতুর দণ্ড থেকে ধাতব আয়ন দ্রবণে চলে যায় এবং দ্রবণ থেকে ঐ ধাতব আয়ন বিশুদ্ধ ধাতব দণ্ডে জমা পড়ে, ফলে ব্যাটারির ঋণাত্মক প্রান্তের সাথে যুক্ত বিশুদ্ধ ধাতব দণ্ড মোটা হতে থাকে। তড়িৎ বিশ্লেষণ চলাকালে একদিকে ভেজাল মিশ্রিত অবিশুদ্ধ ধাতব দণ্ড ক্ষয় হতে থাকে, অন্যদিকে বিশুদ্ধ ধাতব দণ্ড মোটা হতে থাকে।

ইলেকট্রোপ্লেটিং বা তড়িৎ প্রলেপন: তড়িৎ বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি ধাতুর উপর অন্য একটি ধাতুর প্রলেপ দেওয়াকে ইলেকট্রোপ্লেটিং বলে। ধাতুর উজ্জ্বলতা সৃষ্টির জন্য অথবা ধাতুর ক্ষয়রোধ করতে ইলেকট্রোপ্লেটিং পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। কোনো ধাতুর উজ্জ্বলতা সৃষ্টির জন্য অন্য একটি উজ্জ্বল ধাতুর প্রলেপ দেওয়া হয়। কারণ কম সক্রিয় ধাতু বাতাসের অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে না। কোনো ধাতুর ক্ষয়রোধ করতে ঐ ধাতুর উপর অপেক্ষাকৃত কম সক্রিয় অন্য ধাতুর প্রলেপ দেওয়া হয়। ইলেকট্রোপ্লেটিংয়ের জন্য সাধারণত নিকেল, ক্রোমিয়াম ইত্যাদি ধাতু ব্যবহার করা হয়। লোহা জলীয় বাষ্প এবং বায়ুর সংস্পর্শে এলে মরিচা ধরে এবং ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। লোহার উপর নিকেল, ক্রোমিয়াম ও সিলভার ধাতুর প্রলেপ দেওয়া হয়। ফলে লোহা বাতাস ও জলীয় বাষ্পের সংস্পর্শে আসতে পারে না ফলে এতে মরিচাও পড়ে না। লোহার তৈরি কোনো জিনিসের উপর প্রলেপ দেওয়ার কৌশল নিচে আলোচনা করা হলো।

২০২৫

লোহার তৈরি কোনো জিনিস যেমন, চামচের উপর সিলভারের প্রলেপ দিতে $AgNO_3$ দ্রবণ একটি বিকারে নেওয়া হয়। যে জিনিসের উপর প্রলেপ দিতে হবে তাকে ব্যাটারির ঋণাত্মক প্রান্তের সাথে যুক্ত করে ক্যাথোড তড়িৎদ্বার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। সিলভার ধাতুর পাত অ্যানোড হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ব্যাটারি দ্বারা দ্রবণে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করলে অ্যানোড হিসেবে যে সিলভারের পাত ব্যবহার করা হয় সেই সিলভার পাত থেকে ধাতব Ag পরমাণু একটি ইলেকট্রন ত্যাগ করে Ag^+ আয়নে পরিণত হয়ে দ্রবণে চলে যায় এবং দ্রবণের Ag^+ আয়ন ক্যাথোড তড়িৎদ্বার থেকে ইলেকট্রন গ্রহণ করে ধাতব সিলভারে পরিণত হয়ে ক্যাথোডে জমা হয়। এতে লোহার তৈরি জিনিসের উপর সিলভারের প্রলেপ পড়ে।

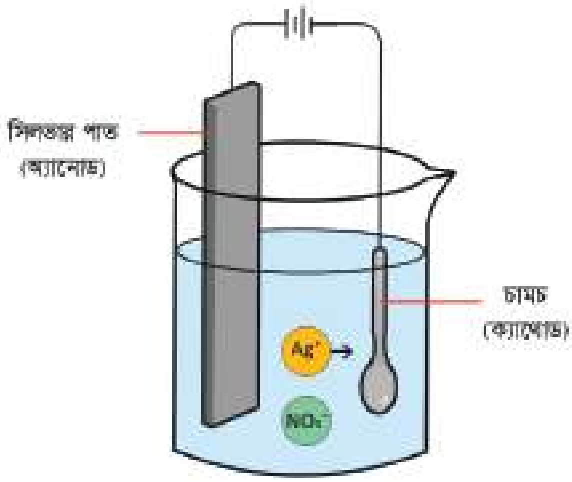

চিত্র ৮.০৭: চামচের উপর সিলভারের ইলেকট্রোপ্লেটিং

দ্রবণে $AgNO_3$ এর বিয়োজন: $AgNO_3 \rightarrow Ag^+ + NO_3^-$

অ্যানোডে জারণ বিক্রিয়া: $Ag \rightarrow Ag^+ + e^-$

ক্যাথোডে বিজারণ বিক্রিয়া: $Ag^+ + e^+ \rightarrow Ag$

তড়িৎ বিশ্লেষণে উৎপাদিত পদার্থের বাণিজ্যিক ব্যবহার

তড়িৎ বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা অনেক কিছু করতে পারি। বিভিন্ন সক্রিয় ধাতুর নিষ্কাশন থেকে শুরু করে অনেক মূল্যবান যৌগ ও মৌলের উৎপাদন, এক ধাতুর উপর অন্য ধাতুর প্রলেপ দিয়ে তার ক্ষয় রোধ করা, উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করাসহ আরও অনেক কিছু।

তড়িৎ বিশ্লেষণের মাধ্যমে আকরিক থেকে বিভিন্ন ধাতু যেমন- সোডিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম, দস্তা, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম প্রভৃতি নিষ্কাশন করা হয়। এছাড়া তামা, সোনা, রুপা এর বিশুদ্ধ করতে এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। আধুনিক বিশ্বে এসব ধাতুর ব্যবহার অপরিসীম।

আমরা জানি, রুপা ও তামার বৈদ্যুতিক রোধ সবচেয়ে কম। কিন্তু রুপার দাম অনেক বেশি। তাই বৈদ্যুতিক তার তৈরিতে তামা ব্যবহার করা হয়। তোমরা কি চিন্তা করতে পারো সারা বিশ্বে কত বৈদ্যুতিক তার ব্যবহার করা হচ্ছে? অ্যালুমিনিয়াম অতি প্রয়োজনীয় ধাতু। এ ধাতু দিয়ে বিভিন্ন থালাবাসন তৈরি করা হয়ে থাকে। তাছাড়া অ্যালুমিনিয়াম হালকা ধাতু বলে বিমান তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। লোহার উপর মরিচা পড়া ঠেকাতে লোহার উপর দস্তার প্রলেপ দেওয়া হয়।

এতে লোহার স্থায়িত্বও বৃদ্ধি পায়। অল্প দামি ধাতুর গয়নার উপর উজ্জ্বল ধাতু যেমন- ক্রোমিয়াম, নিকেল, সোনা, রুপা প্রভৃতি ধাতুর প্রলেপ দেওয়া হয়। এতে গয়না অনেক উজ্জ্বল ও মসৃণ হয়।

সমুদ্রের পানির তড়িৎ বিশ্লেষণে উৎপন্ন ক্লোরিন জীবাণুনাশক হিসেবে এবং সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ক্ষার বিভিন্ন শিল্পে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

৮.৪ রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন (Production of Electricity by Chemical Reaction)

গ্যালভানিক কোষ বা ভোল্টায়িক কোষ (Galvanic Cell or Voltaic Cell)

গ্যালভানিক বা ভোল্টায়িক কোষ হলো সেই সকল কোষ, যেখানে কোষের ভিতরের পদার্থসমূহের রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করা হয়। গ্যালভানিক কোষে সাধারণত ভিন্ন মৌল দিয়ে তৈরি দুটো ইলেকট্রোডকে দুটি ভিন্ন পাত্রের তড়িৎ বিশ্লেষ্যের দ্রবণের মধ্যে আংশিকভাবে ডুবানো থাকে। তড়িৎদ্বার দুইটির মধ্যে অধিক সক্রিয় ধাতুর ইলেকট্রোড অ্যানোড আর কম সক্রিয় ধাতুর ইলেকট্রোড ক্যাথোড হিসেবে কাজ করে।

গ্যালভানিক বা ভোল্টায়িক কোষে একটি তড়িৎদ্বার যে ধাতু দিয়ে তৈরি তড়িৎদ্বারটিকে সেই ধাতুর কোনো লবণের দ্রবণে (তড়িৎ বিশ্লেষ্যে) রাখতে হয়। যাতে তড়িৎ বিশ্লেষ্যে ঐ ধাতুর আয়ন থাকে। যেমন- কপার ধাতুর দণ্ড দিয়ে যদি তড়িৎদ্বার তৈরি করা হয় তবে ঐ দণ্ডকে $CuSO_4$ তড়িৎ বিশ্লেষ্যের দ্রবণে রাখা হয়। আবার, জিংক ধাতুর দণ্ড দিয়ে যদি তড়িৎদ্বার তৈরি করা হয় তবে ঐ দণ্ডকে $ZnSO_4$ তড়িৎ বিশ্লেষ্যের দ্রবণে রাখা হয়। তড়িৎদ্বার দুটিকে বাইরে থেকে ধাতব তার দিয়ে সংযোগ করলে এক তড়িৎদ্বার থেকে অপর তড়িৎদ্বারে ইলেকট্রন প্রবাহিত হয় অর্থাৎ বিদ্যুৎ প্রবাহের সৃষ্টি হয়। দুইটি তড়িৎ বিশ্লেষ্যের দ্রবণের মধ্যে U আকৃতির লবণ সেতু স্থাপন করা হয়। U আকৃতির একটি কাচনলে KCl লবণের দ্রবণ থাকে। গ্যালভানিক কোষের অ্যানোড, ক্যাথোড, তড়িৎদ্বারে বিক্রিয়া, লবণ সেতুর ভূমিকা এগুলো ভালোভাবে বুঝানোর জন্য এখানে ডেনিয়েল কোষের গঠন আলোচনা করা হলো।

ডেনিয়েল কোষ (Daniell cell)

জন ফ্রেডরিক ডেনিয়েল 1836 সালে এ কোষটি প্রথম আবিষ্কার করেন। তাঁর সম্মানে এ কোষকে ডেনিয়েল কোষ বলে। দুইটি কাচ বা চিনামাটির পাত্রের একটিতে জিংক সালফেট দ্রবণ এবং অপরটিতে কপার সালফেট দ্রবণ নেওয়া হয়। জিংক সালফেট দ্রবণে জিংক দণ্ড আর কপার সালফেট দ্রবণে কপারের দণ্ড আংশিক ডুবানো হয়। পাত্র দুইটির দ্রবণের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য 8.08 নং

চিত্রের মতো U আকৃতির লবণ সেতু উপুড় করে দুইটি দ্রবণের মধ্যে রাখা হয়। এবার একটি ধাতব তার দিয়ে তড়িৎদ্বার দুইটি সংযোগ ঘটানো হয়। তারের মাঝে একটি বাল্ব সংযোগ থাকলে এবং তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ শুরু হলে বাল্বটি জ্বলে উঠে। এখানে জিংক তড়িৎদ্বারে জিংকের একটি পরমাণু দুইটি ইলেকট্রন ত্যাগ করে জিংক আয়নে (Zn^{2+}) পরিণত হয়। এই জিংক আয়ন তড়িৎদ্বার ছেড়ে দ্রবণে প্রবেশ করে। ইলেকট্রন দুইটি জিংক তড়িৎদ্বার গ্রহণ করে। ফলে এ তড়িৎদ্বার ঋণাত্মক চার্জযুক্ত হয়। এই ইলেকট্রন দুইটি তড়িৎদ্বার দুইটিকে যে তার দিয়ে সংযোগ দেওয়া হয়েছে, তার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। যেহেতু জিংকের তড়িৎদ্বারে ধাতব Zn থেকে Zn^{2+} পরিণত হয়, সেহেতু বলা যায় এ তড়িৎদ্বারে জারণ বিক্রিয়া ঘটে। তাই এ তড়িৎদ্বার হলো অ্যানোড।

অ্যানোডে জারণ বিক্রিয়া: $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$

এবার জিংক অ্যানোড থেকে আসা 2টি ইলেকট্রন কপার তড়িৎদ্বারে প্রবেশ করে এবং এ তড়িৎদ্বার থেকে $CuSO_4$ দ্রবণের Cu^{2+} আয়ন দুইটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে ধাতব কপারে (Cu) পরিণত হয় ফলে কপার তড়িৎদ্বারে বিজারণ ঘটে। এজন্য এক্ষেত্রে কপার তড়িৎদ্বার হলো ক্যাথোড।

ক্যাথোডে বিজারণ বিক্রিয়া: $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$

সামগ্রিক কোষ বিক্রিয়া: $Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu$

এখানে দেখা যাচ্ছে, অ্যানোডে জিংক ইলেকট্রন দান করে বলে অ্যানোডে জারণ বিক্রিয়া ঘটেছে। কিন্তু শুধু ইলেকট্রন দান করলে বিক্রিয়া সম্পন্ন হয় না। এ ইলেকট্রন অন্য কাউকে গ্রহণও করতে হবে। ক্যাথোড তড়িৎদ্বারে জিংকের দান করা ইলেকট্রন কপার আয়ন গ্রহণ করে বিজারণ বিক্রিয়া সম্পন্ন করেছে। অর্থাৎ অ্যানোডে অর্ধেক বিক্রিয়া আর ক্যাথোডে অপর অর্ধেক বিক্রিয়া ঘটেছে।

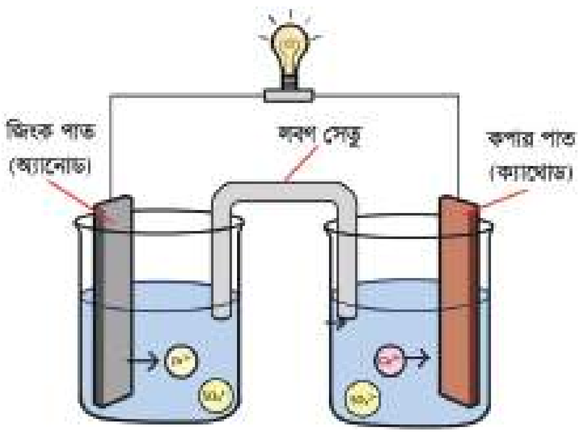

চিত্র ৮.০৮: গ্যালভানিক (ডেনিয়েল) কোষ

তাই অ্যানোডের বিক্রিয়াকে জারণ অর্ধবিক্রিয়া আর ক্যাথোডের বিক্রিয়াকে বিজারণ অর্ধবিক্রিয়া বলা হয়। কোষ বিক্রিয়া যেহেতু ক্যাথোডের বিক্রিয়া আর অ্যানোডের বিক্রিয়ার যোগফল, তাই কোষ বিক্রিয়া হলো জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া।

অ্যানোড থেকে ইলেকট্রন তারের মধ্য দিয়ে ক্যাথোডে প্রবেশ করে অর্থাৎ তারের মধ্য দিয়ে ইলেকট্রন বা বিদ্যুৎ প্রবাহিত

হয় অর্থাৎ এক্ষেত্রে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন হয়েছে। অর্থাৎ গ্যালভানিক কোষে রাসায়নিক শক্তি বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

টেবিল ৮.০৩: তড়িৎ বিশ্লেষ্য কোষ ও গ্যালভানিক কোষের পার্থক্য

তড়িৎ বিশ্লেষ্য কোষ	গ্যালভানিক কোষ
যে কোষে তড়িৎ শক্তি ব্যবহার করে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটানো হয় তাকে তড়িৎ বিশ্লেষ্য কোষ বলে।	যে কোষে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে তড়িৎ শক্তি উৎপন্ন করা হয় তাকে গ্যালভানিক কোষ বলে।
তড়িৎ বিশ্লেষ্য কোষে অ্যানোড ধনাত্মক চার্জযুক্ত এবং ক্যাথোড ঋণাত্মক চার্জযুক্ত।	গ্যালভানিক কোষে অ্যানোড ঋণাত্মক চার্জযুক্ত কিন্তু ক্যাথোড ধনাত্মক চার্জযুক্ত।
কোনো মৌল বা যৌগ উৎপাদন, ইলেকট্রোপ্লেটিং, ধাতু বিশোধন প্রভৃতি কাজে তড়িৎ বিশ্লেষ্য কোষ ব্যবহার করা হয়।	তড়িৎ শক্তি উৎপাদন করার যন্ত্র যেমন– ব্যাটরি তৈরিতে গ্যালভানিক কোষ ব্যবহৃত হয়।

গ্যালভানিক কোষের তড়িৎদ্বার: গ্যালভানিক কোষে নানা ধরনের তড়িৎদ্বার ব্যবহার করা হয়।এদের মধ্যে সবচেয়ে সহজে তৈরি করা যায় ধাতু-ধাতুর আয়ন তড়িৎদ্বার। এ ধরনের তড়িৎদ্বারগুলোকে তৈরি করতে কোনো ধাতুর দণ্ড বা পাতকে সেই ধাতুর আয়নবিশিষ্ট দ্রবণে অর্ধেক বা অর্ধেকের বেশি পরিমাণে নিমজ্জিত করে তৈরি করা হয়। এ তড়িৎদ্বারকে লিখে প্রকাশ করতে হলে প্রথমে ধাতু তারপর ধাতুর আয়নকে পাশাপাশি লিখে দুটির মাঝখানে খাড়া দাগ দিতে হয়। যেমন– জিংক ধাতুর দণ্ডকে $ZnSO_4$ এর দ্রবণের মধ্যে রাখলে জিংক ধাতুর তড়িৎদ্বার তৈরি হয়ে গেল। একে $Zn|Zn^{2+}$ দিয়ে প্রকাশ করা হয়। এ তড়িৎদ্বারে নিম্নরূপ বিক্রিয়া ঘটে।

$$Zn \rightleftharpoons Zn^{2+} + 2e^-$$

এ ধরনের আরও কিছু তড়িৎদ্বার ও তাদের বিক্রিয়া **৮.০৪ টেবিলে** দেখানো হলো।

অধিক সক্রিয় ধাতু যেমন–সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম প্রভৃতি ধাতুর তড়িৎদ্বার এভাবে তৈরি হয় না। এসব ক্ষেত্রে সাধারণত অ্যামালগাম ব্যবহার করা হয়। অ্যামালগাম হলো, পারদ ও সক্রিয় ধাতুর মিশ্রণ।

গ্যালভানিক কোষে অ্যানোড এবং ক্যাথোড শনাক্তকরণ

দুইটি তড়িৎদ্বার দিয়ে কোনো গ্যালভানিক কোষ তৈরি করলে কোনটি অ্যানোড এবং কোনটি ক্যাথোড হবে তা নির্ভর করে সেগুলো কোন মৌল দিয়ে তৈরি তার উপর। তড়িৎ রাসায়নিক সারির উপরের দিকে অবস্থিত অধিক সক্রিয় মৌলের তড়িৎদ্বার অ্যানোড এবং তড়িৎ রাসায়নিক সারির নিচের দিকে অবস্থিত অপেক্ষাকৃত কম সক্রিয় মৌলের তৈরি ইলেকট্রোড ক্যাথোড হিসেবে কাজ করে।

টেবিল ৮.০৪: তড়িৎদ্বার ও তাদের বিক্রিয়া

তড়িৎদ্বার	বিক্রিয়া
$Zn\|Zn^{2+}$	$Zn(s) \rightleftharpoons Zn^{2+}(aq) + 2e^-$
$Cu\|Cu^{2+}$	$Cu(s) \rightleftharpoons Cu^{2+}(aq) + 2e^-$
$Fe\|Fe^{2+}$	$Fe(s) \rightleftharpoons Fe^{2+}(aq) + 2e^-$
$Ag\|Ag^+$	$Ag(s) \rightleftharpoons Ag^+(aq) + e^-$

টেবিল ৮.০৫: তড়িৎদ্বার

তড়িৎদ্বার
$Li\|Li^+$
$K\|K^+$
$Na\|Na^+$
$Mg\|Mg^{2+}$
$Al\|Al^{3+}$
$Zn\|Zn^{2+}$
$Fe\|Fe^{2+}$
$Ni\|Ni^{2+}$
$Sn\|Sn^{2+}$
$Pb\|Pb^{2+}$
$H_2\|H^+$
$Cu\|Cu^{2+}$
$Ag\|Ag^+$
$Au\|Au^{3+}$

যেমন- কপার ধাতু ও সিলভার ধাতুর তড়িৎদ্বার দিয়ে গ্যালভানিক কোষ তৈরি করা হলে এক্ষেত্রে কপার ধাতুর তড়িৎদ্বারটি অ্যানোড আর সিলভার ধাতুর তড়িৎদ্বারটি ক্যাথোড হিসেবে কাজ করবে। কারণ তড়িৎ রাসায়নিক সারিতে কপার ধাতুর অবস্থান উপরে আর সিলভার ধাতুর অবস্থান নিচে।

এই কোষে কপার পরমাণু ইলেকট্রন ত্যাগ করে কপার আয়নে পরিণত হয়।

অ্যানোডে জারণ অর্ধবিক্রিয়া:

$$Cu \rightarrow Cu^{2+} + 2\ e^-$$

এই কোষে সিলভার আয়ন ইলেকট্রন গ্রহণ করে ধাতব সিলভার পরমাণুতে পরিণত হয়।

ক্যাথোডে বিজারণ অর্ধবিক্রিয়া:

$$2Ag^+ + 2e^- \rightarrow 2Ag$$

এখন অর্ধবিক্রিয়া দুইটি যোগ করলে কোষ বিক্রিয়া পাওয়া যাবে।

কোষ বিক্রিয়া:

$$Cu + 2Ag^{+} \rightarrow Cu^{2+} + 2Ag$$

লবণ সেতু ও তার ব্যবহার

তোমরা ডেনিয়েল কোষে দেখেছো অ্যানোডে ধাতব জিংক দুইটি ইলেকট্রন ত্যাগ করে জিংক আয়নে পরিণত হয়। এ ইলেকট্রন বাইরের তার দিয়ে ক্যাথোডে যায়। ফলে অ্যানোডের দ্রবণে ধনাত্মক আয়ন বেশি হয়ে যায়।

অ্যানোডে জারণ অর্ধবিক্রিয়া:

$$Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2\ e^{-}$$

আবার, ক্যাথোডে থাকা $CuSO_4$ এর দ্রবণ থেকে Cu^{2+} আয়ন দুইটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে আধান নিরপেক্ষ Cu পরমাণুতে পরিণত হয় কিন্তু SO_4^{2-} আয়নের কোনো পরিবর্তন হয় না। ফলে দ্রবণ ঋণাত্মক আধান প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ দুইটি দ্রবণের আধান নিরপেক্ষতা নষ্ট হয়। ফলে কিছুক্ষণের মধ্যে বিক্রিয়া বন্ধ হয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। এই বিক্রিয়া চালু রাখার জন্য লবণ সেতু ব্যবহার করা হয়। একটি U আকৃতির কাচের নলের মধ্যে আগার-আগার নামের একটি রাসায়নিক পদার্থের সাথে KCl লবণের দ্রবণ মেশানো হয়। ফলে জেলির মতো মিশ্রণ তৈরি হয়। একে লবণ সেতু বলে। এই লবণ সেতুতে বিদ্যমান K^{+} আয়ন ও Cl^{-} আয়ন এর গতি সমান। KCl দ্রবণ দিয়ে তৈরি লবণ সেতুর দুই মুখে তুলা দিয়ে 8.09 নং চিত্রের মতো পরোক্ষভাবে দুইটি তড়িৎ বিশ্লেষ্যের দ্রবণকে সংযোগ দেওয়া হয়।

এখন অ্যানোডের দ্রবণে যতগুলো ধনাত্মক চার্জ বেশি হয় লবণ সেতু থেকে ততগুলো Cl^{-} আয়ন অ্যানোড দ্রবণে চলে আসে। আবার ক্যাথোডের দ্রবণে যতগুলো ধনাত্মক চার্জ কমে যায় লবণ সেতু থেকে ততগুলো K^{+} আয়ন ক্যাথোড দ্রবণে চলে আসে। ফলে অ্যানোড ও ক্যাথোড উভয় দ্রবণের তড়িৎ নিরপেক্ষতা বজায় থাকে। ফলে কোষের তড়িৎ প্রবাহ নির্বিঘ্নে চলতে থাকে।

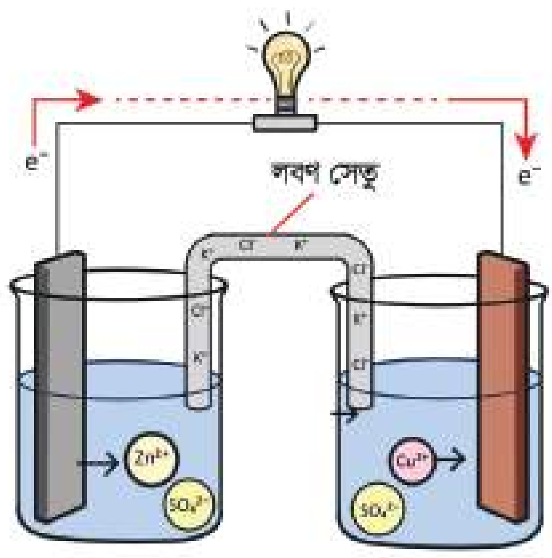

চিত্র ৮.০৯: কোষে ব্যবহৃত লবণ সেতু

ড্রাই সেল

ড্রাই সেল (কোষ) এক ধরনের গ্যালভানিক কোষ। ড্রাই সেলের মাধ্যমে রাসায়নিক শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়। আমরা সাধারণত টর্চলাইট জ্বালাতে, রেডিও বাজাতে, টিভির রিমোট চালাতে, খেলনা চালাতে ড্রাই সেল ব্যবহার করি। ড্রাই সেলও অ্যানোড এবং ক্যাথোড দ্বারা গঠিত।

ড্রাই সেলের গঠন, রাসায়নিক বিক্রিয়া ও বিদ্যুৎ উৎপন্ন হওয়ার কৌশল

ড্রাই সেলে অ্যানোড হিসেবে সাধারণত ধাতব জিংকের তৈরি ছোট কৌটা ব্যবহার করা হয়। ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড (MnO_2), অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড (NH_4Cl), জিংক ক্লোরাইড ($ZnCl_2$) ও পাতিত পানি মিশ্রিত করে প্রস্তুতকৃত কাই (paste) দ্বারা জিংকের তৈরি ছোট কৌটা পূর্ণ করা হয়। এরপর জিংকের কৌটাটির মাঝখানে একটি কার্বন (গ্রাফাইট) দণ্ড প্রবেশ করানো হয়। কার্বন দণ্ড ক্যাথোড হিসেবে কাজ করে।

চিত্র ৮.১০: ড্রাই সেল

যখন কোনো বাল্ব বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক যন্ত্রের দুইটি প্রান্ত (ধনাত্মক প্রান্ত এবং ঋণাত্মক প্রান্ত) এর সাথে দুইটি তার যুক্ত করে একটি তার জিংক কৌটার সাথে এবং অন্য তার কার্বন দণ্ডের সাথে যুক্ত করা হয় তখন নিম্নরূপ বিক্রিয়া সংঘটিত হয়।

ড্রাই সেলের অ্যানোডের জিংক 2টি ইলেকট্রন ত্যাগ করে Zn^{2+} এ পরিণত হয়।

অ্যানোডে বিক্রিয়া:

$$Zn \longrightarrow Zn^{2+} + 2e^-$$

অ্যানোডে উৎপন্ন 2টি ইলেকট্রন তারের মধ্য দিয়ে কার্বন দণ্ডে চলে আসে এবং কার্বন দণ্ডের 2টি ইলেকট্রন অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড থেকে প্রাপ্ত অ্যামোনিয়াম আয়ন (NH_4^+) এবং ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড (MnO_2) গ্রহণ করে অ্যামোনিয়া গ্যাস (NH_3) ও ডাই ম্যাঙ্গানিজ ট্রাই-অক্সাইড উৎপন্ন করে।

ক্যাথোডে বিক্রিয়া:

$$2NH_4^+ + 2MnO_2 + 2e^- \longrightarrow 2NH_3 + Mn_2O_3 + H_2O$$

সামগ্রিক কোষ বিক্রিয়া:

$$Zn + 2NH_4^+ + 2MnO_2 \longrightarrow Zn^{2+} + 2NH_3 + Mn_2O_3 + H_2O$$

ড্রাই সেলের অ্যানোড ও ক্যাথোড প্রান্তকে যদি বাল্ব বা কোনো ইলেকট্রনিক যন্ত্রের দুই প্রান্তে যুক্ত করা হয় তখন ইলেকট্রনের প্রবাহ সৃষ্টি হয় অর্থাৎ বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়। তাহলে যেখানে বিদ্যুৎ প্রয়োজন সেখানে ড্রাই সেল সংযুক্ত করলেই উল্লিখিত বিক্রিয়াসমূহ সংঘটিত হবে এবং আমরা বিদ্যুৎ শক্তি পাব।

তড়িৎ রাসায়নিক কোষের প্রয়োগ

প্রাচীনকাল থেকেই তড়িৎ বিশ্লেষণ কৌশল ব্যবহার করে এক ধাতুর উপর অন্য ধাতুর প্রলেপ ব্যবহার করা হয়। তবে এখন তড়িৎ বিশ্লেষণ কৌশলের ব্যবহার আরও ব্যাপক। তড়িৎ বিশ্লেষণের সাহায্যে আকরিক থেকে ধাতু নিষ্কাশন, মূল্যবান রাসায়নিক পদার্থের উৎপাদন, বিদ্যুৎ শক্তির উৎপাদন, পদার্থের বিশুদ্ধকরণ ইত্যাদি করা হয়। হাইড্রোজেন ফুয়েল সেলের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। এতে অ্যানোডে হাইড্রোজেন অণু জারিত হয় আর ক্যাথোডে অক্সিজেন অণু বিজারিত হয়ে পানি উৎপাদন করে। ফলে কোষে ইলেকট্রন অ্যানোড হতে ক্যাথোডে প্রবাহিত হয়। এই বিদ্যুতের সাহায্যে গাড়ি পর্যন্ত চলতে পারে। সারা পৃথিবীতে কত মোবাইল ফোন, কত কম্পিউটার, কত ক্যালকুলেটর ব্যবহৃত হচ্ছে চিন্তা করতে পারছো, সব ক্ষেত্রে ব্যাটারি ব্যবহৃত হয়।

চিত্র ৮.১১: রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ নির্ণয়ের যন্ত্র

ডায়াবেটিক রোগীর রক্তের গ্লুকোজের পরিমাণ নির্ণয় করার জন্য তড়িৎ বিশ্লেষণ কৌশলনির্ভর সেন্সর ব্যবহার করা হয়। ৮.১১ নং চিত্রে তড়িৎ বিশ্লেষণ কৌশল ব্যবহার করে মানবদেহের রক্তের গ্লুকোজের পরিমাণ নির্ণয় দেখানো হলো। বাম হাতের আঙুলে লাগানো ছোট অংশটিতে পাতলা ও চিকন অ্যানোড ও ক্যাথোড লাগানো আছে। অ্যানোড ও ক্যাথোডের মাঝখানে একটা ছোট ফাঁকা নালি (channel) থাকে। যদি অ্যানোড ও ক্যাথোডের মাঝখানে ফাঁকা নালিতে রক্ত দেওয়া হয়, তাহলে একটি পূর্ণ

তড়িৎ কোষ গঠিত হবে। আসলে, ফাঁকা নালিতে রক্ত দিলে কোষে সংযুক্ত উৎস হতে বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে রক্তে অবস্থিত গ্লুকোজ অণু অ্যানোডে জারিত হয়। অন্যদিকে, হিসাব-নিকাশ করার যন্ত্রের সাহায্যে গ্লুকোজের জারণের ফলে উদ্ভূত ইলেকট্রনের সংখ্যা নির্ণয় করে যন্ত্রটি তার পর্দায় (screen) রক্তে অবস্থিত গ্লুকোজের পরিমাণ মনিটরে ডিজিটের (digit) সাহায্যে প্রকাশ করে। মজার ব্যাপার হলো এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ নির্ণয় করতে এক মিনিট বা তার চেয়ে কম সময় লাগে।

স্বাস্থ্য ও পরিবেশের উপর ব্যাটারির বিরূপ প্রভাব

আমরা বিভিন্ন কাজে ব্যাটারি ব্যবহার করি। ড্রাই সেল (dry cell) টর্চলাইট জ্বালানোর কাজে, লেড-স্টোরেজ ব্যাটারি (lead storage battery) বাস, ট্রাক ইত্যাদি স্টার্ট দেয়ার কাজে ব্যবহার করা হয়। এসব ব্যাটারিতে বিভিন্ন ধাতু এবং ধাতব আয়ন ব্যবহার করা হয়। যা আমাদের শরীরের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। ড্রাই সেলে দস্তা (Zn) ও ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড (MnO_2) থাকে, লেড-স্টোরেজ ব্যাটারিতে সিসা (Pb) ও সিসার অক্সাইড (PbO_2) ইত্যাদি থাকে। রাসায়নিক ধর্মের বিবেচনায় এগুলো বিষাক্ত (toxic) ও ক্যানসার সৃষ্টিকারী (carcinogenic)। এগুলো ব্যবহারের পর আমরা যেখানে সেখানে ফেলে দেই। ফলে এ সকল বিষাক্ত পদার্থ মাটি ও পানির সাথে মিশে মাটি ও পানিকে দূষিত করে তোলে।

চিত্র ৮.১২: মোবাইল ফোনে ব্যবহৃত ব্যাটারি

৮.৫ নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া ও বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন (Nuclear Reactions and Generation of Electricity)

নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া

যে বিক্রিয়ায় কোনো মৌলের নিউক্লিয়াসের পরিবর্তন ঘটে তাকে নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া বলে। রাসায়নিক বিক্রিয়ায় পরমাণুর বা আয়নের সর্ববহিস্থ শক্তিস্তর থেকে ইলেকট্রনের আদান-প্রদান ঘটে। নিউক্লিয়াসের কোনো পরিবর্তন হয় না। কিন্তু নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ায় পরমাণুর নিউক্লিয়াসের পরিবর্তন ঘটে। এখানে ইলেকট্রনের কোনো ভূমিকা নেই। এ বিক্রিয়ার ফলে নতুন মৌলের পরমাণুর

নিউক্লিয়াসের সৃষ্টি হয়। যে বিক্রিয়ার ফলে ছোট ছোট মৌলের নিউক্লিয়াস একত্র হয়ে বড় মৌলের নিউক্লিয়াস অথবা কোনো বড় মৌলের নিউক্লিয়াস ভেঙে একাধিক ছোট মৌলের নিউক্লিয়াস তৈরি হয় সেই বিক্রিয়াকে নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া বলে। নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ায় প্রচুর পরিমাণে শক্তি উৎপন্ন হয়।

বিভিন্ন রকমের নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া আছে; তবে এদের মধ্যে নিউক্লিয়ার ফিশন বিক্রিয়া ও নিউক্লিয়ার ফিউশন বিক্রিয়া অন্যতম।

নিউক্লিয়ার ফিশন বিক্রিয়া

যে নিউক্লিয়ার প্রক্রিয়ায় কোনো বড় এবং ভারী মৌলের নিউক্লিয়াস ভেঙে ছোট ছোট মৌলের নিউক্লিয়াসে পরিণত হয় তাকে নিউক্লিয়ার ফিশন বিক্রিয়া বলে। এর সাথে নিউট্রন আর প্রচুর (Fission) পরিমাণে শক্তি উৎপন্ন হয়।

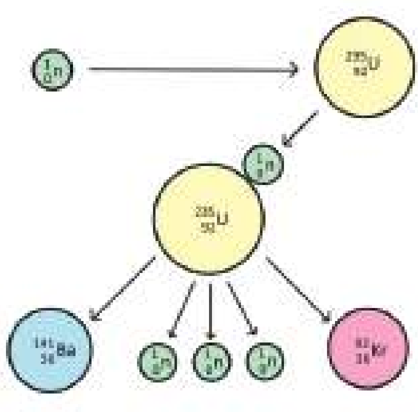

চিত্র ৮.১৩:নিউক্লিয়ার ফিশন বিক্রিয়া

স্বল্পগতির নিউট্রন দিয়ে $^{235}_{92}U$ কে আঘাত করলে নিউক্লিয়াসটি প্রায় দুইটি সমান অংশে বিভক্ত হয়ে $^{141}_{56}Ba$ ও $^{92}_{36}Kr$ এর নিউক্লিয়াস ও তিনটি নিউট্রন ($^{1}_{0}n$) ও তার সাথে প্রচুর পরিমাণে শক্তি উৎপন্ন হয়। এটি একটি নিউক্লিয়ার ফিশন বিক্রিয়া।

$$^{235}_{92}U + ^{1}_{0}n \longrightarrow ^{141}_{56}Ba + ^{92}_{36}Kr + 3\ ^{1}_{0}n + \text{প্রচুর শক্তি}$$

নিউক্লিয়ার ফিউশন বিক্রিয়া

যে নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ায় ছোট ছোট নিউক্লিয়াসসমূহ একত্র হয়ে বড় নিউক্লিয়াস গঠন করে তাকে নিউক্লিয় ফিউশন (Fusion) বিক্রিয়া বলে। নিচে নিউক্লিয়ার ফিউশন বিক্রিয়ার উদাহরণ দেওয়া হলো।

$$^{2}_{1}H + ^{3}_{1}H \longrightarrow ^{4}_{2}He + ^{1}_{0}n + \text{প্রচুর শক্তি}$$

নিউক্লিয়ার ফিউশন বিক্রিয়ার সাহায্যে হাইড্রোজেন বোমা তৈরি করা হয়।

নিউক্লিয়ার চেইন বিক্রিয়া

নিউক্লিয়ার ফিশন বিক্রিয়াগুলোই মূলত নিউক্লিয়ার চেইন বিক্রিয়া (Chain Reaction)। যে বিক্রিয়া একবার শুরু হলে তাকে চালু রাখার জন্য অতিরিক্ত কোনো শক্তির প্রয়োজন হয় না তাকে নিউক্লিয়ার

চেইন বিক্রিয়া বলে। তোমরা দেখেছো একটি $^{235}_{92}U$ আইসোটোপকে একটি নিউট্রন দিয়ে আঘাত করা হলে $^{235}_{92}U$ আইসোটোপটি ভেঙে একটি $^{141}_{56}Ba$ নিউক্লিয়াস, একটি $^{92}_{36}Kr$ নিউক্লিয়াস, 3টি নিউট্রন ($^{1}_{0}n$) এবং প্রচুর পরিমাণে শক্তি উৎপন্ন হয়। এই 3টি নিউট্রনের গতি কমানো সম্ভব হলে সেগুলোর একটি অংশ আবার অন্য $^{235}_{92}U$ আইসোটোপকে আঘাত করে। এভাবে আরো নিউট্রন উৎপন্ন হয়। সেই নিউট্রনগুলোর গতিবেগ কমানো হলে তাদের একটি অংশ আবার অন্য $^{235}_{92}U$ কে আঘাত করে ফলে আবার নিউট্রন উৎপন্ন হয়। এভাবে চলমান বিক্রিয়াকে নিউক্লিয়ার চেইন বিক্রিয়া বলে। নিউক্লিয়ার চেইন বিক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করা যথেষ্ট জটিল এবং এই বিক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে পারমাণবিক চুল্লিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়।

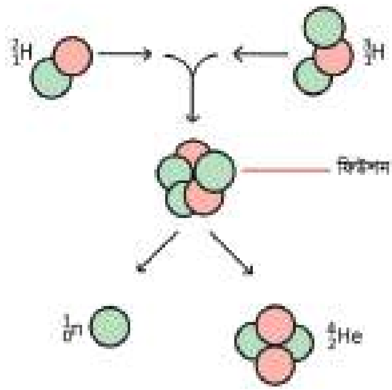

চিত্র ৮.১৪: নিউক্লিয়ার ফিউশন বিক্রিয়া

বিদ্যুৎ উৎপাদন

বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারমাণবিক চুল্লি ব্যবহার করা হয়। নিউক্লিয় ফিশন বিক্রিয়ার সময় যে চেইন বিক্রিয়া হয়, সেই চেইন বিক্রিয়াকে যে যন্ত্রের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করা হয় তাকে পারমাণবিক চুল্লি বলে। পারমাণবিক চুল্লির সাহায্যে প্রচুর শক্তি উৎপাদন করা যায়। পারমাণবিক চুল্লির ভিতরে ফিশন বিক্রিয়ার ফলে যে সকল ক্ষুদ্র মৌল তৈরি হয় সেগুলো উচ্চ গতিসম্পন্ন হয়। এই উচ্চ গতিসম্পন্ন ক্ষুদ্র মৌলগুলো চুল্লির ভিতরে একে অন্যের সাথে এবং দেয়ালে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করে ও প্রচুর তাপশক্তি উৎপন্ন করে। এই তাপ চুল্লি থেকে বের করে নিয়ে এসে সেই তাপ বাষ্প উৎপাদন প্রকোষ্ঠে চালনা করা হয় এবং এই তাপ দিয়ে বাষ্প উৎপাদন করা হয়। এবার ঐ বাষ্পের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য টারবাইন চালনা করা হয়। ফলে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পারমাণবিক চুল্লির ভেতরেই বাষ্প উৎপাদনের ব্যবস্থা থাকে। পৃথিবীর অনেক দেশে পারমাণবিক চুল্লির সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা

চিত্র ৮.১৫: নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্র

হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার পাবনা জেলার রূপপুরে পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। প্রকল্পটি সম্পন্ন হলে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে যাবে। অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের সব এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

পরীক্ষণ -১

গ্যালভানিক কোষ তৈরি করে বিদ্যুৎ উৎপাদন

মূলনীতি: যে তড়িৎ রাসায়নিক কোষে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় তাকে গ্যালভানিক কোষ বলে। একটি জিংক (Zn) দণ্ডকে জিংক সালফেট ($ZnSO_4$) দ্রবণে আংশিক ডুবিয়ে এবং কপার সালফেট ($CuSO_4$) দ্রবণে কপার (Cu) দণ্ডকে আংশিক ডুবিয়ে দণ্ড দুটিকে একটি তামার তার দিয়ে সংযোগ ঘটালে গ্যালভানিক কোষ তৈরি হয়। এক্ষেত্রে জিংক দণ্ড থেকে জিংক পরমাণু দুইটি ইলেকট্রন ত্যাগ করে জিংক আয়ন (Zn^{2+}) হিসেবে দ্রবণে চলে যায়। ইলেকট্রন দুটি কপার তারের ভিতর দিয়ে কপার দণ্ডে পৌঁছে। কপার সালফেট দ্রবণের কপার আয়ন (Cu^{2+}) ইলেকট্রন দুইটি গ্রহণ করে ধাতব কপারে পরিণত হয়। কপার তারের মধ্য দিয়ে ইলেকট্রন প্রবাহের ফলে বিদ্যুৎ প্রবাহ সৃষ্টি হয়। এ ক্ষেত্রে জিংক দণ্ড অ্যানোড আর কপার দণ্ড ক্যাথোড হিসেবে কাজ করে।

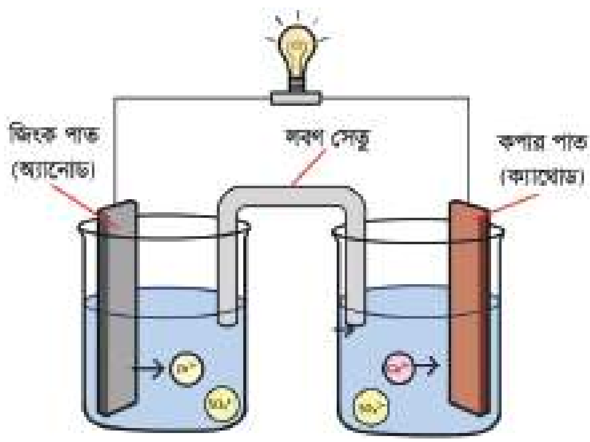

চিত্র ৮.১৬: গ্যালভানিক কোষের সাহায্যে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন

$$Zn \longrightarrow Zn^{2+} + 2e^- \quad \text{(অ্যানোডে বিক্রিয়া)}$$

$$Cu^{2+} + 2e^- \longrightarrow Cu \quad \text{(ক্যাথোডে বিক্রিয়া)}$$

$$Zn + Cu^{2+} \longrightarrow Zn^{2+} + Cu \quad \text{(কোষ বিক্রিয়া)}$$

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্য: দুইটি বিকার, জিংক সালফেট ($ZnSO_4$) দ্রবণ, কপার সালফেট ($CuSO_4$) দ্রবণ, জিংক দণ্ড, কপার দণ্ড, একটি LED, পানিতে ভেজানো এক টুকরো লম্বা কাগজ অথবা লবণ সেতু, কপার তার ইত্যাদি।

কার্যপ্রণালি: ৮.১৬ চিত্রের মতো করে একটি বিকারে জিংক সালফেট দ্রবণ নিয়ে তাতে জিংক দণ্ড এবং অপর একটি বিকারে কপার সালফেট দ্রবণ নিয়ে তাতে কপার দন্ড আংশিক প্রবেশ করাও। বিকার দুটির দ্রবণে চিত্রের মতো করে একটি লবণ সেতু স্থাপন কর। এবারে জিংক ও কপার দন্ড দুটিকে তামার তার যুক্ত কর। এবার LED এর পজিটিভ প্রান্ত কপার প্রান্তের তামার তারের সাথে এবং নেগেটিভ প্রান্ত জিংক দণ্ডের তামার তারের সাথে যুক্ত করলে LEDটি জ্বলে উঠবে। এই সময় জিংক দণ্ড ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে জিংক আয়ন দ্রবণে চলে যেতে থাকে এবং দ্রবণ থেকে কপার আয়ন কপার দণ্ডে গিয়ে জমা হতে থাকে।

এক্ষেত্রে উপরে দেখানো কোষ বিক্রিয়াটি সংঘটিত হয়। ফলে রাসায়নিক শক্তি বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

সতর্কতা

1. দুইটি দ্রবণের উচ্চতা সমান রাখতে হবে।
2. লবণ সেতু বা এক টুকরো ভেজা কাগজ দিয়ে উভয় দ্রবণের মধ্যে সংযোগ ভালোমতো করতে হবে।

পরীক্ষণ-২

পানিতে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড (NH_4Cl) দ্রবীভূত করে তাপমাত্রার পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ।

মূলনীতি: অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডকে পানিতে দ্রবীভূত করলে তা নিম্নরূপে আয়নিত হয়।

$$NH_4Cl \longrightarrow NH_4^+ + Cl^-$$

অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের কেলাস ভাঙতে ও অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের অণু আয়নিত হতে শক্তির প্রয়োজন হয়। এ শক্তি পানি হতে আসে। ফলে পানির তাপমাত্রা কমে যায়। তাই অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড পানিতে দ্রবীভূত হওয়া একটি তাপহারী প্রক্রিয়া।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্য: বিকার, অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড (NH_4Cl), পাতিত পানি, কাচ দণ্ড, থার্মোমিটার।

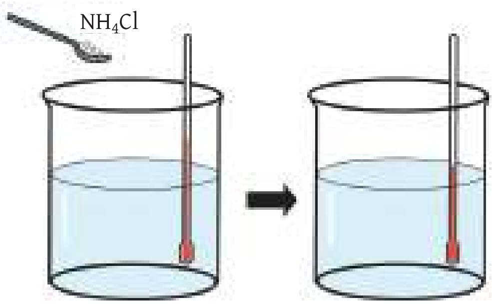

চিত্র ৮.১৭: বিকারে NH_4Cl এর দ্রবণ

কার্যপ্রণালি

বিকারে 50 গ্রাম পাতিত পানি নাও।

থার্মোমিটারের সাহায্যে পানির তাপমাত্রা নির্ণয় করো।

10 গ্রাম অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড বিকারের পানিতে যোগ করো।

কাচ দণ্ড দিয়ে নাড়াচাড়া করে সম্পূর্ণ অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডকে দ্রবীভূত করো।

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দ্রবীভূত হওয়ার সাথে সাথে দ্রবণের তাপমাত্রা থার্মোমিটার দিয়ে নির্ণয় করো।

ফলাফল: পর্যবেক্ষণকৃত ডাটা থেকে দেখা যাবে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড পানিতে দ্রবীভূত হলে পানির তাপমাত্রা হ্রাস পাবে, অর্থাৎ এটি একটি তাপহারী প্রক্রিয়া।

পরীক্ষণ -৩

পানিতে চুন যোগ করে তাপমাত্রা পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ

মূলনীতি: চুন বা ক্যালসিয়াম অক্সাইড পানিতে যোগ করলে তা পানির সাথে নিম্নরূপে বিক্রিয়া করে।

$$\underset{\text{ক্যালসিয়াম অক্সাইড}}{CaO} + \underset{\text{পানি}}{H_2O} \longrightarrow \underset{\text{ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড}}{Ca(OH)_2} + \text{তাপ}$$

এই বিক্রিয়াটি তাপোৎপাদী বিক্রিয়া। তাই ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইডসহ পানির তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্য: বিকার, চুন বা ক্যালসিয়াম অক্সাইড (CaO), পাতিত পানি, কাচ দণ্ড, থার্মোমিটার।

কার্যপ্রণালি

1. বিকারের অর্ধেক পরিমাণ পাতিত পানি নাও।
2. থার্মোমিটারের সাহায্যে পানির তাপমাত্রা নির্ণয় করো।
3. চুন বা ক্যালসিয়াম অক্সাইড বিকারের পানিতে যোগ করো।
4. বিক্রিয়া শুরু হলে কাচ দণ্ড দিয়ে বিকারের দ্রবণকে নাড়াচাড়া করো।
5. যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিকারের দ্রবণের তাপমাত্রা থার্মোমিটার দিয়ে নির্ণয় করো। দেখা যাবে দ্রবণের তাপমাত্রা বেড়ে গেছে।

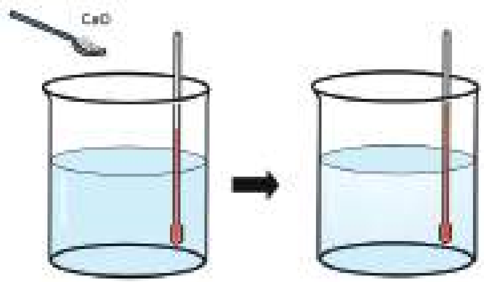

চিত্র ৮.১৮: বিকারে পানি ও চুনের দ্রবণ

ফলাফল: পানিতে চুন যোগ করলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। এটি একটি তাপোৎপাদী প্রক্রিয়া।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বিদ্যুৎ পরিবহণের কৌশলের উপর ভিত্তি করে পরিবাহী কত প্রকার?

(ক) এক (খ) দুই
(গ) তিন (ঘ) চার

৩ নং প্রশ্নের সাথে প্রদত্ত চিত্রের আলোকে ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

২. উদ্দীপকের প্রক্রিয়া লোহার–

(ক) পরিমাণ বৃদ্ধি করে (খ) ক্ষয়রোধ করে
(গ) দৃঢ়তা বৃদ্ধি করে (ঘ) বিশুদ্ধতা বৃদ্ধি করে

৩. পাশের চিত্রে–

(i) Ni ক্ষয়প্রাপ্ত হয়

(ii) Fe অ্যানোড হিসেবে কাজ করে

(iii) ইলেকট্রনের আদান-প্রদান ঘটে

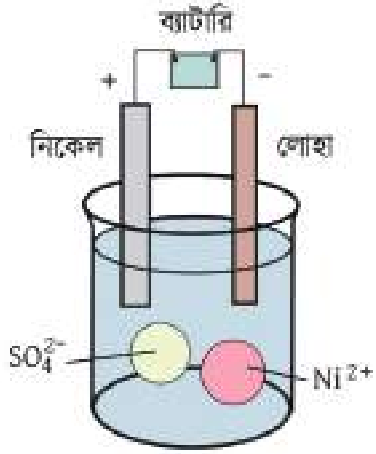

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii

(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৪. ড্রাই সেলে নিচের কোনটি জারক হিসেবে কাজ করে?

(ক) Zn দণ্ড (খ) MnO_2

(গ) কার্বন দণ্ড (ঘ) NH_4^+

৫. তড়িৎ বিশ্লেষণের মাধ্যমে কোনো ধাতুর উপর অন্য ধাতুর প্রলেপ দেওয়াকে কী বলে?

(ক) ভলকানাইজিং (খ) ধাতু বিশোধন

(গ) গ্যালভানাইজিং (ঘ) ইলেকট্রোপ্লেটিং

৬. নিউক্লিয় বিক্রিয়ার সময় নিউক্লিয়াসকে আঘাত করা হয় সাধারণত কোনটি দ্বারা?

(ক) প্রোটন (খ) ইলেকট্রন

(গ) পজিট্রন (ঘ) নিউট্রন

৭. প্লাটিনাম তড়িৎদ্বার ব্যবহার করে NaCl জলীয় দ্রবণের তড়িৎ বিশ্লেষণের সময় উৎপন্ন হয়–

(i) হাইড্রোজেন গ্যাস

(ii) ক্লোরিন গ্যাস

(iii) সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্রবণ

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii

(গ) i ও iii (ঘ) i, ii, ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. (i) পেট্রোলিয়াম + O_2 $\longrightarrow$ CO_2 + H_2O + শক্তি

(ii) $^{238}U + {}_0n^1 \longrightarrow {}_{56}Ba + {}_{36}Kr + 3{}_0n^1$ + শক্তি

(iii) $Zn + CuCl_2 \longrightarrow ZnCl_2 + Cu$ + শক্তি

(ক) ইলেকট্রোপ্লেটিং কী?

(খ) তড়িৎ রাসায়নিক কোষে লবণ সেতু ব্যবহার করা হয় কেন?

(গ) উদ্দীপকের দ্বিতীয় বিক্রিয়াটি রাসায়নিক বিক্রিয়া নয়—ব্যাখ্যা করো।

(ঘ) শক্তি উৎপাদনে (i) ও (iii) এর বিক্রিয়া তুলনা করো।

২. (ক) ধাতব পরিবাহী কী?

(খ) এসিড মিশ্রিত পানিকে তড়িৎ বিশ্লেষ্য পরিবাহী বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো।

(গ) পাশের কোষে অ্যানোড সংঘটিত বিক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করো।

(ঘ) উদ্দীপকে সংঘটিত বিক্রিয়ায় তড়িৎ প্রবাহের প্রয়োজনীয়তার যৌক্তিক ব্যাখ্যা দাও।

৩. (i) তড়িৎ বিশ্লেষণ কোষ (ii) গ্যালভানিক কোষ

(ক) তাপোৎপাদী বিক্রিয়া কাকে বলে?

(খ) পানির তড়িৎ বিশ্লেষণের সময় সামান্য পরিমাণে সালফিউরিক এসিড যোগ করা হয় কেন?

(গ) (i) নং কোষের গঠন ব্যাখ্যা করো।

(ঘ) (ii) নং কোষের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা বিশ্লেষণ করো।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. এসিড মিশ্রিত পানিকে তড়িৎ বিশ্লেষ্য পরিবাহী বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো।

২. কপার সালফেট তীব্র তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ কেন? ব্যাখ্যা করো।

৩. তড়িৎ রাসায়নিক কোষে লবণ সেতু ব্যবহার করা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো।

নবম অধ্যায়

এসিড-ক্ষারক সমতা

(Balance of Acid-Base)

অনেক ফলই খানিকটা এসিডধর্মী

রসায়ন গবেষণাগারে আমরা নানা ধরনের যৌগ ব্যবহার করে থাকি। তাদের মধ্যে এসিড, ক্ষারক আর লবণ অন্যতম। রসায়নের শিক্ষার্থী হিসেবে তোমাদেরকেও এসিড, ক্ষারক এবং লবণ সম্পর্কে জানতে হবে। ল্যাবরেটরিতে আমরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য গাঢ় এসিড বা গাঢ় ক্ষারের পরিবর্তে লঘু এসিড বা লঘু ক্ষারই বেশি ব্যবহার করে থাকি। খাদ্যের মাধ্যমে আমরা এসিড, ক্ষারক ও লবণ পেয়ে থাকি, যা আমাদের শরীরের জন্য আবশ্যক। এসিডকে ক্ষারক দ্বারা প্রশমিত করে লবণ তৈরি করা হয় অথবা ক্ষারককে এসিড দ্বারা প্রশমিত করে লবণ তৈরি করা হয়। কোনো দ্রবণ এসিডধর্মী না ক্ষারধর্মী তা আমরা ল্যাবরেটরিতে বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে জানতে পারি। এদের মধ্যে লিটমাস পরীক্ষা, pH মান পরীক্ষা সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। প্রয়োজনীয় এসব এসিড, ক্ষারক এবং লবণ আমাদের পরিবেশকে আবার বিভিন্নভাবে দূষিতও করছে। এসব বিষয়ই এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- অম্ল, ক্ষার ও লবণের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরিচিত পরিবেশের পদার্থগুলোর মধ্য থেকে অম্ল, ক্ষার ও লবণকে শনাক্ত করতে পারব।
- ক্ষারক ও ক্ষার জাতীয় পদার্থের পার্থক্য করতে পারব।
- ব্যবহার্য পদার্থের ওপর অম্ল ও ক্ষারের প্রভাব বর্ণনা করতে পারব।
- গৃহস্থালি পদার্থের ওপর অম্ল ও ক্ষার জাতীয় দ্রব্যের প্রভাবের আর্থিক গুরুত্ব মূল্যায়ন করতে পারব।
- pH এর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- pH পরিমাপের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় অম্ল-ক্ষার সমতার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারব।
- এসিড বৃষ্টির কারণ, ক্ষতিকর দিকসমূহ এবং তা থেকে রক্ষার উপায় ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পানিচক্র ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পানির খরতা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- খর পানি ব্যবহারের সুবিধাসমূহ উল্লেখ করতে পারব।
- খর পানি ব্যবহারের আর্থিক ক্ষতি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পানি দূষণের কারণ ও পরিশোধনের উপায়সমূহ বর্ণনা করতে পারব।
- আর্সেনিকযুক্ত পানি পানের ক্ষতিকর দিক উল্লেখ করতে পারব।
- pH পরিমাপের মাধ্যমে গৃহের/ল্যাবের/লবণাক্ত পানির প্রকৃতি নির্ণয় করতে পারব।
- যৌগসমূহের দ্রবণের pH মান নির্ণয় করে বা লিটমাস বা ইউনিভার্সাল ইন্ডিকেটর ব্যবহার করে যৌগের প্রকৃতি তুলনা (এসিড, ক্ষার) করতে পারব।
- দূষণমুক্ত পানি ব্যবহারে আগ্রহ প্রদর্শন করতে পারব।
- এসিড সন্ত্রাসের ভয়াবহ দিক সম্পর্কে সচেতনতার পরিচয় দিতে পারব এবং অন্যদের সচেতন করতে করতে পারব।
- ব্যবহার্য পদার্থের ওপর অম্ল ও ক্ষারের প্রভাব পরীক্ষার মাধ্যমে দেখাতে পারব।
- অম্ল ও ক্ষার জাতীয় পদার্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে যথাযথ ব্যবহারের পূর্ব সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারব।

৯.১ এসিড (Acid)

রাসায়নিক দ্রব্যাদির মধ্যে এসিড খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এসিড এক ধরনের গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক দ্রব্য যা পানিতে দ্রবীভূত করলে এসিডের অণু বিয়োজিত হয়ে (ভেঙে) হাইড্রোজেন আয়ন বা প্রোটন (H^+) দান করে। যেমন— হাইড্রোক্লোরিক এসিড (HCl), সালফিউরিক এসিড (H_2SO_4) এরা তীব্র এসিড অতএব, এরা জলীয় দ্রবণে নিম্নরূপে বিয়োজিত হয়:

$$HCl(aq) \longrightarrow H^+(aq) + Cl^-(aq)$$

$$H_2SO_4(aq) \longrightarrow 2H^+(aq) + SO_4^{2-}(aq)$$

কার্বনিক এসিড (H_2CO_3), এসিটিক এসিড (CH_3COOH) এরা মৃদু এসিড। এরা জলীয় দ্রবণে নিম্নরূপে বিয়োজিত হয়।

$$H_2CO_3(aq) \rightleftharpoons 2H^+(aq) + CO_3^{2-}(aq)$$

$$CH_3COOH(aq) \rightleftharpoons H^+(aq) + CH_3COO^-(aq)$$

HCl ও H_2SO_4 এর ক্ষেত্রে বিয়োজন বোঝাতে একটিমাত্র তির চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হলো HCl ও H_2SO_4 পানিতে সম্পূর্ণ (100%) বিয়োজিত হয়। তাই এ ধরনের এসিডকে তীব্র এসিড বা সবল এসিড বলে। অন্য দুইটি এসিড CH_3COOH ও H_2CO_3 এর বিয়োজন বোঝাতে উভমুখী তির চিহ্ন ($\rightleftharpoons$) ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ এরা পানিতে আংশিক বিয়োজিত হয়। তাই এ ধরনের এসিডকে মৃদু এসিড বা দুর্বল এসিড বলে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, 25°C তাপমাত্রায় 1000টি CH_3COOH অণুর মধ্যে পানিতে মাত্র 4টি অণু বিয়োজিত হয়। বাকি 996টি অণু অবিয়োজিত অবস্থায়ই পানিতে থেকে যায়। এসিড ও পানির দ্রবণে এসিডের পরিমাণ যদি বেশি থাকে তবে তাকে গাঢ় এসিড বলে। আবার, এসিডের জলীয় দ্রবণে পানির পরিমাণ যদি এসিডের তুলনায় অনেক বেশি হয় তবে তাকে লঘু এসিড বলে। এসিড টক স্বাদযুক্ত। তোমরা নিশ্চয় তেঁতুল খেয়েছ, যা খুব টক। তেঁতুলের ভিতরে টারটারিক এসিড থাকে। তাই তেঁতুল এত টক। এসিড দ্রবণ নীল রঙের লিটমাস পেপারকে লাল রঙের লিটমাস পেপারে রূপান্তরিত করে।

এসিড ধাতব অক্সাইডের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ ও পানি উৎপন্ন করে।

CaO	+	2HCl	$\longrightarrow$	$CaCl_2$	+	H_2O
ক্যালসিয়াম অক্সাইড		হাইড্রোক্লোরিক এসিড		ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড		পানি
(ধাতব অক্সাইড)		(এসিড)		(লবণ)		

এসিড সক্রিয় ধাতুর সাথে বিক্রিয়া করে লবণ ও হাইড্রোজেন গ্যাস তৈরি করে

$$2Na + 2HCl \longrightarrow 2NaCl + H_2$$

সোডিয়াম (ধাতু)	হাইড্রোক্লোরিক এসিড (এসিড)		সোডিয়াম ক্লোরাইড (লবণ)	হাইড্রোজেন গ্যাস

আমরা প্রতিদিন অনেক খাবার গ্রহণ করি যেগুলোর মাঝে বিভিন্ন ধরনের এসিড থাকে। যেমন–দুধের মধ্যে ল্যাকটিক এসিড, সফট ড্রিংকসে কার্বনিক এসিড, কমলালেবু বা লেবুতে সাইট্রিক এসিড, তেঁতুলে টারটারিক এসিড, ভিনেগারে ইথানয়িক এসিড, চায়ে ট্যানিক এসিড ইত্যাদি। এই খাদ্যগুলো যখন আমরা খাই তখন খাদ্যের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এসিডগুলো আমাদের শরীরে প্রবেশ করে। এসিডগুলো আমাদের খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে এবং শরীরের রোগ প্রতিরোধ করে। আবার, আচারজাতীয় অনেক এসিডযুক্ত খাদ্য আছে যেগুলো আমাদের খাওয়ার রুচি বৃদ্ধি করে। এসব এসিড খুবই দুর্বল প্রকৃতির হওয়ায় এগুলো আমাদের শরীরের ক্ষতি করে না। আবার, এগুলো খেতে টক স্বাদযুক্ত। আমাদের পাকস্থলীর দেয়াল থেকে হাইড্রোক্লোরিক এসিড উৎপন্ন হয়। এটি অত্যন্ত শক্তিশালী এসিড। এটি পাকস্থলীতে খাদ্যকণা ভাঙতে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় পাকস্থলীর দেয়াল থেকে অতিরিক্ত হাইড্রোক্লোরিক এসিড (HCl) নিঃসরিত হয়ে তা পাকস্থলীর দেয়ালের কোষগুলোকে ভাঙতে শুরু করে। আবার, খাদ্য গ্রহণ না করে ক্ষুধার্ত অবস্থায় থাকলে অর্থাৎ পাকস্থলী খালি রাখলে নিঃসরিত হাইড্রোক্লোরিক এসিড (HCl) পাকস্থলীর দেয়ালের কোষগুলোকে ভেঙে সেখানে ক্ষতের সৃষ্টি করে। ফলে পেটে ব্যথা শুরু হয়। এ অবস্থাকে আমরা পেপটিক আলসার বলি। কাজেই যেসব খাদ্য খেলে অতিরিক্ত এসিড নিঃসরিত হয় সেগুলো পরিহার করতে হবে। আবার, বেশি সময় ধরে পেট খালি রাখাও পরিহার করতে হবে। এ অধ্যায়ে এসিডের আরও ধর্ম এবং তাদের ব্যবহার সম্পর্কে জানতে পারবে।

৯.১.১ লঘু এসিডের ধর্মসমূহ ও এদের পরীক্ষামূলক প্রমাণ

(i) স্বাদ: সকল লঘু এসিড টক স্বাদযুক্ত। আমরা ইতঃপূর্বে দেখেছি এসিডযুক্ত খাবারগুলো টক। তবে সাবধান ল্যাবরেটরিতে কোনো এসিডের স্বাদ মুখে নেওয়া যাবে না। কেননা এগুলো জিহ্বায় লাগলে সঙ্গে সঙ্গে জিহ্বায় ক্ষত সৃষ্টি করে ফেলবে। তবে তেঁতুলের মধ্যে টারটারিক এসিড থাকে। যদি তেঁতুল মুখে নাও তবে তেঁতুল টক স্বাদযুক্ত পাবে।

(ii) ক্ষয়কারী: এসিডগুলো ক্ষয়কারী পদার্থ হিসেবে পরিচিত। যেমন–এসিডের মধ্যে এক খণ্ড লোহার পাত রাখলে লোহার পাতটির পৃষ্ঠতল ক্ষয়ে ঝাঁজরা হয়ে যায়।

(iii) লিটমাস পরীক্ষা: এসিড নীল বর্ণের লিটমাসকে লাল বর্ণে পরিণত করে। একটি পরীক্ষা নলে 2-3 মিলি হাইড্রোক্লোরিক এসিড নিয়ে এতে এক টুকরা নীল লিটমাস কাগজ যোগ করো। দেখবে

নীল রঙের লিটমাস কাগজটি লাল বর্ণে পরিণত হয়েছে। একইভাবে, H_2SO_4, HNO_3 বা অন্য যেকোনো এসিড নিয়ে এই পরীক্ষা করতে পারো। এমনকি তেঁতুল বা আচারের মধ্যেও পানিতে ভেজা নীল লিটমাস যোগ করলে নীল লিটমাস কাগজ লাল বর্ণে পরিণত হবে।

(iv) সক্রিয় ধাতুর সাথে এসিডের বিক্রিয়া: এসিড সক্রিয় ধাতুর (যেমন– K, Na, Mg ইত্যাদি) সাথে বিক্রিয়া করে সংশ্লিষ্ট ধাতুটির লবণ এবং হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করে। যেমন– Mg ধাতু, সালফিউরিক এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে $MgSO_4$ এবং H_2 গ্যাস উৎপন্ন করে। বিক্রিয়াটি হচ্ছে:

$$Mg + H_2SO_4 \longrightarrow MgSO_4 + H_2\uparrow$$

(v) ধাতব কার্বনেটের সাথে লঘু এসিডের বিক্রিয়া: লঘু এসিড ধাতব কার্বনেটের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ, পানি ও কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন করে। যেমন– ক্যালসিয়াম কার্বনেটের সাথে লঘু HCl বিক্রিয়া করে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড লবণ, পানি আর কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন করে। এখানে CO_2 গ্যাস বুদ্‌বুদ্‌ আকারে বেরিয়ে আসে।

$$CaCO_3 + 2HCl \longrightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2\uparrow$$

উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) কে চুনের পানির মধ্যে চালনা করলে চুনের পানি প্রথমে ঘোলা হয়। সংশ্লিষ্ট বিক্রিয়াটি হচ্ছে:

$$Ca(OH)_2 + CO_2 \longrightarrow CaCO_3 + H_2O$$

এখানে অদ্রবণীয় $CaCO_3$ উৎপন্ন হওয়ার জন্য চুনের পানিকে ঘোলা দেখায়। এই ঘোলা চুনের পানিতে অতিরিক্ত CO_2 গ্যাসকে চালনা করলে সেটি আবার স্বচ্ছ হয়ে যায়। এক্ষেত্রে অদ্রবণীয় $CaCO_3$ এর সাথে CO_2 এবং H_2O বিক্রিয়া করে দ্রবণীয় ক্যালসিয়াম বাইকার্বনেট [$Ca(HCO_3)_2$] উৎপন্ন করার কারণে ঘোলা চুনের পানিকে স্বচ্ছ দেখায়।

$$CaCO_3 + CO_2 + H_2O \longrightarrow Ca(HCO_3)_2$$

একইভাবে ধাতব কার্বনেটগুলো লঘু সালফিউরিক এসিড কিংবা লঘু নাইট্রিক এসিডের সাথে একই ধরনের বিক্রিয়া করে সালফেট লবণ বা নাইট্রেট লবণ উৎপন্ন করে।

$$Na_2CO_3 + H_2SO_4 \longrightarrow Na_2SO_4 + H_2O + CO_2$$

$$CaCO_3 + 2HNO_3 \longrightarrow Ca(NO_3)_2 + H_2O + CO_2$$

(vi) ধাতব বাইকার্বনেটের সাথে লঘু এসিডের বিক্রিয়া: ধাতব হাইড্রোজেন কার্বনেট বা ধাতব বাইকার্বনেটগুলোও লঘু এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ, পানি এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন করে। যেমন:

$$Ca(HCO_3)_2 + 2HCl \longrightarrow CaCl_2 + 2H_2O + 2CO_2$$

$$2NaHCO_3 + H_2SO_4 \longrightarrow Na_2SO_4 + 2H_2O + 2CO_2$$

$$NaHCO_3 + HNO_3 \longrightarrow NaNO_3 + H_2O + CO_2$$

(vii) ধাতুর হাইড্রোক্সাইডের (ক্ষারের) সাথে এসিডের বিক্রিয়া: ধাতুর হাইড্রোক্সাইড তথা ক্ষারের সাথে এসিড বিক্রিয়া করে লবণ এবং পানি উৎপন্ন করে। এটি একটি প্রশমন বিক্রিয়া। যেমন– লঘু NaOH দ্রবণে ধীরে ধীরে লঘু HCl দ্রবণ যোগ করলে NaCl (লবণ) এবং পানি উৎপন্ন হয়।

$$NaOH + HCl \longrightarrow NaCl + H_2O$$

(viii) ধাতুর অক্সাইডের সাথে এসিডের বিক্রিয়া: ধাতুর অক্সাইডের সাথে এসিড বিক্রিয়া করে লবণ এবং পানি উৎপন্ন করে। ধাতুর অক্সাইডগুলো সাধারণত ক্ষারীয় প্রকৃতির হয়। তাই এ ক্ষেত্রেও বিক্রিয়াটি প্রশমন প্রকৃতির হয়।

$$CaO + 2HCl \longrightarrow CaCl_2 + H_2O$$

একইভাবে লঘু সালফিউরিক এসিডের সাথে কপার অক্সাইড বিক্রিয়ায় কপার সালফেট ও পানি উৎপন্ন হয়।

$$H_2SO_4 + CuO \longrightarrow CuSO_4 + H_2O$$

কিংবা লঘু নাইট্রিক এসিডের সাথে ক্যালসিয়াম অক্সাইড বিক্রিয়া করে ক্যালসিয়াম নাইট্রেট এবং পানি উৎপন্ন করে।

$$2HNO_3 + CaO \longrightarrow Ca(NO_3)_2 + H_2O$$

৯.১.২ এসিডের রাসায়নিক ধর্মে পানির ভূমিকা

এতক্ষণ যে আলোচনা করা হয়েছে তার প্রতি ক্ষেত্রেই আমরা ‘লঘু এসিড দ্রবণ’ কথাটি উল্লেখ করেছি। লঘু এসিড দ্রবণ অর্থ পানির মধ্যে এসিড যোগ করে এসিডের দ্রবণ তৈরি করা হয়েছে। প্রশ্ন হলো এসিডের সাথে পানি যুক্ত থাকলে এসিডের ধর্মের কি কোনো পরিবর্তন ঘটে? ধরা যাক, তুমি কিছু দানাদার অক্সালিক এসিডের উপর শুষ্ক নীল লিটমাস পেপার স্পর্শ করিয়েছ, তুমি দেখবে লিটমাস পেপারের রং পরিবর্তিত হয়নি। পরিবর্তন না হওয়ার কারণ অনার্দ্র অক্সালিক এসিডের দানাতে কোনো হাইড্রোজেন আয়ন নেই। অনার্দ্র অক্সালিক এসিডকে পানিতে দ্রবীভূত করলে এটি

পানিতে বিয়োজিত হয়ে H^+ আয়ন প্রদান করবে, যা নীল লিটমাস পেপারকে লাল বর্ণে পরিণত করবে। অর্থাৎ জলীয় দ্রবণে উপস্থিত হাইড্রোজেন আয়ন অম্ল ধর্ম প্রদর্শন করে।

জলীয় দ্রবণে সাইট্রিক এসিড আংশিক বিয়োজিত হয়। ইথানয়িক এসিড, কার্বনিক এসিডও জলীয় দ্রবণে আংশিক বিয়োজিত হয়।

আংশিক বিয়োজিত হবার অর্থ হলো যতটি অণু দ্রবণে যোগ করা হলো তার মধ্যে অল্প কিছু অণু ভেঙে যায় বা বিয়োজিত হয় এবং বাকি অণুগুলো বিয়োজিত হয় না।

সাইট্রিক এসিড দানা + পানি $\longrightarrow$ সাইট্রিক এসিড (aq)

সাইট্রিক এসিড (aq) $\longrightarrow$ $H^+(aq)$ + সাইট্রেট আয়ন

জলীয় দ্রবণে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড সম্পূর্ণরূপে আয়নিত হয় এবং হাইড্রোজেন আয়ন উৎপন্ন করে:

হাইড্রোজেন ক্লোরাইড + পানি $\longrightarrow$ HCl(aq)

$$HCl(aq) \longrightarrow H^+(aq) + Cl^-(aq)$$

বিশুদ্ধ সালফিউরিক এসিড এবং নাইট্রিক এসিড বর্ণহীন তরল পদার্থ। এতে যৌগ দুটি আণবিক অবস্থায় থাকে। আয়নিত নয় বলে অর্থাৎ হাইড্রোজেন আয়ন উপস্থিত নয় বলে বিশুদ্ধ সালফিউরিক এসিড এবং নাইট্রিক এসিড এসিডের ধর্ম প্রদর্শন করবে না, তেমনি বিদ্যুৎ পরিবহণও করবে না। এই এসিডগুলোকে শুধু পানিতে দ্রবীভূত করলেই হাইড্রোজেন আয়ন উৎপন্ন করে, এসিডের ধর্ম প্রদর্শন করে এবং বিদ্যুৎ পরিবহণ করে। অর্থাৎ আমরা লিখতে পারি:

$H_2SO_4(l)$ + পানি $\longrightarrow$ $H_2SO_4(aq)$

$$H_2SO_4(aq) \longrightarrow 2H^+(aq) + SO_4^{2-}(aq)$$

একইভাবে:

$HNO_3(l)$ + পানি $\longrightarrow$ $HNO_3(aq)$

$$HNO_3(aq) \longrightarrow H^+(aq) + NO_3^-(aq)$$

যে সকল এসিড জলীয় দ্রবণে আংশিক আয়নিত হয় তারা দুর্বল এসিড। শক্তিশালী এসিড জলীয় দ্রবণে সম্পূর্ণ আয়নিত হয়। অর্থাৎ দুর্বল এসিডের দ্রবণে হাইড্রোজেন আয়নের পরিমাণ কম থাকে। কিন্তু শক্তিশালী এসিডের দ্রবণে H^+ আয়নের পরিমাণ তুলনামূলক বেশি থাকে।

৯.১.৩ গাঢ় এসিড

যে এসিডে পানির পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম থাকে সেই এসিডকে গাঢ় এসিড বলে। ল্যাবরেটরিতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের গাঢ় এসিড ব্যবহৃত হয়। যেমন– গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক ২০২৫

এসিড (HCl), গাঢ় সালফিউরিক এসিড (H_2SO_4), গাঢ় নাইট্রিক এসিড (HNO_3) ইত্যাদি। এই এসিডগুলো হাতে, মুখে, চোখে বা শরীরে পড়লে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। এজন্য হাতে হ্যান্ড গ্লাভস, চোখে গগলস, মুখে মাস্ক, শরীরে অ্যাপ্রোন ইত্যাদি পরিধান করে সতর্কতার সাথে কাজ করতে হবে।

গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক এসিড: হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস পানিতে দ্রবীভূত হয়ে যে দ্রবণ উৎপন্ন করে তাকে হাইড্রোক্লোরিক এসিড বলে। তুলনামূলক কম পরিমাণ পানিতে অধিক পরিমাণে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস দ্রবীভূত করে গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক এসিড (HCl) তৈরি করা হয়। গাঢ় HCl দ্রবণ যে বোতলে রাখা হয় সেই বোতলের মুখ খুললেই হালকা কুয়াশার মতো সৃষ্টি হয় এবং তীব্র ঝাঁজালো গন্ধ পাওয়া যায়। এজন্য গাঢ় HCl এসিডের মুখ খোলার আগে নাকে, মুখে মাস্ক এবং চোখে নিরাপদ চশমা পরে নিতে হয়।

$$HCl(g) + H_2O(l) \longrightarrow HCl(aq)$$

গাঢ় নাইট্রিক এসিড: নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড- গ্যাসকে পানিতে দ্রবীভূত করে নাইট্রিক এসিড তৈরি করা হয়। কম পরিমাণ পানিতে অধিক পরিমাণে NO_2 গ্যাস দ্রবীভূত করে গাঢ় নাইট্রিক এসিড HNO_3 তৈরি করা হয়।

$$3NO_2 + H_2O \longrightarrow 2HNO_3 + NO$$

গাঢ় নাইট্রিক এসিডের বোতলের মুখ খুললে হালকা কুয়াশার মতো গ্যাস বের হয় এবং তীব্র ঝাঁজালো গন্ধ পাওয়া যায়। নাইট্রিক এসিড যে কাচের বোতলে রাখা হয় সেই বোতলের বর্ণ বাদামি হয়। নাইট্রিক এসিড যে কাচের বোতলে রাখা হয় সেই কাচের বোতলের মধ্যে যদি আলো প্রবেশ করে তবে বোতলের মধ্যের HNO_3 আলোর উপস্থিতিতে ভেঙে যায়। HNO_3 যাতে আলোর উপস্থিতিতে বোতলের মধ্যে ভেঙে না যায় সেজন্য HNO_3 কে বাদামি বোতলের মধ্যে রাখা হয়। কারণ বাদামি বোতলের মধ্যে আলো প্রবেশ করতে পারে না।

গাঢ় সালফিউরিক এসিড: সালফার ট্রাই-অক্সাইড (SO_3) গ্যাস পানিতে দ্রবীভূত হয়ে সালফিউরিক এসিড উৎপন্ন হয়। যদি কম পরিমাণ পানিতে অধিক পরিমাণ SO_3 গ্যাস দ্রবীভূত করা হয় তবে গাঢ় সালফিউরিক এসিড (H_2SO_4) তৈরি হয়।

$$SO_3 + H_2O \longrightarrow H_2SO_4$$

৯.২ ক্ষারক এবং ক্ষার (Base and Alkali)

ক্ষারক (Base): সাধারণত ধাতু বা ধাতুর মতো ক্রিয়াশীল যৌগমূলকের অক্সাইড এবং হাইড্রোক্সাইড যা এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ ও পানি উৎপন্ন করে তাকে ক্ষারক বলে।

যেমন:

$$CaO + 2HCl \longrightarrow CaCl_2 + H_2O$$
$$2KOH + H_2SO_4 \longrightarrow K_2SO_4 + 2H_2O$$
$$NH_4OH + HCl \longrightarrow NH_4Cl + H_2O$$

CaO এবং KOH ছাড়াও ক্ষারকের উদাহরণ হচ্ছে: সোডিয়াম অক্সাইড (Na_2O), কপার অক্সাইড (CuO), ফেরাস অক্সাইড (FeO), সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড (NaOH), ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড $Ca(OH)_2$, ফেরাস হাইড্রোক্সাইড $Fe(OH)_2$, অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড (NH_4OH) ইত্যাদি।

অ্যামোনিয়াম আয়ন (NH_4^+), ফসফোনিয়াম আয়ন (PH_4^{+}) এগুলো ধাতুর মতো ক্রিয়াশীল মূলক। কেননা ধাতব আয়ন, যেমন Na^+, K^+ ইত্যাদি অধাতব আয়ন Cl^-, SO_4^{2-} ইত্যাদির সাথে যুক্ত হয়ে আয়নিক যৌগ NaCl, KCl, Na_2SO_4, K_2SO_4, উৎপন্ন করে তেমনই NH_4^+, PH_4^+ আয়ন Cl^-, SO_4^{2-} ইত্যাদির সাথে যুক্ত হয়ে আয়নিক যৌগ NH_4Cl, PH_4Cl, $(NH_4)_2SO_4$, $(PH_4)_2SO_4$, ইত্যাদি উৎপন্ন করে। **এসিডের সাথে ক্ষারের বিক্রিয়ায় লবণ ও পানি উৎপন্ন হওয়ার বিক্রিয়াকে এসিড-ক্ষারক প্রশমন বিক্রিয়া বলে।** তাই বলা হয় এসিড ক্ষারককে আর ক্ষারক এসিডকে প্রশমিত করে।

ক্ষার (Alkali): ধাতু বা ধাতুর মতো ক্রিয়াশীল যৌগমূলকের হাইড্রোক্সোইড যৌগ যা পানিতে দ্রবণীয় তাদেরকে ক্ষার বলে। কোনো যৌগের ক্ষার হবার জন্য 2টি শর্ত রয়েছে: (i) যৌগটিতে হাইড্রোক্সাইড (OH^-) যৌগমুলক থাকতে হবে এবং (ii) ঐ যৌগ পানিতে দ্রবীভূত হতে হবে।

NaOH ক্ষার, কারণ সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড যৌগে OH^- মূলক আছে এবং এটি পানিতে দ্রবণীয়। $Fe(OH)_2$ কে ক্ষার বলা যায় না। কারণ এটিতে OH^- গ্রুপ আছে কিন্তু এটি পানিতে দ্রবণীয় নয়, এটি শুধু ক্ষারক। CaO ক্ষারক, ক্ষার নয় কারণ CaO এ OH^- মূলক নাই। অর্থাৎ তোমরা বুঝতে পারলে **হাইড্রোক্সাইড মূলকধারী পানিতে দ্রবণীয় ক্ষারকগুলোই হলো ক্ষার।** তাই বলা যায় **সব ক্ষারকই ক্ষার নয় কিন্তু সব ক্ষারই ক্ষারক।**

বাসাবাড়িতে ক্ষার জাতীয় অনেক পদার্থ ব্যবহার করা হয়। যেমন- টয়লেট পরিষ্কার করার জন্য যে টয়লেট ক্লিনার ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ক্ষার থাকে। কাচ পরিষ্কার করার জন্য যে গ্লাস ক্লিনার ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড ক্ষার (NH_4OH) থাকে।

৯.২.১ লঘু ক্ষারের ধর্মসমূহ

বেশি পানির মধ্যে কম পরিমাণ ক্ষার যোগ করে যে দ্রবণ তৈরি করা হয় সেই দ্রবণকে লঘু ক্ষার দ্রবণ বলা হয়।

লিটমাস পরীক্ষা: একটি টেস্টটিউবে সামান্য পরিমাণ লঘু সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্রবণ নাও। লাল লিটমাস কাগজের এক টুকরা টেস্টটিউবের দ্রবণের মধ্যে যোগ করো। দেখবে লাল লিটমাস কাগজ নীল বর্ণ ধারণ করেছে। আবার, আরেকটি টেস্টটিউবের মধ্যে সামান্য পরিমাণ NaOH দ্রবণ নাও। এবার এই টেস্টটিউবের মধ্যে নীল লিটমাস কাগজ প্রবেশ করাও, দেখবে নীল লিটমাস কাগজ নীলই রয়ে গেছে। এই পরীক্ষা থেকে বোঝা যায়, **ক্ষার দ্রবণ শুধু লাল লিটমাস পেপারকে নীল করে।**

অনুভব: লঘু NaOH দ্রবণ হাত দিয়ে স্পর্শ করলে এক প্রকার পিচ্ছিল অনুভূতি সৃষ্টি হয়। ক্ষার দ্রবণ পিচ্ছিল জাতীয় পদার্থ। ক্ষার দ্রবণের কিছু ধর্ম এখানে আলোচনা করা হলো। তবে ক্ষারকে স্পর্শ করা হলে সেটি ত্বকের ক্ষতি করে।

৯.২.২ ধাতব লবণের সাথে লঘু ক্ষারের বিক্রিয়া

অ্যালুমিনিয়াম নাইট্রেট [$Al(NO_3)_3$] , ফেরাস নাইট্রেট [$Fe(NO_3)_2$], ফেরিক নাইট্রেট [$Fe(NO_3)_3$], জিংক নাইট্রেট [$Zn(NO_3)_2$] ইত্যাদি ধাতব লবণের সাথে লঘু ক্ষার বিক্রিয়া করে সংশ্লিষ্ট ধাতব হাইড্রোক্সাইড উৎপন্ন করে। উল্লেখ্য, এখানে শুধু ধাতব নাইট্রেট লবণ ব্যবহার করা হয়েছে। ধাতব নাইট্রেট লবণ ব্যতীত ধাতব ক্লোরাইড, ধাতব সালফেট, ধাতব কার্বনেট ইত্যাদি লবণ ব্যবহার করলেও সংশ্লিষ্ট ধাতব হাইড্রোক্সাইড উৎপন্ন হবে। নিচে ধাতব নাইট্রেট লবণের সাথে লঘু ক্ষারের বিক্রিয়া দেখানো হলো। যেমন-

$Al(NO_3)_3$ এর সাথে লঘু NaOH এর বিক্রিয়া

একটি টেস্টটিউবে $Al(NO_3)_3$এর দ্রবণ নিয়ে এর মধ্যে কয়েক ফোঁটা লঘু NaOH দ্রবণ যোগ করলে অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড [$Al(OH)_3$] এবং $NaNO_3$ উৎপন্ন হয়। $Al(OH)_3$ সাদা বর্ণের অধঃক্ষেপ হিসেবে টেস্টটিউবের নিচে জমা হয় এবং সোডিয়াম নাইট্রেট $NaNO_3$ পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। এটি পানিতে কোনো বর্ণ প্রদান করে না। সংশ্লিষ্ট বিক্রিয়া:

$$Al(NO_3)_3 + 3NaOH \longrightarrow \underset{\text{অধঃক্ষেপ}}{Al(OH)_3\downarrow} + 3NaNO_3$$

ফেরাস নাইট্রেট $Fe\ (NO_3)_2$ এর সাথে লঘু NaOH এর বিক্রিয়া

একটি টেস্টটিউবে $Fe\ (NO_3)_2$ এর দ্রবণ নিয়ে এর মধ্যে কয়েক ফোঁটা লঘু NaOH দ্রবণ যোগ করলে ফেরাস হাইড্রোক্সাইড [$Fe(OH)_2$] এর সবুজ বর্ণের অধঃক্ষেপ উৎপন্ন হয় এবং $NaNO_3$ পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। সংশ্লিষ্ট বিক্রিয়া:

$$Fe(NO_3)_2 + 2NaOH \longrightarrow \underset{\text{অধঃক্ষেপ}}{Fe(OH)_2\downarrow} + 2NaNO_3$$

ফেরিক নাইট্রেট $Fe(NO_3)_3$ **এর সাথে NaOH এর বিক্রিয়া**

একটি টেস্টটিউবে $Fe(NO_3)_3$ এর দ্রবণ নিয়ে এর মধ্যে কয়েক ফোঁটা লঘু NaOH দ্রবণ যোগ করলে $Fe(OH)_3$ এর লালচে বাদামি বর্ণের অধঃক্ষেপ উৎপন্ন হয় এবং সোডিয়াম নাইট্রেট $NaNO_3$ পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে।

সংশ্লিষ্ট বিক্রিয়া:

$$Fe(NO_3)_3 + 3NaOH \longrightarrow \underset{\text{অধঃক্ষেপ}}{Fe(OH)_3\downarrow} + 3NaNO_3$$

$Cu(NO_3)_2$ এর সাথে লঘু NaOH এর বিক্রিয়া

একটি টেস্টটিউবে $Cu(NO_3)_2$ এর দ্রবণ নিয়ে এর মধ্যে কয়েক ফোঁটা লঘু NaOH দ্রবণ যোগ করলে কপার হাইড্রোক্সাইড $[Cu(OH)_2]$ এর হালকা নীল বর্ণের অধঃক্ষেপ উৎপন্ন হয় এবং সোডিয়াম নাইট্রেট $NaNO_3$ পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। সংশ্লিষ্ট বিক্রিয়া:

$$Cu(NO_3)_2 + 2NaOH \longrightarrow \underset{\text{অধঃক্ষেপ}}{Cu(OH)_2\downarrow} + 2NaNO_3$$

$Zn(NO_3)_2$ এর সাথে লঘু NaOH এর বিক্রিয়া

একটি টেস্টটিউবে $Zn(NO_3)_2$ এর দ্রবণ নিয়ে এর মধ্যে কয়েক ফোঁটা লঘু NaOH দ্রবণ যোগ করলে জিংক হাইড্রোক্সাইড $[Zn(OH)_2]$ এর সাদা বর্ণের অধঃক্ষেপ উৎপন্ন হয় এবং সোডিয়াম নাইট্রেট $NaNO_3$ পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। সংশ্লিষ্ট বিক্রিয়া:

$$Zn(NO_3)_2 + 2NaOH \longrightarrow \underset{\text{অধঃক্ষেপ}}{Zn(OH)_2\downarrow} + 2NaNO_3$$

উপরের বিক্রিয়াগুলোতে দেখা যায়, ধাতব নাইট্রেট যৌগের সাথে ক্ষার দ্রবণ বিক্রিয়া করলে ঐ ধাতুর হাইড্রোক্সাইডের অধঃক্ষেপ উৎপন্ন হয়।

অ্যামোনিয়াম লবণের সাথে ক্ষারের বিক্রিয়া

একটি পাত্রে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড (NH_4Cl) নিয়ে এর মধ্যে ক্ষার (NaOH) যোগ করলে অ্যামোনিয়া গ্যাস (NH_3), সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCl) লবণ এবং পানি (H_2O) উৎপন্ন হয়।

$$NH_4Cl + NaOH \longrightarrow NH_3\uparrow + NaCl + H_2O$$

অ্যামোনিয়াম লবণের সাথে ক্ষারের একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিক্রিয়া আছে। যেকোনো অ্যামোনিয়াম লবণের সাথে ক্ষার বিক্রিয়া করে NH_3 গ্যাস উৎপন্ন করে। যেমন-

$$NH_4Cl + KOH \longrightarrow NH_3 + KCl + H_2O$$
$$2NH_4Cl + Ca(OH)_2 \longrightarrow 2NH_3 + CaCl_2 + 2H_2O$$
$$2NH_4Cl + CaO \longrightarrow 2NH_3 + CaCl_2 + H_2O$$

৯.২.৩ ক্ষারের রাসায়নিক ধর্মে পানির ভূমিকা

পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড এবং সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এই দুইটি যৌগেই আয়ন থাকে, তবে কঠিন অবস্থায় এই আয়ন মুক্ত থাকে না। এগুলোকে দ্রবীভূত করার সাথে সাথে সম্পূর্ণরূপে আয়নিত হয়ে মুক্ত হাইড্রোক্সাইড আয়ন উৎপন্ন করে। দ্রবণে কেবল হাইড্রোক্সাইড আয়নই ঋণাত্মক আধান বা চার্জ বহন করে।

$$KOH(s) + \text{পানি} \longrightarrow K^+(aq) + OH^-(aq)$$
$$NaOH(s) + \text{পানি} \longrightarrow Na^+(aq) + OH^-(aq)$$

অ্যামোনিয়া গ্যাস হচ্ছে অ্যামোনিয়া অণুর সমষ্টি। অ্যামোনিয়াকে পানিতে দ্রবীভূত করা হলে অ্যামোনিয়া গ্যাস ও পানির বিক্রিয়ায় অ্যামোনিয়াম আয়ন আর হাইড্রোক্সাইড আয়ন উৎপন্ন হয়। তবে পানিতে অ্যামোনিয়ার সামান্য অংশই দ্রবীভূত হয় এবং খুব অল্প সংখ্যক হাইড্রোক্সাইড আয়ন উৎপন্ন হয়।

সুতরাং, অ্যামোনিয়া দ্রবণে অ্যামোনিয়া অণু, পানির অণু এবং অল্পসংখ্যক অ্যামোনিয়াম আয়ন ও হাইড্রোক্সাইড আয়ন উপস্থিত থাকে। ভ্রাম্যমাণ হাইড্রোক্সাইড আয়নের উপস্থিতির উপর ক্ষার দ্রবণের বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে। যে সকল ক্ষার জলীয় দ্রবণে আংশিক আয়নিত হয় তারা দুর্বল ক্ষার। সবল ক্ষার জলীয় দ্রবণে সম্পূর্ণ আয়নিত হয়। অর্থাৎ দুর্বল ক্ষারের দ্রবণে হাইড্রোক্সাইড আয়নের পরিমাণ সবল ক্ষারের তুলনায় কম থাকে।

একক কাজ

নিচের প্রতিটি কাজ সম্পন্ন করো। চোখে দেখা যায় এমন একটি করে পরিবর্তন বর্ণনা করো। সংশ্লিষ্ট আয়নিক সমীকরণ লেখো।

লঘু সালফিউরিক এসিড দ্রবণে আয়রন গুঁড়া যোগ করা হলে।
লঘু হাইড্রোক্লোরিক এসিডে কঠিন সোডিয়াম কার্বনেট যোগ করা হলে।
কপার (II) সালফেট দ্রবণে অ্যামোনিয়া দ্রবণ যোগ করা হলে।

৯.৩ গাঢ় এসিড ও গাঢ় ক্ষারের ক্ষয়কারী ধর্ম (Corrosive Properties of Concentrated Acids and Alkali)

গাঢ় এসিড এবং গাঢ় ক্ষার অত্যন্ত ক্ষয়কারক পদার্থ। এগুলো কাপড়-চোপড় এবং শরীরে লাগলে ত্বক ও কাপড়কে ক্ষয় করতে পারে। এগুলো চোখে গেলে চোখ নষ্ট হয়। পানির মধ্যে গাঢ় এসিড বা গাঢ় ক্ষার অল্প অল্প করে যোগ করে তাকে দ্রবীভূত করে লঘু দ্রবণ তৈরি করা হয়।

যদি অসাবধানতাবশত কোনো গাঢ় এসিড বা গাঢ় ক্ষার শরীরে লেগে যায় তবে তোমাকে পানি দিয়ে বারবার সেই জায়গায় ধুতে হবে। এরপর শিক্ষককে জানাতে হবে।

একক কাজ

সবল ও দুর্বল এসিড অথবা সবল ও দুর্বল ক্ষারের পরীক্ষা

কোন এসিডটি সবল এবং কোন এসিডটি দুর্বল তা একটি পরীক্ষার মাধ্যমে জানা যায়। একটি বিকারে 50 mL লঘু হাইড্রোক্লোরিক এসিড নাও। এবার এই বিকারের মধ্য দুটি গ্রাফাইট দণ্ড এমনভাবে বসাও যাতে তারা একে অপরের সাথে স্পর্শ না করে। এবার একটি গ্রাফাইট দণ্ডকে ১টি তারের সাথে ব্যাটারির এক প্রান্তে এবং অপর গ্রাফাইট দণ্ডকে তারের সাথে বাল্বের মধ্যে দিয়ে ব্যাটারির অপর প্রান্তের সাথে যুক্ত করো। দেখবে বাল্বটি জ্বলে উঠেছে। এবার বাল্বটির আলোর উজ্জ্বলতার দিকে খেয়াল করো।

এবার অন্য একটি বিকারে ইথানয়িক এসিড নাও। ইথায়নিক এসিড একটি মৃদু এসিড। এবার এই মৃদু এসিড দ্রবণের মধ্যেও দুটি গ্রাফাইট দণ্ডকে প্রবেশ করাও। এবার একটি গ্রাফাইট দণ্ডকে একটি তারের সাথে ব্যাটারির এক প্রান্তে এবং অপর গ্রাফাইট দণ্ডকে তারের সাথে বাল্বের মধ্য দিয়ে ব্যাটারির অপর প্রান্তের সাথে যুক্ত করো। দেখবে বাল্বটি জ্বলে উঠেছে। এবার বাল্বটির আলোর উজ্জ্বলতার দিকে খেয়াল করো। তুমি দেখবে HCl দ্রবণে বাল্বটি যে পরিমাণ উজ্জ্বলতা সৃষ্টি করেছিল ইথানয়িক এসিড দ্রবণ তার চেয়ে কম পরিমাণ উজ্জ্বলতা সৃষ্টি করেছে।

তীব্র বা সবল এসিড জলীয় দ্রবণে মৃদু বা দুর্বল এসিড অপেক্ষা অধিক পরিমাণে H^+ সরবরাহ করে। অধিক পরিমাণে H^+ জলীয় দ্রবণে অধিক পরিমাণে বিদ্যুৎ পরিবহন করে। এজন্য বাল্বটি অধিক উজ্জ্বলতার সৃষ্টি করে। পক্ষান্তরে, মৃদু এসিড জলীয় দ্রবণে তীব্র এসিড অপেক্ষা কম পরিমাণে H^+

সরবরাহ করে। কম পরিমাণে H^+ জলীয় দ্রবণে কম পরিমাণে বিদ্যুৎ পরিবহণ করে। এজন্য বাল্বটি কম উজ্জ্বলতা সৃষ্টি করে।

মৃদু এসিড $\rightarrow$ কম পরিমাণে H^+ (প্রোটন) উৎপন্ন হয়।
তীব্র এসিড $\rightarrow$ বেশি পরিমাণে H^+ (প্রোটন) উৎপন্ন হয়।

(একইভাবে তীব্র ক্ষার NaOH ও মৃদু ক্ষার NH_4OH নিয়েও পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, NaOH দ্রবণ বাল্বটির অধিক উজ্জ্বলতা সৃষ্টি করে। পক্ষান্তরে, NH_4OH দ্রবণ বাল্বটির কম উজ্জ্বলতা সৃষ্টি করে। এই পরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হয় NaOH তীব্র ক্ষার, পক্ষান্তরে NH_4OH মৃদু ক্ষার।)

৯.৪ pH এর ধারণা (The Conception of pH)

কোনো জলীয় দ্রবণের প্রকৃতি অম্লীয় নাকি ক্ষারীয় নাকি নিরপেক্ষ প্রকৃতির ইত্যাদি জানার জন্য pH একক ব্যবহার করা হয়। কোনো দ্রবণের pH হলো ঐ দ্রবণে উপস্থিত হাইড্রোজেন আয়নের (H^+) ঘনমাত্রার ঋণাত্মক লগারিদম। অর্থাৎ-

$$pH = -\log[H^+]$$

(pH লেখার সময় p ছোট হাতের আর H বড় হাতের লেখা হয়)

$[H^+]$ দ্বারা H^+ আয়নের মোলার ঘনমাত্রা অর্থাৎ 1 লিটার দ্রবণে কত মোল H^+ আয়ন রয়েছে সেটা বোঝানো হয়।

1 লিটার বিশুদ্ধ পানিতে H^+ এর পরিমাণ 10^{-7} মোল।
বিশুদ্ধ পানির $pH = -\log[H^+] = -\log(10^{-7})$
অতএব, বিশুদ্ধ পানির $pH = 7$

তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে কোনো আয়ন থাকলে মোলারিটি এককে সেই আয়নের ঘনমাত্রা বোঝানো হয়।

যদি বিশুদ্ধ পানিতে এসিড যোগ করা হয় এবং এসিড যোগের কারণে যদি H^+ এর সংখ্যা 10 গুণ বেড়ে গিয়ে প্রতি লিটারে 10^{-6} মোল হয়, তাহলে দ্রবণের pH কমে যাবে।

$$pH = -\log[10^{-6}] = 6$$

H^+ আয়নের ঘনমাত্রা যত বেশি হবে pH এর মান তত কমতে থাকবে।

২০২৫

যদি বিশুদ্ধ পানির মধ্যে ক্ষার যোগ করা হয় তবে ক্ষারের OH^- বিশুদ্ধ পানির H^+ এর সাথে বিক্রিয়া করে ঐ দ্রবণে বিশুদ্ধ পানির তুলনায় H^+ এর সংখ্যা কমে যাবে।

যেমন: পানির মধ্যে ক্ষার যোগ করার কারণে যদি H^+ এর সংখ্যা কমে গিয়ে প্রতি লিটারে 10^{-10} মোল হয় তাহলে তার pH হবে

$$pH = -\log[10^{-10}] = 10$$

অর্থাৎ pH এর মান 7 থেকে বেড়ে যাবে। অর্থাৎ ক্ষারীয় দ্রবণের pH এর মান 7 থেকে বেশি। pH এর মান 7 হওয়ার অর্থ এটি ক্ষারও নয় আবার এসিডও নয়। এটি নিরপেক্ষ দ্রবণ। যদি কোনো দ্রবণের pH এর মান 7 থেকে কম হয় তাহলে সেই দ্রবণটি এসিডিক দ্রবণ এবং যদি কোনো দ্রবণের pH মান 7 থেকে বেশি হয় তবে সেই দ্রবণটি ক্ষারীয় দ্রবণ।

৯.৪.১ pH এর পরিমাপ

pH এর পরিমাপ করার জন্য pH স্কেল ব্যাবহার করা হয়।

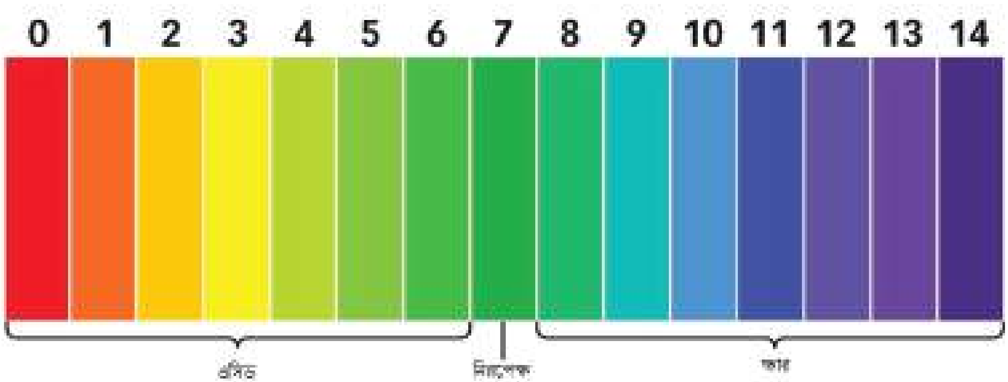

চিত্র ৯.০১: pH স্কেল (ইউনিভার্সাল ইন্ডিকেটরের বিভিন্ন pH এ বর্ণ)

pH স্কেল: যদিও অংকের হিসাবে pH এর মান ঋণাত্মক থেকে শুরু করে যেকোনো ধনাত্মক সংখ্যা হওয়া সম্ভব কিন্তু বাস্তব জীবনে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে pH এর মান 0 থেকে 14 পর্যন্ত বিবেচনা করা হয়।

নিরপেক্ষ কোনো দ্রবণের pH এর মান 7 এবং তোমরা দেখেছো যেকোনো এসিড দ্রবণের pH এর মান 7 এর চেয়ে কম অপরদিকে যেকোনো ক্ষারের দ্রবণের pH এর মান 7 এর চেয়ে বেশি। এই স্কেলে সবচেয়ে শক্তিশালী এসিডের pH এর মান 0 এবং সবচেয়ে শক্তিশালী ক্ষারের pH এর মান 14।

২০২৬

pH পরিমাপন পদ্ধতি: দ্রবণে হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা থেকে কীভাবে pH হিসাব করতে হয় তোমরা সেটা জেনেছ। এখন পরীক্ষার মাধ্যমে কোনো দ্রবণের pH কীভাবে পরিমাপ করা হয় সেটা জানবে। pH এর মান পরিমাপের জন্য ইউনিভার্সাল নির্দেশক (Universal indicator), pH পেপার (pH paper), pH মিটার (pH meter) প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়।

ইউনিভার্সাল নির্দেশক: বিভিন্ন এসিড–ক্ষার নির্দেশকের মিশ্রণ হলো ইউনিভার্সাল নির্দেশক (Universal Indicator)। ভিন্ন ভিন্ন pH মানের দ্রবণে ইউনিভার্সাল নির্দেশক ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ প্রদান করে। কোনো দ্রবণের জন্য ইউনিভার্সাল নির্দেশক কোন বর্ণ ধারণ করবে তা বোঝার জন্য একটি চার্ট রয়েছে। এই চার্টকে ইউনিভার্সাল নির্দেশক কালার চার্ট বলে। কোনো দ্রবণে কয়েক ফোঁটা ইউনিভার্সাল নির্দেশক যোগ করলে দ্রবণ যে বর্ণ ধারণ করে এই বর্ণ ইউনিভার্সাল নির্দেশক কালার চার্টের বর্ণের সাথে মিলিয়ে দ্রবণের pH পরিমাপ করা হয়।

pH পেপার: অজানা pH মানের দ্রবণের pH এর মান জানার জন্য pH পেপার ব্যবহার করা হয়। কোনো দ্রবণের মধ্যে এক টুকরা pH পেপার যোগ করলে পেপারের বর্ণের পরিবর্তন ঘটে। দ্রবণে কত pH মানের জন্য pH পেপারের বর্ণ কীরূপ হবে তার জন্য একটি স্ট্যান্ডার্ড কালার চার্ট আছে। এ চার্টের সাথে দ্রবণের pH পেপারের বর্ণ দেখে অজানা দ্রবণের pH এর মান জানা যায়।

pH মিটার: অজানা দ্রবণের pH মান জানার জন্য pH মিটার ব্যবহার করা হয়। pH মিটারের ইলেকট্রোডকে অজানা দ্রবণে ডুবিয়ে pH মিটারের ডিজিটাল ডিসপ্লে থেকে সরাসরি pH মান জানা যায়।

চিত্র ৯.০২: pH পেপার ও তার স্ট্যান্ডার্ড কালার চার্ট

চিত্র ৯.০৩: pH মিটার

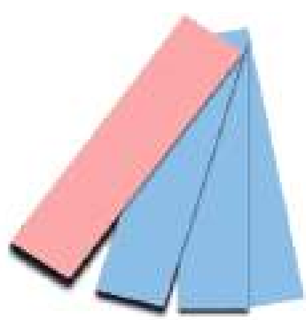

চিত্র ৯.০৩: লাল ও নীল লিটমাস পেপার

লিটমাস পেপার: মোটামুটিভাবে pH অনুমান করার জন্য সস্তা এবং সহজলভ্য লিটমাস পেপার ব্যবহার করা যায়। দ্রবণের pH 7 থেকে কম হলে লিটমাস পেপার লাল এবং 7 থেকে বেশি হলে লিটমাস পেপার নীল বর্ণ ধারণ করে।

৯.৪.২ pH এর গুরুত্ব

কৃষিক্ষেত্রে, জীবদেহে বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ায়, প্রসাধনী ব্যবহারে pH এর গুরুত্ব অপরিসীম। নিচে এগুলো ব্যাখ্যা করা হলো:

কৃষিক্ষেত্রে: কৃষিতে pH এর গুরুত্ব অপরিসীম। উদ্ভিদ তার শরীরের পুষ্টির জন্য মাটি থেকে বিভিন্ন আয়ন, পানি শোষণ করে। এর জন্য মাটির pH এর মান 6.0 থেকে 8.0 এর মধ্যে হলে সবচেয়ে ভালো। আবার, মাটির pH এর মান 3.0 এর কম বা 10 এর বেশি হলে মাটির উপকারী অণুজীব মারা যায়। মাটির pH এর মান কমে গেলে পরিমাণমতো চুন (CaO) ব্যবহার করা হয়। আবার মাটির pH এর মান বেড়ে গেলে পরিমাণমতো অ্যামোনিয়াম সালফেট, $(NH_4)_2SO_4$, অ্যামোনিয়াম ফসফেট $(NH_4)_3PO_4$ ইত্যাদি সার ব্যবহার করে মাটির pH কমানো হয়।

টেবিল ৯.০১: শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের pH

অঙ্গের নাম	pH
পাকস্থলী	1
মানুষের ত্বক	4.8-5.5
মূত্র	6
রক্ত	7.43-7.45
অগ্ন্যাশয় রস	8.1

জীবদেহে বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ায় pH: শরীরের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে তার জন্য শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে বিভিন্ন মানের pH প্রয়োজন হয়। পাশের ছকে সেগুলো উল্লেখ করা হলো:

প্রসাধনী (Cosmetics) ব্যবহারে: মানুষ ত্বক পরিষ্কার করতে, ত্বকের সৌন্দর্য রক্ষায়, চুল পরিষ্কার করতে এবং বিভিন্ন কাজে প্রসাধনী ব্যবহার করে। ত্বকের pH 4.8 থেকে 5.5 এর মধ্যে থাকলে ত্বক অম্লীয় প্রকৃতির যা ত্বকে জীবাণুর আক্রমণ বা বংশবৃদ্ধি প্রতিরোধ করে। তাই প্রসাধনীর pH 4.8 থেকে 5.5 থাকা ভালো।

৯.৫ প্রশমন বিক্রিয়া (Neutralization Reaction)

আমরা জানি, এসিড জলীয় দ্রবণে H^+ দান করে এবং ক্ষার জলীয় দ্রবণে OH^- দান করে। তাই এসিড ও ক্ষার একত্রে মিশ্রিত করলে এসিডের H^+ আয়ন এবং ক্ষারের OH^- আয়ন বিক্রিয়া করে পানি উৎপন্ন করে। যেমন– HCl পানিতে H^+ আয়ন এবং NaOH পানিতে OH^- দান করে। এ দ্রবণ দুটিকে একসাথে মিশ্রিত করলে এসিডের H^+ এবং ক্ষারের OH^- বিক্রিয়া করে পানি উৎপন্ন করে।

২০২৩

এসিডের বাকি ঋণাত্মক আয়ন Cl^- এবং ক্ষারের ধনাত্মক আয়ন Na^+ বিক্রিয়া করে লবণ ($NaCl$) উৎপন্ন করে। এসিড ক্ষারের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ ও পানি উৎপন্ন হওয়ার বিক্রিয়াকে প্রশমন বিক্রিয়া বলে। কেননা এ বিক্রিয়াতে এসিড তার এসিডত্ব হারায় আর ক্ষার তার ক্ষারকত্ব হারায় এবং প্রশম পদার্থ লবণ আর পানি উৎপন্ন করে।

$$\underset{\text{এসিড}}{\overset{+\;-}{NaOH}(aq)} + \underset{\text{ক্ষার}}{\overset{+\;-}{HCl}(aq)} \longrightarrow \underset{\text{লবণ}}{NaCl(aq)} + \underset{\text{পানি}}{H_2O(l)}$$

উপরের বিক্রিয়াতে দেখো এক মোল হাইড্রোক্লোরিক এসিড এক মোল সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডকে সম্পূর্ণরূপে প্রশমিত করে। কাজেই দুই মোল হাইড্রোক্লোরিক এসিড দুই মোল সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডকে সম্পূর্ণরূপে প্রশমিত করবে। আবার, সালফিউরিক এসিড ও সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের বিক্রিয়ায় সোডিয়াম সালফেট লবণ আর পানি উৎপন্ন করে।

$$\underset{\text{এসিড}}{H_2SO_4(aq)} + \underset{\text{ক্ষার}}{2NaOH(aq)} \longrightarrow \underset{\text{লবণ}}{Na_2SO_4(aq)} + \underset{\text{পানি}}{2H_2O(l)}$$

উপরের বিক্রিয়া হতে দেখা যায়, এক মোল সালফিউরিক এসিড দুই মোল সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডকে সম্পূর্ণরূপে প্রশমিত করে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোনো নির্দিষ্ট এসিডের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অপর কোনো নির্দিষ্ট ক্ষারের নির্দিষ্ট পরিমাণকে সম্পূর্ণরূপে প্রশমিত করবে।

৯.৫.১ দৈনন্দিন জীবনে প্রশমন বিক্রিয়ার গুরুত্ব

পরিপাক: খাদ্য হজম করতে পাকস্থলীতে হাইড্রাক্লোরিক এসিড নিঃসৃত হয়। কোনো কারণে পাকস্থলীতে এই এসিডের পরিমাণ বেশি হয়ে গেলে তখন পেটে অস্বস্তি বোধ হয়। সাধারণভাবে এটিকে এসিডিটি বলে। বেশিদিন এসিডিটি থাকলে পাকস্থলীতে ঘা হয়ে যেতে পারে। তাই এই এসিডকে প্রশমিত করতে এন্টাসিড নামক ওষুধ খেতে হয়। এন্টাসিডে $Al(OH)_3$ ও $Mg(OH)_2$ থাকে। এরা ক্ষারজাতীয় পদার্থ। তাই পেটের অতিরিক্ত হাইড্রোক্লোরিক এসিডকে এরা প্রশমিত করে।

$$Al(OH)_3 + 3HCl \longrightarrow AlCl_3 + 3H_2O$$
$$Mg(OH)_2 + 2HCl \longrightarrow MgCl_2 + 2H_2O$$

দাঁতের যত্নে: কখনো মিষ্টিজাতীয় খাবার খেয়ে মুখ পরিষ্কার না করলে কিছুক্ষণ পর মুখে টক টক অনুভূত হয়। আসলে মুখের মধ্যে অনেক ব্যাকটেরিয়া থাকে যা আমাদের খাওয়া খাবার থেকে বিভিন্ন ধরনের জৈব এসিড তৈরি করে। তাই মুখে টক স্বাদ অনুভূত হয়। এই এসিড দাঁতের এনামেলকে

(ক্যালসিয়ামের যৌগ) ক্ষয় করে। টুথপেস্টে থাকা ক্ষারজাতীয় পদার্থ এ সকল এসিডকে প্রশমিত করে। ফলে দাঁতের এনামেল রক্ষা পায়।

কৃষিক্ষেত্রে: গাছ যখন মাটি থেকে বিভিন্ন ধাতব আয়ন যেমন– Fe^{2+}, Mg^{2+}, Ca^{2+}, K^+ ইত্যাদি শোষণ করে তখন মাটি অম্লীয় হয়ে যায়। মাটির উর্বরতা হ্রাস পায়। মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করতে চুন ব্যবহার করতে হয়। চুনের রাসায়নিক নাম ক্যালসিয়াম অক্সাইড (CaO)। চুন মাটির অতিরিক্ত এসিডকে প্রশমিত করে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে।

৯.৫.২ লবণ

তোমরা ইতোমধ্যে জেনেছো যে, প্রশমন বিক্রিয়ায় এসিডের সাথে ক্ষার বিক্রিয়া করে লবণ এবং পানি উৎপন্ন হয়। লবণের ধনাত্মক আয়নটি ক্ষার থেকে আসে। তাই ধনাত্মক আয়নকে ক্ষারীয়মূলক (Basic radical) বলে। আর লবণের ঋণাত্মক আয়নটি এসিড বা অম্ল থেকে আসে। তাই লবণের ঋণাত্মক আয়নকে অম্লীয় মূলক (Acid radical) বলে। তীব্র এসিড ও তীব্র ক্ষারের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন লবণের জলীয় দ্রবণ নিরপেক্ষ প্রকৃতির। যেমন– NaCl, Na_2SO_4 ইত্যাদির জলীয় দ্রবণ নিরপেক্ষ। তীব্র এসিড ও মৃদু ক্ষারের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন লবণের জলীয় দ্রবণ অম্লীয় প্রকৃতির। যেমন– $FeCl_3$, $Zn(NO_3)_2$ ইত্যাদির জলীয় দ্রবণ অম্লীয়। তীব্র ক্ষার ও মৃদু এসিডের জলীয় দ্রবণ ক্ষারীয় প্রকৃতির। যেমন– Na_2CO_3, CH_3COONa (সোডিয়াম ইথানয়েট) ইত্যাদির জলীয় দ্রবণ ক্ষারীয় প্রকৃতির।

৯.৬ এসিড বৃষ্টি (Acid Rain)

অধাতুর অক্সাইডগুলো পানির সাথে বিক্রিয়া করে বিভিন্ন এসিড উৎপন্ন করে। বিশুদ্ধ বায়ুতে কিছু পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং নাইট্রোজেনের বিভিন্ন অক্সাইড থাকে। প্রাণী শ্বাস ক্রিয়ার সময় বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসরণ করে। আবার, যে স্থানে বজ্রপাত হয় সেই স্থানের বায়ুর তাপমাত্রা 3000°C সৃষ্টি হয়। এ তাপমাত্রায় বায়ুতে উপস্থিত N_2 ও O_2 বিক্রিয়া করে NO উৎপন্ন করে। NO বায়ুর অক্সিজেন দ্বারা জারিত হয়ে NO_2 উৎপন্ন করে। বৃষ্টির পানিতে এ সকল অক্সাইড দ্রবীভূত হয়ে সামান্য পরিমাণ এসিড উৎপন্ন করে। এই এসিড বৃষ্টির পানির সাথে মাটিতে পতিত হয়। **এসিডযুক্ত বৃষ্টিকে এসিড বৃষ্টি বলে।**

$$CO_2(g) + H_2O(l) \longrightarrow H_2CO_3(aq)$$
$$2NO_2(g) + H_2O(l) \longrightarrow HNO_2(aq) + HNO_3(aq)$$

তাই বৃষ্টির পানির pH এর মান 5 থেকে 6 এর মধ্যে হয়। কিন্তু মনুষ্য সৃষ্ট কিছু কারণ যেমন– বিভিন্ন যানবাহন থেকে, বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে, কলকারখানা থেকে প্রচুর পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড

বাতাসে চলে আসে, যা বৃষ্টির পানির সাথে বিক্রিয়া করে কার্বনিক এসিড (H_2CO_3) উৎপন্ন করে। এছাড়া বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ইটভাটা প্রভৃতিতে নাইট্রোজেন ও সালফারযুক্ত কয়লা বা পেট্রোলিয়াম ব্যবহার করলে নাইট্রোজেন ও সালফারের বিভিন্ন অক্সাইড উৎপন্ন করে। এরা বৃষ্টির পানিতে দ্রবীভূত হয়ে বিভিন্ন এসিড উৎপন্ন করে। এই এসিডসমূহ বৃষ্টির পানির সাথে মাটিতে পতিত হয়।

তাই কোনো স্থানে উপরোল্লেখিত কোনো কারণে কখনো কখনো বৃষ্টির পানিতে বিভিন্ন এসিডের পরিমাণ স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হয়ে যায়। ফলে বৃষ্টির পানির pH এর মান কমে 4 বা তারও কম হয়ে গেলে সে বৃষ্টিকে এসিড বৃষ্টি বলে। এর ফলে মাটির pH এর মান কমে যায়। ফলে ফসল বা গাছপালার বিরাট ক্ষতি হয়। জলাশয়ের পানির pH এর মান কমে যায়। ফলে জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী বসবাসের অনুপযুক্ত হয়ে যায়। মৎস্য উৎপাদন ব্যাহত হয়। এ ছাড়া এসিড বৃষ্টির কারণে দালান-কোঠা, ধাতুর তৈরি বিভিন্ন স্থাপনা, মার্বেল পাথর দিয়ে তৈরি স্থাপত্য বা ভাস্কর্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৯.৭ পানি (Water)

বিশুদ্ধ পানির অপর নাম জীবন। গোসল করা, কাপড় কাচাসহ বিভিন্ন কারণে পানি দূষিত হয়। বিভিন্ন কারণে পানি খর হয়। খর পানিকে বিভিন্ন উপায়ে আমরা মৃদু পানিতে পরিণত করতে পারি।

৯.৭.১ পানির খরতা (Hardness of Water)

পানির উৎস হলো নদী-নালা, খাল-বিল, পুকুর, সমুদ্র বা টিউবওয়েল ইত্যাদি। এসব পানিতে বিভিন্ন খনিজ লবণ দ্রবীভূত থাকতে পারে। পানিতে ক্যালসিয়াম বা ম্যাগনেসিয়ামের ক্লোরাইড, সালফেট, কার্বনেট, বাইকার্বনেট ইত্যাদি লবণ দ্রবীভূত থাকলে উক্ত পানি সাবানের সাথে সহজে ফেনা উৎপন্ন করে না। এ ধরনের পানিকে খর পানি বলে। অবশ্য ক্যালসিয়াম বা ম্যাগনেসিয়াম ছাড়া আয়রন, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি লবণ দ্রবীভূত থাকলেও পানি খর হতে পারে। খর পানিতে সাবান ঘষলে সহজে ফেনা উৎপাদন করে না কেন? কারণ সাবান হলো উচ্চতর জৈব এসিডের সোডিয়াম বা পটাশিয়াম লবণ। যেমন–সোডিয়াম স্টিয়ারেট ($C_{17}H_{35}COONa$) হলো স্টিয়ারিক এসিডের সোডিয়াম লবণ। এটি সাবান হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এ সাবান দিয়ে খর পানিতে কাপড় কাচা হলে যতক্ষণ পানিতে ক্যালসিয়াম বা ম্যাগনেসিয়ামের লবণ উপস্থিত থাকে ততক্ষণ ফেনা উৎপন্ন হয় না এবং সাবান ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে।

$$2C_{17}H_{35}COONa + CaCl_2 \longrightarrow (C_{17}H_{35}COO)_2Ca + 2NaCl$$

ম্যাগনেসিয়াম বা অন্যান্য ধাতুর লবণও একই রূপ বিক্রিয়া করে। পানির পাইপ বা কলকারখানাতে বয়লারের ভিতরে খর পানি ব্যবহার করলে খর পানিতে বিদ্যমান বিভিন্ন খনিজ লবণ পাইপের গায়ে

জমা হয়। ফলে পাইপের গায়ে মোটা আস্তরণ পড়ে। এতে পানির পাইপে পানি প্রবাহে বাধা পায়। বয়লারে তাপের অপচয় ঘটে এমনকি বয়লার ফেটে বিস্ফোরণ পর্যন্ত ঘটতে পারে। **পানির মধ্যে যে ধর্মের জন্য পানিতে সাবান ভালোভাবে ময়লা পরিষ্কার করতে পারে না পানির সেই ধর্মকে পানির খরতা বলে।** পানির খরতা দুই প্রকার, অস্থায়ী খরতা এবং স্থায়ী খরতা:

(i) অস্থায়ী খরতা: পানিতে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, আয়রন প্রভৃতি লবণের বাইকার্বনেট (HCO_3^-) লবণ দ্রবীভূত থাকলে যে খরতা সৃষ্টি হয় তাকে অস্থায়ী খরতা বলে এবং এই পানিকে অস্থায়ী খর পানি বলা হয়। অস্থায়ী খর পানিকে শুধু উত্তপ্ত করলেই অদ্রবণীয় কার্বনেট লবণ উৎপন্ন হয়। এ লবণ পাত্রের নিচে তলানি আকারে জমা হয়। এই তলানি থেকে ছাঁকনির মাধ্যমে পানিকে সহজেই পৃথক করা যায়। ফলে অস্থায়ী খরতা দূর হয় এবং অস্থায়ী খর পানি মৃদু পানিতে পরিণত হয়।

$$Ca(HCO_3)_2 \xrightarrow{\Delta} CaCO_3(s)\downarrow + CO_2(g)\uparrow + H_2O(l)$$

(ii) স্থায়ী খরতা: পানিতে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, আয়রন প্রভৃতি ধাতুর ক্লোরাইড বা সালফেট লবণ দ্রবীভূত থাকলে স্থায়ী খরতার সৃষ্টি হয় এবং এই পানি স্থায়ী খর পানি বলে। স্থায়ী খর পানিকে শুধু উত্তপ্ত করলেই স্থায়ী খরতা দূরীভূত হয় না। বিভিন্ন বিক্রিয়ার মাধ্যমে বা বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে স্থায়ী খরতা দূর করা হয়। সাধারণত বদ্ধ জলাশয় যেমন—পুকুর, ডোবা ইত্যাদির পানি মৃদু হয়। বৃষ্টির পানিও মৃদু পানি। মৃদু পানিতে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, আয়রন প্রভৃতি ধাতুর লবণ খুব বেশি দ্রবীভূত থাকে না। স্থায়ী খর পানি থেকে স্থায়ী খরতা অপসারণ করে ঐ পানিকে মৃদু পানিতে পরিণত করা হয়।

স্থায়ী খরতা দূরীকরণের পদ্ধতি: স্থায়ী খর পানির মধ্যে সোডিয়াম কার্বনেট যোগ করলে সোডিয়াম কার্বনেট ক্যালসিয়াম আয়ন ও ম্যাগনেসিয়াম আয়নের সাথে বিক্রিয়া করে ক্যালসিয়াম কার্বনেট এবং ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেটের অধঃক্ষেপ উৎপন্ন করে। ফলে পানি থেকে ক্যালসিয়াম আয়ন এবং ম্যাগনেশিয়াম আয়ন পানি থেকে অপসারিত হয় অর্থাৎ স্থায়ী খরতা দূর হয়।

$$CaCl_2 + Na_2CO_3 \longrightarrow CaCO_3\downarrow + 2NaCl$$

৯.৭.২ পানিদূষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ

পানিদূষণ

উদ্ভিদ ও প্রাণী দেহের বেশির ভাগই পানি। তাই প্রতিটি জীবের জন্য প্রচুর বিশুদ্ধ পানির প্রয়োজন। কিন্তু এই পানি নানাভাবে দূষিত হচ্ছে। যেমন– গৃহস্থালি বর্জ্য বা মলমূত্র বৃষ্টির পানিতে বা অন্যভাবে ধুয়ে নদী, খাল-বিল, পুকুর প্রভৃতি জলাশয়ে এসে পড়ছে। এছাড়াও হাসপাতাল থেকে

ওষুধপথ্য বা রোগীর বিভিন্ন ব্যবহার্য দ্রব্য ধুয়ে বিভিন্ন জলাশয়ের পানিতে এসে পড়ছে। কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত সার ও কীটনাশক বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে নদী-নালা, খাল-বিল, পুকুরের পানিতে এসে পড়ছে। শিল্পকারখানা থেকে বিভিন্ন রাসায়নিক বর্জ্য, বিভিন্ন যানবাহন থেকে বিশেষ করে জ্বালানি বর্জ্য পানিতে এসে পড়ে। ফলে পানি দুর্গন্ধযুক্ত ও বিষাক্ত হয়ে পড়ছে। এসব বর্জ্য থেকে বিভিন্ন ধরনের দূষক পদার্থের সাথে পানিতে লেড, ক্যাডমিয়াম, মার্কারি, ক্রোমিয়াম প্রভৃতি ভারী ধাতু মেশে। ভারী ধাতুগুলো মানুষের শরীরে ক্যানসারের মতো কঠিন রোগের সৃষ্টি করতে পারে।

আবার মানুষের কর্মকাণ্ডে শুধু ভূ-পৃষ্ঠের পানি নয় ভূ-গর্ভস্থ পানিও দূষিত হচ্ছে। যেমন– অগভীর নলকূপের সাহায্যে অতিরিক্ত পানি উত্তোলনের ফলে এবং অতিরিক্ত খননের ফলে ভূ-গর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক পাওয়া যায়। আর্সেনিক একটি বিষাক্ত পদার্থ। একটি নির্দিষ্ট মাত্রার অতিরিক্ত আর্সেনিকযুক্ত পানি পান করলে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

দূষণ নিয়ন্ত্রণ

আমাদের দেশে বড় শহরগুলোতে বর্জ্য শোধনাগার রয়েছে। তা আবার প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। পয়ঃপ্রণালির বর্জ্য এবং গৃহস্থালির পচনশীল বর্জ্য থেকে বায়োগ্যাস উৎপাদনের পাশাপাশি জৈব সার পাওয়া যায়। এ বিষয়ে যথাযথ উদ্যোগ নিলে পরিবেশ ও পানি দূষণ হ্রাস পাবে। ছোট ছোট বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন করলে মানুষ ও পশুপাখির মলমূত্র এবং গৃহস্থালির বর্জ্য ব্যবহার করে বায়োগ্যাস ও জৈব সার পাওয়া যাবে, যা আমাদের জ্বালানি সংকট হ্রাস ও কৃষিক্ষেত্রে সারের খরচ কমাতে সাহায্য করবে।

পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিবেশ আইনে প্রত্যেক শিল্পকারখানায় বর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপন করা বাধ্যতামূলক। কোনো অবস্থাতেই শিল্পকারখানার বর্জ্য পরিবেশ বা উন্মুক্ত জলাশয়ে ফেলা যাবে না। এ বিষয়ে সবাইকে সচেতন থাকতে হবে। পরিবেশ অধিদপ্তরকে তথ্য দিয়ে সাহায্য করতে হবে। মনে রাখতে হবে দেশে সংগঠিত জনসচেতনতা ও জনমতই দূষণ রোধের সবচেয়ে কার্যকর উপায়।

৯.৭.৩ পানির বিশুদ্ধতার পরীক্ষা ও বিশুদ্ধকরণ

বিশুদ্ধতার পরীক্ষা

বর্ণ ও গন্ধ পর্যবেক্ষণ: বিশুদ্ধ পানি বর্ণহীন ও গন্ধহীন স্বচ্ছ তরল পদার্থ। এতে সামান্য পরিমাণ খনিজ লবণ দ্রবীভূত থাকে। তবে কোনো কোনো খনিজ লবণ পানিতে অধিক পরিমাণ দ্রবীভূত থাকলে পানি দূষিত হয়। কোনো পানিতে গন্ধ পাওয়া গেলে বা ঘোলাটে দেখা গেলে অথবা ফিল্টার পেপারে ছাঁকা হলে তলানি পাওয়া গেলে পানি দূষিত।

পানির তাপমাত্রা: গ্রীষ্মকালে পানির তাপমাত্রা 30-35°C হয়। কখনো তা 40°C হতে পারে। কোনো কারণে পানির তাপমাত্রা কয়েক ডিগ্রি বেশি হলে তাপ দূষণ হয়েছে বলা যায়। বিদ্যুৎ কেন্দ্রের

২০২৩

যন্ত্রপাতি ঠান্ডা করার পানি বা বয়লারের পানি সরাসরি জলাশয়ে মুক্ত করা হলে পানির তাপ দূষণ হয়। থার্মোমিটার দিয়ে পানির তাপমাত্রা নির্ণয় করে পানির তাপ দূষণ শনাক্ত করা যায়।

পানির pH মান: পানির pH মান 4.5 থেকে কম এবং 9.5 অপেক্ষা বেশি হলে তা জীবের বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়ে। pH পেপার বা pH মিটার ব্যবহার করে পানির pH এর মান নির্ণয় করা যায়।

BOD: BOD এর পূর্ণ রূপ হলো Biological Oxygen Demand। অর্থাৎ BOD এর বাংলা অর্থ হলো জৈব রাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা। এক লিটার পানিতে উপস্থিত পচনযোগ্য জৈব দূষককে ব্যাকটেরিয়ার মতো অণুজীব দ্বারা ভাঙতে যে পরিমাণ অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় তাকে উক্ত পানির BOD বলে। **কোনো পানির BOD এর মান যত বেশি হয় সে পানি তত বেশি দূষিত হয়।**

COD: COD এর পূর্ণরূপ হলো Chemical Oxygen Demand। অর্থাৎ COD এর বাংলা অর্থ হলো রাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা। এক লিটার পানিতে উপস্থিত জৈব ও অজৈব দূষককে রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা ভাঙতে যে পরিমাণ অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় তাকে উক্ত পানির COD বলে। **কোনো পানির COD এর মান যত বেশি হয় সে পানি তত বেশি দূষিত হয়।**

BOD ও COD উভয়ই পানির দূষণ মাত্রা প্রকাশ করতে ব্যবহৃত হয়। কোনো পানির COD এর মান BOD অপেক্ষা বেশি হয়। কেননা, পানিতে উপস্থিত শুধু জৈব বস্তুকে ভাঙতে প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের পরিমাণ হলো BOD। অপরদিকে, সকল জৈব ও অজৈব দূষক তা অণুজীব দ্বারা পচনযোগ্য হোক বা না হোক তাদের রাসায়নিকভাবে সম্পূর্ণরূপে জারিত করতে যে পরিমাণ অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় তাকে উক্ত পানির COD বলে। সুতরাং একই পানির COD এর মান BOD অপেক্ষা বেশি হবে।

পানি বিশুদ্ধকরণ

ক্লোরিনেশন (Chlorination): পানিকে জীবাণুমুক্ত করার সবচেয়ে সহজ উপায় হলো ক্লোরিনেশন। পানিতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ ব্লিচিং পাউডার যোগ করলে উৎপন্ন ক্লোরিন জারিত করার মাধ্যমে জীবাণুকে ধ্বংস করে। এ পদ্ধতিকে পানির ক্লোরিনেশন বলা হয়। এক্ষেত্রে পানিতে ব্লিচিং পাউডার যোগ করার পর ছেঁকে নিলে পানি জীবাণুমুক্ত হয়।

ফুটানো (Boiling): পানিকে কমপক্ষে 15 থেকে 20 মিনিট ধরে ফুটালে পানি জীবাণুমুক্ত হয়। তবে আর্সেনিকযুক্ত পানি ফুটালে তা আরও ক্ষতিকর হয়।

থিতানো (Sedimentation): এক বালতি পানিতে 1 চামচ ফিটকিরি ($K_2SO_4 . Al_2(SO_4)_3 . 24H_2O$) গুঁড়া যোগ করে আধা ঘণ্টা রেখে দিলে পানির সব অপদ্রব্য থিতিয়ে বালতির তলায় জমা হয়। তারপর উপর থেকে পানি ঢেলে পৃথক করা হয়। এভাবে অদ্রবণীয় দূষক দূর হয়।

ছাঁকন (Filtration): বর্তমানে বাজারে জীবাণু, আর্সেনিক ও অন্য দূষক দূর করতে ফিল্টার পাওয়া যাচ্ছে। এই ফিল্টার দিয়ে ছেঁকে নিলে বিশুদ্ধ পানি পাওয়া যায়।

পরীক্ষণ

লিটমাস পেপারের সাহায্যে সরবরাকৃত আপেলের অম্লীয় বা ক্ষারীয় প্রকৃতি নির্ণয়

মূলনীতি: খাদ্য অম্লীয়, ক্ষারীয় বা নিরপেক্ষ প্রকৃতির হতে পারে। যেসব খাদ্য অম্লীয় প্রকৃতির তাদের জলীয় দ্রবণ নীল লিটমাস পেপারকে লাল করে। যেসব খাদ্য ক্ষারীয় প্রকৃতির সেগুলোর জলীয় দ্রবণ লাল লিটমাস পেপারকে নীল করে। নিরপেক্ষ প্রকৃতির খাদ্যের জলীয় দ্রবণ লিটমাস পেপারের বর্ণের কোনো পরিবর্তন করে না।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্য: পেষণ যন্ত্র, টেস্টটিউব, কাচদণ্ড, ছাঁকন কাগজ, ফানেল, নীল লিটমাস পেপার, লাল লিটমাস পেপার, পাতিত পানি, আপেল কুচি।

কার্যপ্রণালি

1. পেষণ যন্ত্রে কয়েকটি আপেল কুচি এবং সামান্য পানি নিয়ে সেটিকে ভালোভাবে পিষে আপেলের পেস্ট তৈরি করো।
2. আপেলের পেস্ট বিকারে নাও।
3. বিকারে 10 mL পাতিত পানি নিয়ে কাচদণ্ডের সাহায্যে আপেলের পেস্টকে পানি দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নাও।
4. এবার ছাঁকন কাগজ আর ফানেলের সাহায্যে মিশ্রণটিকে ছেঁকে নিয়ে একটি টেস্টটিউবে মিশ্রণের জলীয় অংশটুকু নাও।
5. টেস্টটিউবের জলীয় অংশে একবার নীল লিটমাস পেপার আর একবার লাল লিটমাস পেপার ডুবাও এবং বর্ণের পরিবর্তন লক্ষ করো।

পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত

খাদ্যের নাম	লিটমাস পেপারের বর্ণের সম্ভাব্য পরিবর্তন	সিদ্ধান্ত
আপেল	নীল লিটমাস পেপারের বর্ণ লাল হয়েছে কিন্তু লাল লিটমাসের বর্ণের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি।	আপেল অম্লীয় প্রকৃতির
আপেল	লাল লিটমাস পেপারের বর্ণ নীল হয়েছে কিন্তু নীল লিটমাসের বর্ণের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি।	আপেল ক্ষারীয় প্রকৃতির

ফলাফল: সঠিকভাবে পরীক্ষাটি করতে পারলে তোমরা দেখবে আপেল অম্লীয় প্রকৃতির খাদ্য।

একক কাজ

আপেলের কুচির যেমন পরীক্ষা তুমি করলে একইভাবে ভাত এবং শশার ক্ষেত্রে পরীক্ষা সম্পাদন করলে দেখা যাবে ভাত নিরপেক্ষ প্রকৃতির। অর্থাৎ ভাত লাল লিটমাস এবং নীল লিটমাসের কোনো বর্ণ পরিবর্তন করে না। শসা ক্ষারীয় প্রকৃতির অর্থাৎ শসা লাল লিটমাসকে নীল করে।

একক কাজ

pH পেপার তৈরি

রঙিন শাকশবজি (যেমন- লালশাক, লাল বাঁধাকপি, বিট ইত্যাদি) বা রঙিন ফুল (যেমন– রক্তজবা, লাল গোলাপ, ডালিয়া) এর যেকোনো একটি নাও। ছোট ছোট করে কেটে হালকা আঁচে ভাপে সিদ্ধ করো। যে রঙিন নির্যাস পাওয়া যাবে তাতে এক টুকরা ফিল্টার পেপার ডুবাও। বাতাসে রেখে শুকিয়ে নাও এবং শুকানোর পর চিকন চিকন করে কেটে নাও। তৈরি হয়ে গেল তোমার pH পেপার।

এই পেপার জানা pH মান দ্রবণে ডুবিয়ে pH পরিসরের কালার চার্ট তৈরি করো। সবচেয়ে ভালোটি ব্যবহারের জন্য বেছে নাও।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. চুনাপাথর ও লঘু নাইট্রিক এসিডের বিক্রিয়ায় কোনটি উৎপন্ন হয়?

(ক) NO_2 (খ) CO_2

(গ) SO_2 (ঘ) NH_3

২. নিচের কোনটি ক্ষার?

(ক) $Al(OH)_3$ (খ) $Fe(OH)_2$

(গ) $Cu(OH)_2$ (ঘ) NaOH

৩. কমলালেবুতে কোন এসিড উপস্থিত থাকে?

(ক) ল্যাকট্রিক এসিড (খ) টারটারিক এসিড

(গ) ট্যানিক এসিড (ঘ) সাইট্রিকএসিড

৪. ইথানয়িক এসিড দ্রবণের pH এর মান 4। দ্রবণের pH বৃদ্ধি করতে যোগ করতে হবে-

i. অ্যামোনিয়া দ্রবণ

ii. হাইড্রোক্লোরিক এসিড

iii. ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii

(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৫. কোনটি পরিষ্কার চুনের পানিকে ঘোলা করে?

(ক) CaO (খ) HCl

(গ) SO_2 (ঘ) CO_2

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. পাশের চিত্র।

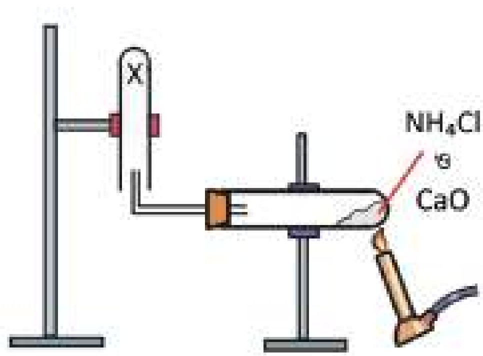

(ক) NO_2 গ্যাসের বর্ণ কী?

(খ) চুনের পানির pH-এর মান 7 থেকে বেশি না কম হবে? ব্যাখ্যা করো।

(গ) 'X' গ্যাসটির জলীয় দ্রবণের একটি রাসায়নিক ধর্ম ব্যাখ্যা করো।

(ঘ) HCl গ্যাসের মধ্যে 'X' গ্যাস চালনা করলে কী ঘটবে? সমীকরণসহ লেখো।

২. টেক্সটাইল মিল ও ডায়িং শিল্প, রং ও সালফিউরিক এসিডযুক্ত বর্জ্য সরাসরি নিকটস্থ জলাশয়ে ফেলছে। ফলে ঐ সকল জলাশয় জলজ প্রাণীর বসবাসের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ছে।

(ক) তেঁতুলে কোন এসিড থাকে?

(খ) উদ্দীপকের জলাশয়ে pH মান সম্পর্কে তোমার ধারণা ব্যাখ্যা করো।

(গ) টেক্সটাইল মিল ও ডায়িং শিল্পের দূষণ নিয়ন্ত্রণ প্লান্টে এসিড দূষণ নিয়ন্ত্রণে যৌক্তিক পরামর্শ দাও।

(ঘ) টেক্সটাইল মিল ও ডায়িং শিল্পের আশপাশে এসিড বৃষ্টির সম্ভাবনা বিক্রিয়াসহ বিশ্লেষণ করো।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. 'ফরমিক এসিড একটি দুর্বল এসিড'- ব্যাখ্যা করো ।

২. $FeCl_3$ এর জলীয় দ্রবণ কোন প্রকৃতির? ব্যাখ্যা করো ।

৩. pH=12.5 মান বিশিষ্ট জমির উর্বরতা কিভাবে বৃদ্ধি করা যায়? ব্যাখ্যা করো ।

দশম অধ্যায়

খনিজ সম্পদ: ধাতু-অধাতু

(Mineral Resources: Metals and Non-metals)

নানা বর্ণের খনিজ পাথর

টিন, লোহা, তামা, সোনা, চিনামাটির তৈরি থালাবাসন, প্রাকৃতিক গ্যাসসহ হাজার হাজার প্রয়োজনীয় সামগ্রী আমরা পারিবারিক জীবন, শিল্পকারখানাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত ব্যবহার করে আসছি। এগুলো মৌলিক, যৌগিক বা বিভিন্ন মৌল ও যৌগের মিশ্রণ হতে পারে। এদের মধ্যে অনেক পদার্থ খনি থেকে পাওয়া যায়। খনিজ সম্পদ কী? কীভাবে খনি থেকে ধাতু ও অধাতু পাওয়া যায়? আবার সেগুলোকে কীভাবে সংরক্ষণ করা যায় বা এগুলো থেকে কীভাবে অন্য কোনো প্রয়োজনীয় সামগ্রী তৈরি করা যায় সেগুলো নিয়েই এ অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- খনিজ সম্পদের ধারণা দিতে পারব।
- শিলা, খনিজ ও আকরিকের মধ্যে তুলনা করতে পারব।
- ধাতুসমূহের নিষ্কাশনের উপযুক্ত উপায় নির্ধারণ করতে পারব।
- ধাতুসংকর তৈরির কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সালফারের উৎস এবং এদের কতিপয় প্রয়োজনীয় যৌগ প্রস্তুতের বিক্রিয়া, রাসায়নিক ধর্মের বর্ণনা এবং গৃহে, শিল্পে ও কৃষিক্ষেত্রে তা ব্যবহারের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব।
- খনিজ দ্রব্যের সসীমতা, যথাযথ ব্যবহার ও পুনর্ব্যবহারের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব।
- খনিজ দ্রব্যের ব্যবহারে সতর্কতা এবং সংরক্ষণে আগ্রহ প্রদর্শন করতে পারব।

১০.১ খনিজ সম্পদ (Mineral Resources)

খনিজ সম্পদ (Mineral Resources) বলতে সাধারণভাবে ভূতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ায় প্রাকৃতিকভাবে শিলা বা মৃত্তিকার মধ্যে সৃষ্ট কঠিন, তরল বা গ্যাসীয় পদার্থকে বোঝায়, যা উত্তোলন ও প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কাজে ব্যবহার করা যায়। সহজ ভাষায়, খনিজ সম্পদ হল সেই সব উপাদান যা পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে আহরণ করা যায় এবং যা বিভিন্ন শিল্প ও অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা হয়।

খনিজ সম্পদকে সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা যায়:

১. ধাতব খনিজ (Metallic Minerals): যে সকল খনিজ থেকে ধাতু নিষ্কাশন করা যায়, যেমন- লোহা, তামা, সোনা, রূপা ইত্যাদি।

২. অধাতব খনিজ (Non-metallic Minerals): যে সকল খনিজ থেকে ধাতু পাওয়া যায় না, যেমন- চুনাপাথর, কয়লা, খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস ইত্যাদি।

খনিজ সম্পদ মানুষের জীবনযাত্রার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণ প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া যায় যা রান্নার কাজে, যানবাহনের জ্বালানি হিসেবে, বিদ্যুৎ উৎপাদনে বা বিভিন্ন শিল্পকারখানায় কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে পেট্রোলিয়ামের খনি রয়েছে, যা তারা সারা পৃথিবীতে রপ্তানি করছে এবং সমস্ত পৃথিবীর খনিজ তেলের চাহিদা পূরণ করছে। দক্ষিণ আফ্রিকাতে রয়েছে সোনা ও হীরার খনি। এছাড়া বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরনের খনি পাওয়া যায়, যা দেশ তথা সমগ্র পৃথিবীর উন্নয়নে মুখ্য ভূমিকা পালন করছে।

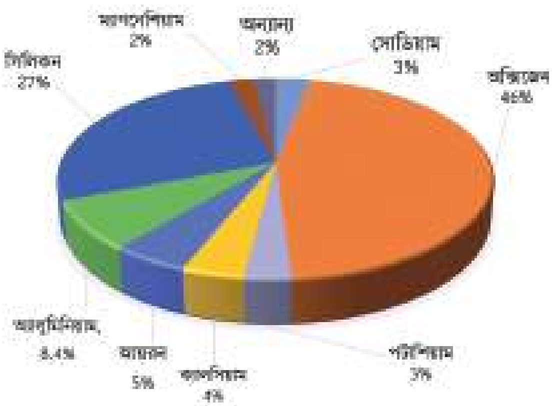

চিত্র ১০.০১: ভূত্বকের প্রধান প্রধান উপাদান

১০.১.১ শিলা (Rocks)

বিভিন্ন খনিজ পদার্থ মিশ্রিত হয়ে কিছু শক্ত কণা তৈরি হয়, ঐ শক্ত কণাসমূহ একত্র হয়ে যে পদার্থ তৈরি হয় তাকে শিলা বলে। এসব শিলা যেভাবে তৈরি হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে শিলা সাধারণত তিন প্রকার: (i) আগ্নেয় শিলা, (ii) পাললিক শিলা ও (iii) রূপান্তরিত শিলা।

আগ্নেয় শিলা (Igneous Rock)

আগ্নেয়গিরি থেকে যে গলিত পদার্থসমূহের মিশ্রণ বের হয় তাকে ম্যাগমা বলে। ম্যাগমা যখন ঠান্ডা হয়ে কঠিন পদার্থে পরিণত হয় তখন তাকে আগ্নেয় শিলা বলে। যেমন– গ্রানাইট। আগ্নেয় শিলা থেকে অনেক মূল্যবান খনিজ পাওয়া যায়।

চিত্র ১০.০২: আগ্নেয় শিলা, পাললিক শিলা এবং রূপান্তরিত শিলা

পাললিক শিলা (Sedimentary Rock)

আবহাওয়া ও জলবায়ু ইত্যাদি পরিবর্তনের ফলে বৃষ্টির পানি, বাতাস, কুয়াশা, ঝড় ইত্যাদির কারণে মাটির উপরিভাগের ভূ-ত্বকের কাদামাটি, বালিমাটি ইত্যাদি ধুয়ে কোনো কোনো জায়গায় পলি আকারে জমা হয় তারপরে পলির মধ্যে জমে থাকা কণাগুলো বিভিন্ন স্তরে স্তরে সজ্জিত হয়ে যে শিলা তৈরি হয় তাকে পাললিক শিলা বলে। যেমন– বেলেপাথর।

রূপান্তরিত শিলা (Metamorphic Rock)

আগ্নেয় শিলা, পাললিক শিলা বিভিন্ন তাপ ও চাপে পরিবর্তিত হয়ে নতুন ধরনের যে শিলা তৈরি হয় সেগুলোকে রূপান্তরিত শিলা বলে। যেমন- কয়লা।

মাটির নিচে শিলার বিভিন্ন স্তর সৃষ্টির প্রক্রিয়া

মাটির নিচে শিলা বিভিন্ন স্তরে সজ্জিত থাকে।

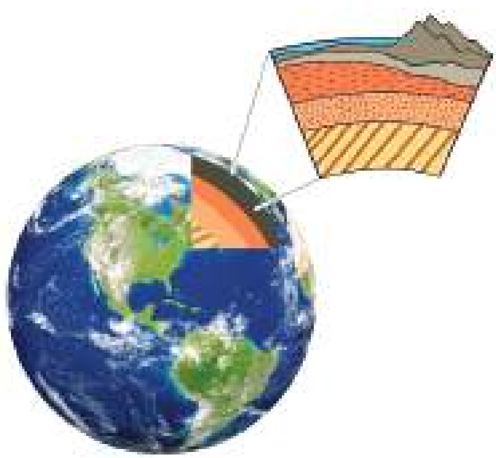

চিত্র ১০.০৩: শিলার বিভিন্ন স্তর

মাধ্যাকর্ষণ বল, তাপ, চাপ এবং প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে মাটির নিচে শিলা বিভিন্ন স্তর সৃষ্টি করে।

১০.১.২ খনিজ ও আকরিক

খনিজ (Minerals): মাটির উপরিভাগে বা মাটির তলদেশে যেসকল পদার্থ থেকে আমরা প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যেমন– বিভিন্ন প্রকার ধাতু বা অধাতু ইত্যাদি সংগ্রহ করে থাকি তাদেরকে খনিজ বলা হয়। যে অঞ্চল থেকে খনিজ উত্তোলন করা হয় তাকে খনি বলে।

আকরিক (Ores)

যে সকল খনিজ থেকে লাভজনকভাবে ধাতু বা অধাতুকে সংগ্রহ বা নিষ্কাশন করা যায় সে সকল খনিজকে আকরিক বলে। যেমন– গ্যালেনা (PbS) থেকে লাভজনকভাবে লেড ধাতু নিষ্কাশন করা যায়, তাই গ্যালেনাকে লেড ধাতুর আকরিক বা লেড ধাতুর খনিজ বলা হয়। বক্সাইট থেকে লাভজনকভাবে অ্যালুমিনিয়াম ধাতু নিষ্কাশন করা যায়। অতএব বক্সাইটকে অ্যালুমিনিয়ামের আকরিক বা খনিজ বলা হয়। আবার, কাদামাটি থেকে লাভজনকভাবে অ্যালুমিনিয়াম ধাতু নিষ্কাশন করা যায় না, সেজন্য কাদামাটি শুধু অ্যালুমিনিয়ামের খনিজ কিন্তু আকরিক নয়। অতএব, আমরা বলতে পারি আকরিক হলে সেটা অবশ্যই খনিজ হবে কিন্তু খনিজ হলে সেটা আকরিক নাও হতে পারে।
আয়রনের সালফাইডকে আয়রন পাইরাইটস (FeS_2) বলা হয়। আয়রন পাইরাইটস থেকে আয়রন ধাতু নিষ্কাশন করা যায়।

খনিজ সম্পদের অবস্থান

আগে মনে করা হতো যে শুধু ভূগর্ভে বা মাটির নিচেই বুঝি খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়। এখন আর এ ধারণা সঠিক বলা যায় না। কোনো কোনো খনিজ ভূগর্ভে আবার কোনো কোনো খনিজ ভূপৃষ্ঠে পাওয়া যায়। সালফার খনিজ ভূগর্ভে পাওয়া যায়। নেত্রকোনার বিজয়পুরে সাদা মাটি বা কেউলিন খনিজ ভূপৃষ্ঠেই পাওয়া যায়। কক্সবাজারের সমুদ্রের বালিতে জিরকোনিয়ামের খনিজ জিরকন, আবার লোহার খনিজ হেমাটাইট, অ্যালুমিনিয়ামের খনিজ বক্সাইট এগুলো অনেক জায়গাতে ভূপৃষ্ঠেই পাওয়া যায়। হ্যালোজেনসমূহের খনিজ সমুদ্রের পানিতে পাওয়া যায়।

১০.২ ধাতু নিষ্কাশন (Metal Extraction)

যে পদ্ধতিতে আকরিক থেকে ধাতু সংগ্রহ করা হয় তাকে ধাতু নিষ্কাশন বলে। বিভিন্ন ধাতুর ধর্মও বিভিন্ন। সে কারণে সকল ধাতুকে পৃথক করতে নির্দিষ্ট কোনো একটি প্রক্রিয়া নেই। তাই বিভিন্ন

ধাতুর নিষ্কাশন প্রক্রিয়ায় ভিন্নতা থাকে। কিছু কিছু অসক্রিয় ধাতু যেমন– সোনা, প্লাটিনাম এগুলোকে কখনো কখনো বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়। কিন্তু কম বা অধিক সক্রিয় ধাতুসমূহ সাধারণত যৌগ হিসেবে প্রকৃতিতে পাওয়া যায়, যেমন– ধাতুসমূহের অক্সাইড, সালফাইড, নাইট্রেট, কার্বনেট ও অন্যান্য অনেক প্রকার যৌগ হিসেবে। তাই সক্রিয় ধাতুসমূহের যৌগগুলোকে বিজারিত করে বা তড়িৎ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় তাদের যৌগ থেকে পৃথক করা হয়। ধাতু আকরিক থেকে ধাতু নিষ্কাশনের অনেকগুলো ধাপ রয়েছে। ধাপগুলো হলোঃ (i) আকরিককে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা (ii) আকরিক এর ঘনীকরণ (iii) ঘনীকৃত আকরিককে অক্সাইডে রূপান্তর (iv) ধাতব অক্সাইডকে মুক্ত ধাতুতে রূপান্তর (v) ধাতু বিশুদ্ধিকরণ। তবে একটি নির্দিষ্ট ধাতুর জন্য সব সময় সবগুলো ধাপ প্রযোজ্য নয়। প্রত্যেকটি ধাতুর ধর্মের উপর ভিত্তি করেই সেই ধাতুর জন্য প্রযোজ্য ধাপগুলো ব্যবহার করতে হবে। নিচে বিভিন্ন ধাপ সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

(i) আকরিককে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা

সাধারণত খনি থেকে যে আকরিককে উত্তোলন করা হয় তা যদি বড় এবং কঠিন শিলাখণ্ড হয় তবে এই কঠিন শিলাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হয়। প্রথমে শিলাখণ্ডকে জো ক্রাশারের সাহায্যে ছোট ছোট টুকরায় পরিণত করা হয় এবং তারপর বল ক্রাশারের সাহায্যে আকরিকের ছোট ছোট টুকরাকে মিহি দানায় বা পাউডারে পরিণত করা হয়।

(ii) আকরিক এর ঘনীকরণ

চিত্র ১০.০৪: জো ক্রাশার

সাধারণত যে আকরিক থেকে ধাতু নিষ্কাশন করা হবে সেই আকরিক ব্যতীত অন্যান্য কিছু পদার্থ আকরিকের সাথে মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। আকরিকের সাথে মিশ্রিত থাকা এসব পদার্থকে অপদ্রব্য বা খনিজমল বলে। কাজেই আকরিককে যখন চূর্ণ-বিচূর্ণ করে পাউডারের দানায় পরিণত করা হয় তখনো সেই পাউডার দানার মধ্যে বিভিন্ন অপদ্রব্য বা খনিজমল থাকে। যেমন– বক্সাইট আকরিককে খনি থেকে তোলার সময় বক্সাইট আকরিকের সাথে খনিজমল হিসেবে বালি মিশ্রিত থাকে। এই খনিজমলসমূহকে দূর করে বিশুদ্ধ আকরিক পাওয়ার জন্য যে পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় তাকে আকরিকের ঘনীকরণ বলা হয়। আকরিকের ঘনীকরণের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। যেমন: হাইড্রোলাইটিক পদ্ধতি, চৌম্বকীয় পৃথকীকরণ, ফেনা ভাসমান পদ্ধতি, রাসায়নিক পদ্ধতি ইত্যাদি।

হাইড্রোলাইটিক পদ্ধতি (Hydrolytic Method)

এ পদ্ধতিটি সাধারণত ব্যবহৃত হয় অক্সাইড আকরিকের ক্ষেত্রে। অক্সাইড আকরিকের কণাগুলো ভারী হয়। আর এতে থাকা অপদ্রব্যগুলো কিন্তু তুলনামূলক হালকা হয়। এই পদ্ধতিতে ১টি কম্পমান হেলানো খাঁজকাটা টেবিলের মধ্যে আকরিককে ঢালা হয়, এই আকরিকের উপর দিয়ে পানি প্রবাহিত করা হয়। এতে ভারী আকরিক ঘনীভূত হয়ে খাঁজের মধ্যে পড়ে থাকে এবং হালকা খনিজমলসমূহ পানির প্রবাহে ধৌত হয়ে চলে যায়। এভাবে আকরিক থেকে খনিজমলসমূহ চলে যাবার পর আকরিক গাঢ় হয়।

ফেনা ভাসমান পদ্ধতি (Froth Floatation Method)

এ পদ্ধতিতে সালফাইড আকরিকগুলোকে ঘনীকরণ করা হয়। একটি বড় ট্যাংকে আকরিক নিয়ে এর মধ্যে পানি দেওয়া হয়, তারপর এর মধ্যে অল্প অল্প করে তেল যোগ করা হয়। এরপর এই মিশ্রণের মধ্যে বায়ুপ্রবাহ চালনা করলে সালফাইড আকরিকগুলো তেলে দ্রবীভূত হয় এবং ফেনার আকারে ভেসে উঠে। ফেনাসহ আকরিক পৃথক করে নেওয়া হয় এবং খনিজমল পাত্রের তলায় পড়ে থাকে।

তেল ফেনা ভাসমান প্রণালির পরীক্ষা

1. উপকরণ: বালি, কেরোসিন, স্পেচুলা, তরল/গুঁড়া সাবান, ওয়াচ গ্লাস, ছিপিসহ একটি বড় টেস্টটিউব, কপার পাইরাইট, গ্যালেনা বা হেমাটাইট আকরিক গুঁড়ো।
2. টেস্টটিউবের মুখে ছিপি লাগিয়ে ঝাঁকাও। বালি এবং খনিজ কি পৃথক হয়েছে?
3. টেস্টটিউবে একটু তরল/গুঁড়া সাবান এবং কয়েক ফোঁটা কেরোসিন যোগ করো।
4. টেস্টটিউবের মুখে ছিপি লাগিয়ে পুনরায় ভালো করে ঝাঁকাও।
5. স্পেচুলা দিয়ে কিছুটা ফেনা ওয়াচ গ্লাসে নিয়ে পরীক্ষা করো এতে খনিজ আছে কি না?
6. বালি তলানিতে পড়ে থাকে কিন্তু খনিজ টেস্টটিউবের উপরের অংশে ভাসমান থাকে।

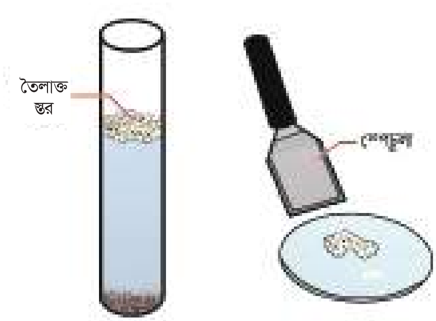

চিত্র ১০.০৫: তেল ফেনা ভাসমান প্রণালি

চৌম্বকীয় পৃথকীকরণ পদ্ধতি

যখন খনিজমল বা আকরিক এদের মধ্যে যেকোনো একটি চুম্বক দ্বারা আকর্ষিত হয় তখন এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় এ পদ্ধতিতে চূর্ণীকৃত আকরিককে একটি ঘূর্ণায়মান বেল্টের উপর দিয়ে চালনা করা হয়। বেল্টটি চিত্রের মতো দুইটি ধাতব চাকার সাহায্যে ঘোরে। এই ধাতব চাকা দুইটির একটি চৌম্বক

ধর্ম বিশিষ্ট । এই চুম্বক দ্বারা আকর্ষিত হয়ে খনিজমলযুক্ত আকরিকের চৌম্বক অংশটি চুম্বক ধর্ম বিশিষ্ট চাকার নিচে এবং কাছে স্তূপ আকারে জমা হয়। অন্যদিকে অচৌম্বক অংশটি একটু দূরে চিত্রের মতো জমা হয়। ফলে আকরিক খনিজমল থেকে পৃথক হয়ে যায়। ক্রোমাইট $FeO.Cr_2O_3$, রুটাইল TiO_2 এর মতো চৌম্বকধর্ম বিশিষ্ট আকরিক থেকে খনিজমল অপসারণ করার জন্য চুম্বকীয় পৃথকীকরণ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।

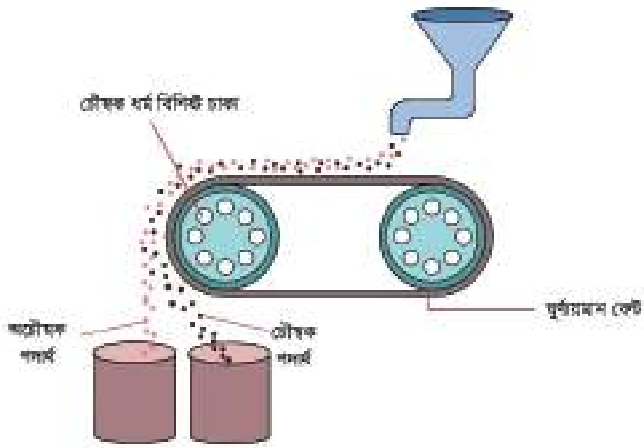

চিত্র ১০.০৬: চৌম্বকীয় পৃথকীকরণ

রাসায়নিক পদ্ধতি

যে সকল ক্ষেত্রে কোনো পদার্থ আকরিক বা খনিজমলের যেকোনো একটির সাথে বিক্রিয়া করে কিন্তু অন্যটির সাথে বিক্রিয়া করে না সে সকল ক্ষেত্রে আকরিক থেকে খনিজমল অপসারণ করার জন্য রাসায়নিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। যেমন- বক্সাইট থেকে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড পাবার জন্য রাসায়নিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। বক্সাইটের সাথে আয়রন অক্সাইড, টাইটেনিয়াম অক্সাইড, বালি ইত্যাদি খনিজমল মিশ্রিত থাকে। বক্সাইটের মধ্যে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড (NaOH) যোগ করে উত্তপ্ত করলে বক্সাইটের ($Al_2O_3.2H_2O$) সাথে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড (NaOH) বিক্রিয়া করে সোডিয়াম অ্যালুমিনেট ($NaAlO_2$) ও পানি তৈরি হয়।

$$Al_2O_3.2H_2O + 2NaOH \xrightarrow{\Delta} 2NaAlO_2 + 3H_2O$$

গরম সোডিয়াম অ্যালুমিনেটকে পানির সাথে বিক্রিয়া করালে অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড এবং সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড উৎপন্ন হয়। সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড পানিতে দ্রবীভূত থাকে এবং অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড পাত্রের নিচে তলানি আকারে অধঃক্ষিপ্ত হয়।

$$NaAlO_2 + 2H_2O \longrightarrow Al(OH)_3\downarrow + NaOH$$

অ্যালুমনিয়াম হাইড্রোক্সাইডকে পৃথক করে এনে তাকে 1100°c তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে বিশুদ্ধ অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড এবং পানি উৎপন্ন হয়।

$$2Al(OH)_3 \xrightarrow{1100^\circ c} Al_2O_3 + 3H_2O$$

অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড → অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড

উপরের প্রক্রিয়ায় বক্সাইট আকরিকের ঘনীকরণ করে বিশুদ্ধ অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড পাওয়া যায়।

(iii) ঘনীকৃত আকরিককে অক্সাইডে রূপান্তর

ঘনীকৃত আকরিককে ভস্মীকরণ বা তাপজারণ পদ্ধতিতে ধাতুর অক্সাইডে পরিণত করা হয়।

আকরিকের ভস্মীকরণ (Calcination of Ores)

আকরিকে উপস্থিত ধাতুকে বিজারিত করে পৃথক করার আগে ঘনীকৃত আকরিককে গলনাঙ্কের চেয়ে কম তাপমাত্রায় বাতাসের অনুপস্থিতিতে উত্তপ্ত করা হয়। এই প্রক্রিয়াকে ভস্মীকরণ বলে। ভস্মীকরণের ফলে আকরিক থেকে পানিসহ কার্বনেট, বাইকার্বনেট, হাইড্রোক্সাইড জাতীয় কিছু অপদ্রব্য কার্বন ডাই-অক্সাইড কিংবা পানি হিসেবে দূরীভূত হয়। এ সকল অপদ্রব্য দূর না করলে পরবর্তীতে এগুলো দূর করা কঠিন।

$$Fe_2O_3.\ 3H_2O \xrightarrow{\Delta} Fe_2O_3 + 3H_2O \qquad \Delta = \text{তাপ}$$

$$ZnCO_3 \xrightarrow{\Delta} ZnO + CO_2$$

$$CaCO_3 \xrightarrow{\Delta} CaO + CO_2$$

আকরিকের তাপজারণ

সাধারণত সালফাইড আকরিকের তাপজারণ করা হয়। সালফাইড আকরিককে গলনাঙ্কের চেয়ে কম তাপমাত্রায় বাতাসের উপস্থিতিতে উত্তপ্ত করা হয়। এর ফলে সালফাইড, ফসফরাস, আর্সেনিক ইত্যাদি উদ্বায়ী খনিজমল অক্সাইড হিসেবে দূরীভূত হয়।

$$2PbS + 3O_2 \xrightarrow{\Delta} 2PbO + 2SO_2$$

$$2ZnS + 3O_2 \xrightarrow{\Delta} 2ZnO + 2SO_2$$

(iv) ধাতব অক্সাইডকে মুক্ত ধাতুতে রূপান্তর

আকরিককে ভস্মীকরণ বা তাপজারণ করায় যে ধাতব অক্সাইড পাওয়া যায় তাদেরকে বিজারিত করলে ধাতু পাওয়া যায়। বিভিন্নভাবে এ বিজারণ সম্পন্ন করা যায়, যেমন– তড়িৎ বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিজারণ, কার্বন বিজারণ পদ্ধতি, স্ববিজারণ ইত্যাদি। ধাতুর সক্রিয়তা সিরিজে তাদের অবস্থানের উপর কোন পদ্ধতিতে বিজারণ সম্পন্ন করা হবে তা নির্ভর করে। তোমরা যেন সহজে সেটা বুঝতে পারো তার জন্য নিচের ছকটি দেওয়া হলো।

টেবিল ১০.০১: ধাতুর সক্রিয়তা সিরিজ

সক্রিয়তা সিরিজে ধাতুর অবস্থান	ধাতু	বিজারণের পদ্ধতি
বেশি সক্রিয় ধাতুসমূহ যাদের অবস্থান সক্রিয়তা সিরিজের উপরের দিকে।	K Na Ca Mg Al	তড়িৎ বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিজারণ ঘটানো হয়।
মধ্যম মানের সক্রিয় ধাতুসমূহ যাদের অবস্থান সক্রিয়তা সিরিজের মাঝে।	Zn Fe Pb	কার্বন বিজারণ পদ্ধতিতে বিজারণ ঘটানো হয়।
কম সক্রিয় ধাতুসমূহ যাদের অবস্থান সক্রিয়তা সিরিজের নিচের দিকে।	Cu Hg Ag	স্ববিজারণ পদ্ধতিতে বিজারণ ঘটানো হয়।
প্রায় অসক্রিয় ধাতু যাদের অবস্থান সক্রিয়তা সিরিজের একেবারে নিচে।	Pt Au	বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়।

তড়িৎ বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিজারণ (Reduction by Electrolysis)

সক্রিয়তা সিরিজে প্রদর্শিত উপরের দিকে অবস্থিত অধিক সক্রিয় ধাতু K, Na, Ca, Mg, Al ইত্যাদি ধাতুসমূহের জন্য তড়িৎ বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিজারণ সম্পন্ন করা হয়। নিচে অ্যালুমিনিয়ামের অক্সাইড থেকে তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করে অ্যালুমিনিয়াম ধাতু নিষ্কাশন পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো।

এই পদ্ধতিতে প্রথমে কঠিন অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডকে গলিয়ে তরল করতে হবে। অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড 2050°C তাপমাত্রায় গলে যায়। এত বেশি তাপমাত্রা তৈরি করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। যদি অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড এর মধ্যে ক্রায়োলাইট (Na_3AlF_6) যোগ করা হয়, তাহলে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড 800°C-1000°C তাপমাত্রায় গলে যায়। গলিত Al_2O_3 এর মধ্যে Al^{3+} এবং O^{2-} আয়ন থাকে।

$$Al_2O_3 \longrightarrow 2Al^{3+} + 3O^{2-}$$

গ্রাফাইট কার্বন এর আস্তরণযুক্ত একটি স্টিলের পাত্রের মধ্যে গলিত অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড এবং ক্রায়োলাইট এর মিশ্রণ নেওয়া হয় এবং এর মধ্যে কয়েকটি কার্বন দণ্ড এমনভাবে প্রবেশ করানো হয় যাতে এটি স্টিলের পাত্রকে স্পর্শ না করে। এবার স্টিলের পাত্রকে ব্যাটারির ঋণাত্মক প্রান্তের সাথে ২০২৫

এবং কার্বন দন্ডগুলোকে ব্যাটারির ধনাত্মক প্রান্তের সাথে যুক্ত করা হয়। বিদ্যুৎ প্রবাহের সাথে সাথে তড়িৎ বিশ্লেষণ শুরু হয়। তড়িৎ বিশ্লেষণকালে O^{2-} অ্যানোডে ইলেকট্রন ত্যাগ করে O_2 গ্যাস তৈরি করে এবং দ্রবণে বিদ্যমান Al^{3+} ক্যাথোড থেকে ইলেকট্রন গ্রহণ করে Al ধাতুতে পরিণত হয়।

$$6O^{2-} \longrightarrow 3O_2 + 12e- \quad \text{[অ্যানোড বিক্রিয়া]}$$

$$2Al^{3+} + 6e^- \longrightarrow 2Al \quad \text{[ক্যাথোড বিক্রিয়া]}$$

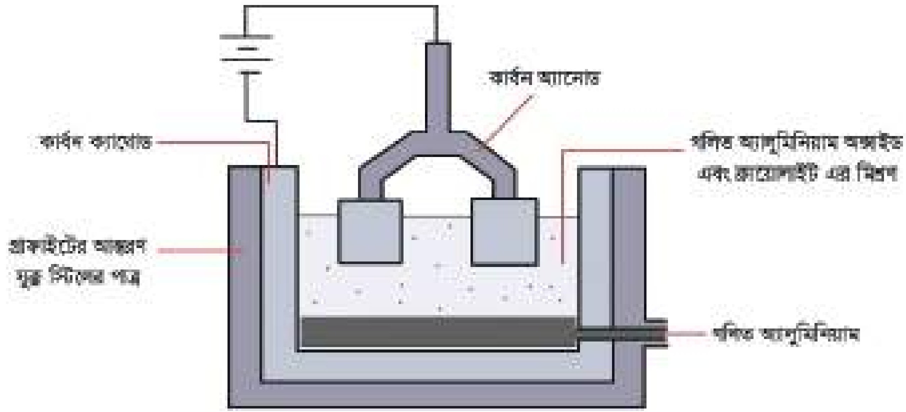

চিত্র ১০.০৭: তড়িৎ বিশ্লেষণের পদ্ধতিতে অ্যালুমিনিয়াম ধাতু নিষ্কাশন

কার্বন বিজারণ পদ্ধতি (Method of Carbon Reduction)

ধাতব অক্সাইড এর সাথে কার্বনকে উত্তপ্ত করে ধাতু নিষ্কাশন করা হয়। যেমন: ZnO থেকে Zn ধাতু, FeO থেকে Fe ধাতু, PbO থেকে Pb ধাতু কিংবা CuO থেকে Cu ধাতুকে এই পদ্ধতিতে নিষ্কাশন করা হয়।

$$ZnO + C \xrightarrow{\Delta} Zn + CO$$

$$FeO + C \xrightarrow{\Delta} Fe + CO$$

$$PbO + C \xrightarrow{\Delta} Pb + CO$$

$$CuO + C \xrightarrow{\Delta} Cu + CO$$

এই পদ্ধতিকে বলা হয় কার্বন বিজারণ পদ্ধতি। সক্রিয়তা সিরিজে প্রদর্শিত মধ্যম মানের সক্রিয় ধাতুসমূহকে এ পদ্ধতিতে বিজারণ ঘটানো হয়।

একক কাজ

শিক্ষার্থীর কাজ: লেড বা সিসার অক্সাইড থেকে ধাতব লেড নিষ্কাশন।

উপকরণ: হলুদ বর্ণের লেড অক্সাইড, এক টুকরা সাদা কাগজ, বুনসেন বার্নার/স্পিরিট ল্যাম্প, দিয়াশলাইয়ের কাঠি।

সতর্কতা: লেড, লেড অক্সাইড ও এর বাষ্প বিষাক্ত পদার্থ। একে খালি হাতে স্পর্শ করবে না। এর বাষ্প শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে টেনে নিবে না।

পদ্ধতি: (i) প্রথমে বার্নারের শিখাটি ছোট করে নাও।

(ii) একটি দিয়াশলাইয়ের কাঠি এমনভাবে পোড়াও যেন বারুদের কোনো অবশেষ না থাকে।

(iii) দিয়াশলাইয়ের কাঠির কয়লা হয়ে যাওয়া অংশটি পানিতে ভিজিয়ে একটু লেড অক্সাইড যুক্ত করো।

(iv) দিয়াশলাইয়ের কাঠির লেড অক্সাইড যুক্ত মাথাটি বার্নারের আগুনে ধরো এবং উজ্জ্বল ধূসর বর্ণের গলিত লেডের ছোট্ট বিন্দু সৃষ্টি হয় কি না তা লক্ষ করো।

(v) দিয়াশলাইয়ের কাঠিটি ঠান্ডা হতে দাও। একে একটি সাদা কাগজের উপরে রেখে লেড কণা খুঁজে বের করো। প্রয়োজনে একটি আতসি কাচ (লেন্স) ব্যবহার করো। পর্যবেক্ষণে যদি লেড না পাওয়া যায় তাহলে ii-v ধাপের কাজগুলো পুনরায় করো।

মন্তব্য করো:

(i) দিয়াশলাইয়ের কাঠির পোড়া অংশটি পানিতে ভেজানোর কারণ ব্যাখা করো।

(ii) এতে কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া হয়েছে কি? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

(iii) সিসা বা লেড মুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় কার্বন কোথা থেকে এলো?

(iv) কথায় ও আণবিক সংকেত ব্যবহার করে বিক্রিয়াটির রাসায়নিক সমীকরণ লেখো।

(v) কপার, আয়রন বা জিংক অক্সাইড নিয়ে পরীক্ষাটি করলে একই রকম ফল পাওয়া যাবে কি? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

স্ববিজারণ (Auto-Reduction)

সক্রিয়তা সিরিজে অবস্থিত নিচের দিকে অবস্থিত কম সক্রিয় ধাতু Cu, Hg, Ag ধাতুসমূহের সালফাইড এর ক্ষেত্রে কোনো বিজারক যোগ না করে শুধু উত্তপ্ত করেও বিজারণ ঘটানো হয়। উদাহরণ হিসেবে মার্কারির আকরিককে এভাবে বিজারিত করা যায়: ২০২৫

$$HgS + O_2 \longrightarrow Hg(l) + SO_2$$

বা,

$$2HgS + 3O_2 \longrightarrow 2HgO(s) + 2SO_2(g)$$

$$2HgO(s) + HgS(s) \longrightarrow 3Hg(l) + SO_2(g)$$

(v) ধাতু বিশুদ্ধিকরণ

উপরে উল্লিখিত বিজারণ পদ্ধতিসমূহের মাধ্যমে প্রাপ্ত ধাতুসমূহ সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ হয় না। এতেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অপদ্রব্য থেকে যায়। এ অপদ্রব্য দূর করতে বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

বিগালক যোগ করার পদ্ধতি: উচ্চ তাপমাত্রায় কার্বন বিজারণ পদ্ধতিতে প্রাপ্ত ধাতুর মধ্যে কিছু খনিজমল দ্রবীভূত থাকতে পারে। এই খনিজমল অপসারণ করার জন্য যে পদার্থ যোগ করা হয় তাকে বিগালক বলে। খনিজমল ক্ষারকীয় হলে এসিডিক বিগালক (SiO_2) যোগ করা হয় এবং খনিজমল এসিডিক হলে তার মধ্যে ক্ষারকীয় বিগালক (CaO) যোগ করা হয়। বিগালক এবং খনিজমল একত্র হয়ে ধাতুর মল বা ধাতুমল তৈরি হয়। ধাতুর মল গলিত ধাতুতে দ্রবীভূত হয় না বলে উপর থেকে ধাতুমলকে গলিত ধাতু থেকে আলাদা করে ফেলা হয়। বিগলন প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত ধাতু বিশুদ্ধ নয়। এই অবিশুদ্ধ ধাতুকে তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করে ধাতু বিশুদ্ধ করা হয়। নিচে ধাতু বিশুদ্ধকরণের জন্য তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতি আলোচনা করা হলো।

তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে ধাতুর বিশোধন: তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে ধাতুর বিশোধনে অবিশুদ্ধ ধাতুকে অ্যানোড এবং বিশুদ্ধ ধাতুর একটি পাতকে ক্যাথোড হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তড়িৎ বিশ্লেষ্য হিসেবে যে ধাতুকে বিশুদ্ধ করতে হবে তার লবণের দ্রবণকে ব্যবহার করা হয়। যখন তড়িৎ বিশ্লেষ্য কোষে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করা হয় তখন অ্যানোড থেকে ধাতুর পরমাণু ইলেকট্রন ত্যাগ করে আয়ন হিসেবে দ্রবণে প্রবেশ করে। অপরদিকে, ধাতব আয়ন ইলেকট্রন গ্রহণ করে বিশুদ্ধ ধাতু হিসেবে ধাতবপাতে জমা হয়। তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে কপার ধাতু ও অন্যান্য ধাতু বিশোধন করা হয়। নিচে তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে কপার ধাতুর বিশুদ্ধকরণ বর্ণনা করা হলো।

তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে কপার ধাতুর বিশুদ্ধকরণ: বিজারণ প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত কপার ধাতু 98% বিশুদ্ধ। একে তড়িৎ বিশোধন পদ্ধতি প্রয়োগ করে 99.9% বিশুদ্ধ কপার ধাতু তৈরি করা যায়। এক্ষেত্রে $CuSO_4$ এর জলীয় দ্রবণ একটি পাত্রে নেওয়া হয়। এই পাত্রে যে ধাতবদণ্ডকে বিশুদ্ধ করতে হবে সেই অবিশুদ্ধ কপারদণ্ডকে ব্যাটারির ধনাত্মক প্রান্তের সাথে যুক্ত করা হয়। এটি অ্যানোড হিসেবে কাজ করে। একটি বিশুদ্ধ কপার দণ্ডকে ঐ ব্যাটারির ঋণাত্মক প্রান্তের সাথে যুক্ত করা হয়। এটি

ক্যাথোড হিসেবে কাজ করে। সাধারণত, অবিশুদ্ধ কপার দণ্ড মোটা থাকে এবং বিশুদ্ধ কপার দণ্ড পাতলা থাকে।

এবার ব্যাটারির সাহায্যে দ্রবণের মধ্যে তড়িৎ প্রবাহিত করলে অ্যানোড হিসেবে ব্যবহৃত অবিশুদ্ধ কপার দণ্ড থেকে Cu^{2+} আয়ন হিসেবে দ্রবণে চলে যায় এবং দ্রবণ থেকে Cu^{2+} বিশুদ্ধ কপার দণ্ডে জমা হয়। এক্ষেত্রে অ্যানোডের জারণ বিক্রিয়া সংঘটিত হয় এবং ক্যাথোডের বিজারণ বিক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

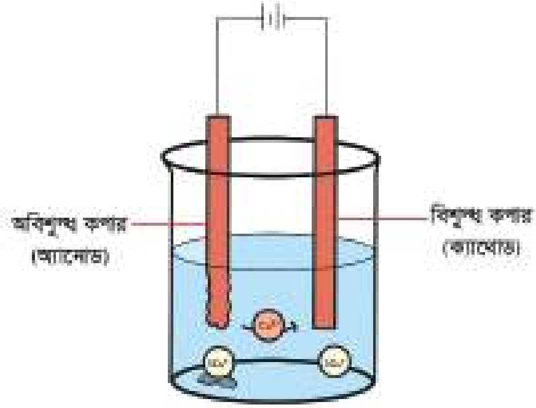

চিত্র ১০.০৮: তড়িৎ বিশ্লেষণের সাহায্যে অবিশুদ্ধ কপার বিশোধন

$Cu(s) \longrightarrow Cu^{2+} + 2e^-$ (অবিশুদ্ধ কপার অ্যানোড থেকে Cu^{2+} এর দ্রবণে গমন)

$Cu^{2+} + 2e^- \longrightarrow Cu(s)$ (দ্রবণ থেকে Cu^{2+} বিশুদ্ধ কপার ক্যাথোডে জমা হওয়া)

আয়রণ নিষ্কাশন প্রক্রিয়া

আয়রণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাতু। আয়রণ এর গুরুত্বপূর্ণ আকরিক হলো হেমাটাইট Fe_2O_3। প্রধাণত তিনটি ধাপে যেমন-

(1) গাঢ়ীকরণ, (2) ভস্মীকরণ/ তাপজারণ ও

(3) বিগলন দ্বারা বাত্যাচুল্লিতে লৌহ নিষ্কাষণ করা হয়। চিত্র ১০.০৯

এই পদ্ধতিতে একাধিক রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে:

$Fe_2O_3 + 3C \longrightarrow Fe + 3CO$

$3Fe_2O_3 + CO \longrightarrow 2Fe_3O_4 + CO_2$

$Fe_3O_4 + CO \longrightarrow Fe + CO_2$

$CaCO_3 \longrightarrow CaO + CO_2$

$CaO + SiO_2 \longrightarrow CaSiO_3$ (ধাতুমল)

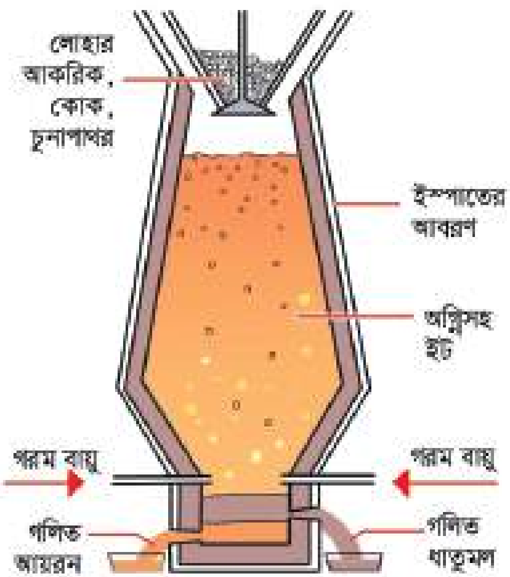

চিত্র ১০.০৯: বাত্যা চুল্লিতে আয়রন নিষ্কাশন

দলীয় কাজ

1. সোডিয়াম ক্লোরাইডের গলনাঙ্ক 801°C। সোডিয়াম ক্লোরাইড 40-42% এবং ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড 58-60% মিশ্রণের গলনাঙ্ক প্রায় 600° C। উপর্যুক্ত বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে সোডিয়াম ধাতু নিষ্কাশনের একটি কৌশল বর্ণনা করো। এ জন্য যে বিষয়সমূহ তুমি বিবেচনা করবে তা হলো:

- বিগলনের খরচ
- মিশ্রণ ব্যবহার করলে সোডিয়াম ও ক্যালসিয়াম উভয় ধাতু একত্রে মুক্ত হবে কি না?
- বিক্রিয়ায় উৎপন্ন উৎপাদনসমূহের পরিবেশ দূষণ।

2. কপার নিষ্কাশনের সময় উপজাত গ্যাস পরিবেশের কী ক্ষতি করবে? এ ক্ষতি (এসিড বৃষ্টি) থেকে পরিত্রাণের উপায় ব্যাখ্যা করো। পরিবেশের ক্ষতি প্রতিরোধ করে এই উপজাত গ্যাসকে লাভজনক কাজে ব্যবহার করার উপায় সম্পর্কে তোমার মতামত দাও।

3. টেবিলে উপস্থাপিত আকরিক থেকে ধাতু নিষ্কাশনের সম্ভাব্য বিক্রিয়া টেবিলে উপস্থাপন করো। তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি মন্তব্য কলামে উপস্থাপন করো।

ধাতু	আকরিক	নিষ্কাশনের বিক্রিয়া	মন্তব্য
মার্কারি	সিন্নাবার HgS		
জিংক	জিংক ব্লেন্ড ZnS		
	ক্যালামাইন $ZnCO_3$		
লেড	গ্যালেনা PbS		
আয়রন	ম্যাগনেটাইট Fe_3O_4		
	হেমাটাইট Fe_2O_3		
	লিমোনাইট $Fe_2O_3.3H_2O$		
কপার	কপার পাইরাইট $CuFeS_2$		
	চালকোসাইট Cu_2S		
অ্যালুমিনিয়াম	বক্সাইট $Al_2O_3.2H_2O$		
সোডিয়াম	সাগরের পানি $NaCl$		
ক্যালসিয়াম	চুনাপাথর $CaCO_3$		

4. অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের গলনাঙ্ক 2050° C। অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড এবং ক্রায়োলাইট Na_3AlF_6 মিশ্রণের গলনাঙ্ক 800-1000° C এর মধ্যে। উপর্যুক্ত বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে অ্যালুমিনিয়াম ধাতু নিষ্কাশনের একটি কৌশল বর্ণনা করো। এ জন্য যে বিষয়সমূহ তুমি বিবেচনা করবে তা হলো:

- বিগলনের খরচ
- মিশ্রণ ব্যবহার করলে সোডিয়াম ও অ্যালুমিনিয়াম উভয় ধাতু একত্রে মুক্ত হবে কি না?
- বিক্রিয়ায় উৎপাদসমূহের পরিবেশ দূষণ।

১০.৩ নির্বাচিত সংকর ধাতু (Selected Alloys)

কতগুলো ধাতুকে একত্রে গলানোর পর গলিত মিশ্রণকে ঠান্ডা করলে যে ধাতু মিশ্রণ পাওয়া যায় তাকে সংকর ধাতু বলা হয়। খ্রিষ্টপূর্ব 5000 থেকে খ্রিষ্টপূর্ব 3000 পর্যন্ত সময়কালকে তাম্রযুগ বলা হয়। কারণ এই সময়ে তামা দিয়ে মানুষ গয়না, অস্ত্র এবং যন্ত্রপাতি তৈরি করত। কিন্তু তামা নরম ধাতু বিধায় এই ধাতু দিয়ে যে অস্ত্র এবং যন্ত্রপাতি তৈরি করা হতো তা বেশি দিন কার্যকর থাকত না। সেজন্য সেই প্রাচীনকালেই মানুষ গলিত কপারের সাথে গলিত টিন মিশিয়ে মিশ্রণকে ঠান্ডা করে ব্রোঞ্জ তৈরি করেছিল। ব্রোঞ্জ মূলত একটি সংকর ধাতু। কোনো গরম গলিত ধাতুর মধ্যে অন্য কোনো গরম গলিত ধাতু বা অধাতু মিশিয়ে সেই মিশ্রণকে ঠান্ডা করলে যে কঠিন পদার্থ পাওয়া যায় তাকে বলা হয় সংকর ধাতু। প্রাচীনকালের মানুষদের সংকর ধাতু ব্রোঞ্জ আবিষ্কার ছিল একটি যুগান্তকারী ঘটনা। খ্রিষ্টপূর্ব 3000 থেকে 1000 পর্যন্ত সময়কালকে বলা হয় ব্রোঞ্জ যুগ। এই সময় ব্রোঞ্জ দ্বারা বিভিন্ন অস্ত্র এবং যন্ত্রপাতি তৈরি করা হতো। বিভিন্ন যন্ত্রপাতি তৈরি করতে ধাতুর চেয়ে সংকর ধাতু বেশি উপযোগী। লোহা এবং কার্বন মিশিয়ে স্টিল নামক সংকর ধাতু তৈরি করা হয়। ছুরি, কাঁচি, রেলের চাকা, রেললাইন, জাহাজ, কৃষি যন্ত্রপাতি ইত্যাদি স্টিল দ্বারা তৈরি করা হয়। আবার গরম গলিত লোহার মধ্যে গলিত কার্বন, নিকেল ও ক্রোমিয়াম মিশিয়ে যে সংকর ধাতু তৈরি হয় তাকে স্টেইনলেস স্টিল বলে। হাসপাতালে ডাক্তাররা যে ছুরি বা কাঁচি ব্যবহার করে তা স্টেইনলেস স্টিলের তৈরি। গলিত কপার এবং গলিত জিংক একত্রে মিশিয়ে পিতল নামক সংকর ধাতু তৈরি হয়। বৈদ্যুতিক সুইচ, পাতিল ইত্যাদি তৈরিতে পিতল ব্যবহৃত হয়। কপার ও টিন মিশিয়ে সংকর ধাতু কাঁসা বা ব্রোঞ্জ তৈরি হয়। থালাবাসন, গ্লাস ইত্যাদি তৈরিতে ব্রোঞ্জ ব্যবহৃত হয়। অ্যালুমিনিয়াম, কপার,

ম্যাগনেসিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ ও লোহার মিশ্রণে ডুরালমিন নামক সংকর ধাতু তৈরি করা হয়। এটি উড়োজাহাজের বডি তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়।

টেবিল ১০.০২: বিভিন্ন সংকর ধাতু ও তার ব্যবহার

ধাতু সংকর	উপাদান ও সংযুক্তি	ব্যবহার
স্টিল	লোহা 99% কার্বন 1%	রেলের চাকা ও লাইন, ইঞ্জিন, জাহাজ, যানবাহন, ক্রেন, যুদ্ধাস্ত্র, ছুরি, কাঁচি, ঘড়ির স্প্রিং, চুম্বক, কৃষি যন্ত্রপাতি ইত্যাদি।
মরিচাবিহীন ইস্পাত (স্টেইনলেস স্টিল)	লোহা 74% ক্রোমিয়াম 18% নিকেল 8%	ছুরি, কাঁটা চামচ, পাকঘরের সিঙ্ক, রসায়ন শিল্পের বিক্রিয়া পাত্র, অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি ইত্যাদি।
পিতল (ব্রাস)	কপার 65% জিংক 35%	অলংকার, কলকব্জার বিয়ারিং, বৈদ্যুতিক সুইচ, দরজার হাতল, ডেকচি পাতিল ইত্যাদি।
কাঁসা (ব্রোঞ্জ)	কপার 90% টিন 10%	ধাতু গলানো যন্ত্রাংশ, থালা, গ্লাস ইত্যাদি।
ডুরালমিন	অ্যালুমিনিয়াম 95% কপার 4% ম্যাগনেসিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ ও লোহা 1%	উড়োজাহাজের বডি, বাইসাইকেলের পার্টস ইত্যাদি।
24 ক্যারেট স্বর্ণ	স্বর্ণ 100%	ডেন্টিস্ট্রি, মুদ্রা, ইলেকট্রনিক সংযোগ।
22 ক্যারেট স্বর্ণ	স্বর্ণ 91.67% কপার এবং অন্যান্য ধাতু 8.33%	অলংকার।
21 ক্যারেট স্বর্ণ	স্বর্ণ 87.5% কপার এবং অন্যান্য ধাতু 12.5%	অলংকার।

তোমরা এতক্ষণ জানলে বিভিন্ন ধাতু একত্রে মিশিয়ে সংকর ধাতু তৈরি করা হয়। এই সংকর ধাতু তৈরিতে সকল ধাতুকে সমান পরিমাণে মেশানো হয় না। সংকর ধাতুর মধ্যে একটি থাকে প্রধান ধাতু এবং অন্য এক বা একাধিক পদার্থ থাকে অপ্রধান ধাতু বা অধাতু। যেমন– পিতলের মধ্যে প্রধান ধাতু কপার থাকে 65% এবং জিংক 35% থাকে। প্রধান ধাতুর নাম অনুসারে সংকর ধাতুর নামকরণ করা

হয়। যেমন– স্টিলের মধ্যে লোহা প্রধান ধাতু এবং কার্বন অপ্রধান অধাতু। স্টিলে লোহা থাকে 99% এবং কার্বন থাকে 1% এজন্য স্টিলকে লোহার সংকর ধাতু বলা হয়। অনুরূপভাবে, কাঁসার মধ্যে প্রধান ধাতু কপার থাকে 90%, টিন থাকে 10%। এজন্য কাঁসা কপারের সংকর ধাতু। আবার, পিতলে প্রধান ধাতু কপার থাকে 65% এবং অপ্রধান ধাতু জিংক থাকে 35%। এজন্য পিতলও কপারের সংকর ধাতু। কপারের দুইটি সংকর ধাতু আছে, যথা– পিতল (ব্রাস) ও কাঁসা (ব্রোঞ্জ)।

১০.৪ কতিপয় ধাতু এবং সংকর ধাতুর ক্ষয় হওয়ার লক্ষণ, কারণ ও প্রতিকার (Symptoms, Causes and Prevention of Corrosion of Certain Metals and Alloys)

লোহা বা লোহার সংকর ধাতুর তৈরি জিনিসপত্র জানালার গ্রিল, আলমিরা ইত্যাদি খোলা জায়গা বা বাতাসে দীর্ঘদিন থাকলে এসব জিনিসপত্রের উপর লালচে বাদামি বর্ণের এক ধরনের পদার্থ তৈরি হয়। এই বাদামি পদার্থকে লোহার মরিচা বলা হয়। মরিচা তৈরির মাধ্যমে লোহা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। বিশুদ্ধ কপার বা পিতল বা কাঁসার তৈরি জিনিসপত্র দীর্ঘদিন বাতাসে থাকার ফলে এদের উপর কালো বা বাদামি বা সবুজ বর্ণের একটি আস্তরণ পড়ে। এই আস্তরণকে কপারের তাম্রমল বলা হয়। তাম্রমল তৈরির মাধ্যমে তামা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

সাধারণত বিশুদ্ধ ধাতু বা সংকর ধাতু দীর্ঘদিন বাতাসে থাকার ফলে ধাতু বা সংকর ধাতুর উপর ভিন্ন বর্ণযুক্ত একটি নতুন পদার্থের সৃষ্টি হয়। এই প্রক্রিয়াকে ধাতুর ক্ষয় বলে।

লোহা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যে লালচে বাদামি বর্ণের মরিচা তৈরি হয় সেটি হলো আর্দ্র ফেরিক অক্সাইড ($Fe_2O_3.nH_2O$)। আবার বিভিন্ন বর্ণের তাম্রমলে বিভিন্ন ধরনের পদার্থ উপস্থিত থাকে। যেমন– কোনো কোনো তাম্রমলে কিউপ্রাস অক্সাইড (Cu_2O) উপস্থিত থাকে। কোনো কোনো তাম্রমলে কিউপ্রাস সালফাইড বা চালকোসাইট (Cu_2S) উপস্থিত থাকে। তাম্রমলকে কোনো নির্দিষ্ট রাসায়নিক সংকেতে প্রকাশ করা যায় না। কারণ তাম্রমলের সব জায়গায় একই ধরনের পদার্থ তৈরি হয় না। সাধারণত কোনো কোনো ধাতু বা সংকর ধাতু যখন বায়ুমণ্ডলে থাকে তখন ধাতুসমূহ ইলেকট্রন ত্যাগ করে ধনাত্মক আয়নে পরিণত হয়। এখানে একটি জারণ বিক্রিয়া হয়। আবার, ধাতু যে ইলেকট্রন ত্যাগ করে বায়ুমণ্ডলের কোনো উপাদান সেই ইলেকট্রন গ্রহণ করে ঋণাত্মক আয়নে পরিণত হয়। এখানে একটি বিজারণ বিক্রিয়া সংঘটিত হয়। অতঃপর ধনাত্মক আয়ন এবং ঋণাত্মক আয়নের মধ্যে বিক্রিয়ায় একটি যৌগ তৈরি হয়। নতুন যৌগটি রুপান্তরিত হয়ে বা অন্যান্য যৌগের সাথে বিক্রিয়া করে। এভাবে ধাতু বা সংকর ধাতু ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

লোহার উপর মরিচা পড়ার বিক্রিয়া অনেক ধীরে সংঘটিত হয় এবং অনেকগুলো ধাপে সংঘটিত হয়। এ সকল ধাপসমূহের মধ্যে একটি ধাপে জারণ বিক্রিয়া এবং একটি ধাপে বিজারণ বিক্রিয়া সংঘটিত হয়। এজন্য লোহায় মরিচা পড়ার বিক্রিয়াটি জারণ বিজারণ বিক্রিয়া। লোহায় মরিচা পড়ার জন্য বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন (O_2) এবং পানির (H_2O) প্রয়োজন হয়। বায়ুমণ্ডলের পানি কিছুটা বিয়োজিত হয়ে H^+ ও OH^- তৈরি করে।

$$H_2O \longrightarrow H^+ + OH^-$$

লোহা যখন বায়ুমণ্ডলের H^+এর সংস্পর্শে আসে তখন লোহা ইলেকট্রন ত্যাগ করে Fe^{2+} এ পরিণত হয়। এখানে জারণ বিক্রিয়া সংঘটিত হয়।

$$2Fe \longrightarrow 2Fe^{2+} + 4e^-$$

Fe যে ইলেকট্রন দান করে O_2 এবং H^+ সেই ইলেকট্রন গ্রহণ করে H_2O উৎপন্ন করে। এখানে বিজারণ বিক্রিয়া সংঘটিত হয়।

$$O_2 + 4H^+ + 4e^- \longrightarrow 2H_2O$$

এবার Fe^{2+} এবং H^+ এবং O_2 বিক্রিয়া করে Fe^{3+} ও পানি উৎপন্ন করে।

$$4Fe^{2+} + 4H^+ + O_2 \longrightarrow 4Fe^{3+} + 2H_2O$$

অতঃপর Fe^{3+} OH^- এর সাথে বিক্রিয়া করে $Fe(OH)_3$ তৈরি করে।

$$Fe^{3+} + 3OH^- \longrightarrow Fe(OH)_3$$

এই ফেরিক হাইড্রোক্সাইড পরিবর্তিত হয়ে পানিযুক্ত ফেরিক অক্সাইড বা মরিচা $Fe_2O_3.3H_2O$ তৈরি হয়।

$$2Fe(OH)_3 \longrightarrow Fe_2O_3.3H_2O$$

অনুসন্ধান

লোহায় মরিচা সৃষ্টির পরীক্ষা

- চারটি টেস্টটিউব নাও এবং 1 থেকে 4 নম্বর দিয়ে চিহ্নিত করো।
- টেস্টটিউবগুলোতে চিত্রের ন্যায় ব্যবস্থা করো।
- 3 নং টেস্টটিউবের পানিকে এক মিনিট ফুটিয়ে পানির উপর এক মিলি রান্নার তেল বা অলিভ অয়েল যোগ করো। তেলের বাধার কারণে ভেতরে বায়ু প্রবেশ করতে পারবে না।

এভাবে টেস্টটিউবগুলোকে এক সপ্তাহ রেখে দাও এবং পর্যবেক্ষণ করো।

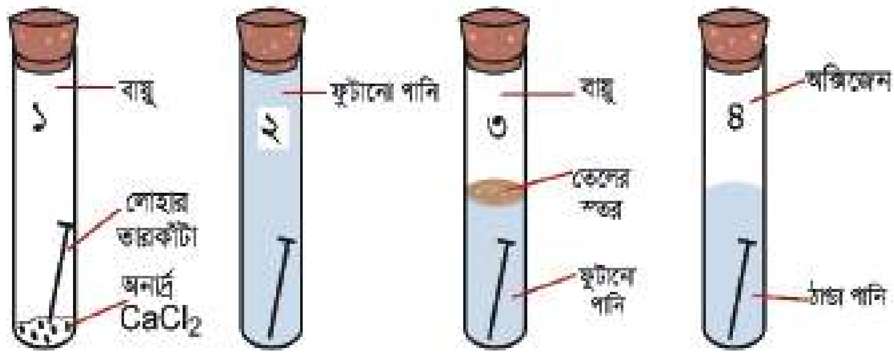

চিত্র ১০.১০: মরিচা সৃষ্টির পরীক্ষা (পানির দ্রবীভূত অক্সিজেন অপসারণের জন্য পানি ফোটানো হয়)

ধাতু ক্ষয়রোধের উপায়

ধাতু বা সংকর ধাতু যদি বাতাসের অক্সিজেন এবং পানির সংস্পর্শে না আসে তবে ধাতু ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। এটি বিভিন্নভাবে করা যায়, যেমন– (i) রং করে (ii) ইলেকট্রোপ্লেটিং ও (iii) গ্যালভানাইজিং করে ইত্যাদি। তোমরা বাড়িতে লোহার তৈরি দরজা-জানালা রং করো যেন লোহা বাতাসের অক্সিজেন এবং পানির সংস্পর্শে না আসে। আমরা জানি কম সক্রিয় ধাতু সাধারণত বাতাসের অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে না। কিন্তু বেশি সক্রিয় ধাতু বাতাসের অক্সিজেন এবং পানির সাথে দ্রুত বিক্রিয়া করে। অতএব, বেশি সক্রিয় ধাতুর ক্ষয় হওয়া থেকে ধাতুকে রক্ষা করার জন্য বেশি সক্রিয় ধাতুর উপর কম সক্রিয় ধাতুর প্রলেপ দেওয়া হয়। এভাবে বেশি সক্রিয় ধাতুকে ক্ষয় হওয়া থেকে রক্ষা করা যায়। একটি অধিক সক্রিয় ধাতুর উপর কম সক্রিয় ধাতুর প্রলেপ দুইভাবে দেওয়া যায়, যথা– ইলেকট্রোপ্লেটিং ও গ্যালভানাইজিং।

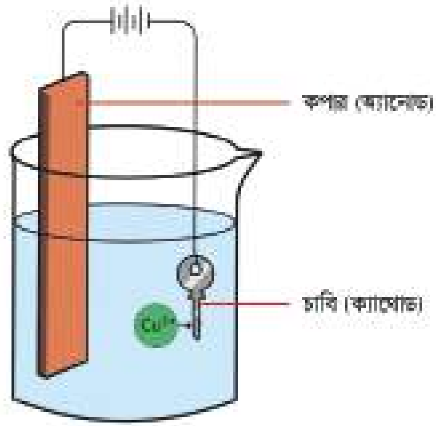

চিত্র ১০.১১: চাবির উপর কপার ধাতুর ইলেকট্রোপ্লেটিং

ইলেকট্রোপ্লেটিং (Electroplating)

সাধারণত তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করে একটি ধাতুর উপর আরেকটি ধাতুর প্রলেপ দেওয়ার প্রক্রিয়াকে বলা হয় ইলেকট্রোপ্লেটিং। এক্ষেত্রে যে ধাতুর প্রলেপ দিতে হবে তাকে ব্যাটারির ধনাত্মক প্রান্তের সাথে যুক্ত করা হয়। যে ধাতুর উপর প্রলেপ দিতে হবে তাকে ব্যাটারির ঋণাত্মক প্রান্তের সাথে যুক্ত করা হয়। এরপর তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতির মাধ্যমে ইলেকট্রোপ্লেটিং করা হয়। যেমন— লোহার উপর কপার ধাতুর প্রলেপ দেওয়ার জন্য $CuSO_4$ এর একটি দ্রবণ নেওয়া হয় এবং কপার দণ্ডকে ব্যাটারির ধনাত্মক প্রান্তের সাথে এবং লোহা দণ্ডকে ব্যাটারির ঋণাত্মক প্রান্তের সাথে যুক্ত করে দ্রবণে তড়িৎ প্রবাহিত করা হয়। তড়িৎ প্রবাহকালে Cu দণ্ডের কপার 2টি ইলেকট্রন ত্যাগ করে Cu^{2+} হিসেবে দ্রবণে চলে যায়।

$$Cu \longrightarrow Cu^{2+} + 2e^- \text{ [জারণ বিক্রিয়া]}$$

এবার এই Cu^{2+} দ্রবণের মধ্য দিয়ে Fe দণ্ড থেকে 2টি ইলেকট্রন গ্রহণ করে Cu এ পরিণত হয় এবং Fe দণ্ডের উপর লেগে যায়।

$$Cu^{2+} + 2e^- \longrightarrow Cu \text{ [বিজারণ বিক্রিয়া]}$$

গ্যালভানাইজিং (Galvanizing): যেকোনো ধাতুর উপর জিংকের প্রলেপ দেওয়াকে গ্যালভানাইজিং বলে। এক্ষেত্রে তড়িৎ বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই। কোনো ধাতুর উপর যেকোনোভাবে জিংকের প্রলেপ দিয়ে গ্যালভানাইজিং করা হয়।

ধাতু পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ (Recycling of Metals)

পৃথিবীতে প্রতিটি মৌলিক পদার্থ বা ধাতুর পরিমাণ নির্দিষ্ট। কোনো ধাতুর তৈরি জিনিসপত্র ব্যবহারের পর সেটা ফেলে না দিয়ে সেটাকে সংগ্রহ করে ঐ ধাতু তৈরির কারখানায় সেগুলো পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ঐ পরিত্যক্ত ধাতু থেকে ব্যবহার উপযোগী ধাতু তৈরি করা হয়। **পরিত্যক্ত ধাতু থেকে আবার ব্যবহার উপযোগী ধাতুতে পরিণত করার পদ্ধতিকে ধাতু পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ বলে।** যেমন– পরিত্যক্ত অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি-পাতিলকে অ্যালুমিনিয়াম তৈরির কারখানায় প্রেরণ করে অ্যালুমিনিয়াম ধাতু পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ করা হয়। পরিত্যক্ত লোহাকে লোহা তৈরির কারখানায় প্রেরণ করে লোহা ধাতু পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ করা হয়। আমেরিকায় যে কপার ব্যবহৃত হয় সেই কপারের প্রায় 21% কপার পুনঃপ্রক্রিয়াজাত এর মাধ্যমে তৈরি করে। ইউরোপে যে অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহৃত হয় সেই অ্যালুমিনিয়ামের 60% অ্যালুমিনিয়াম পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে তৈরি হয়।

১০.৫ খনিজ অধাতু (Nonmetal Minerals)

খনি থেকে যে অধাতুসমূহকে পাওয়া যায় তাদেরকে খনিজ অধাতু বলা হয়। সালফার একটি খনিজ অধাতু এবং খনি থেকে সালফার সংগ্রহ করা হয়।

সালফার

সালফার হলুদ বর্ণের পদার্থ। সালফারের খনি মাটির অনেক নিচে থাকে। ফ্রাশ (Frasch) পদ্ধতিতে সালফারের খনি থেকে সালফারকে নিষ্কাশন করা হয়। এক্ষেত্রে মাটির অনেক নিচে সালফারের খনির মধ্যে তিনটি এককেন্দ্রিক পাইপ প্রবেশ করানো হয়, যাকে ফ্লাশ পাইপ বলে। সালফার 115° C তাপমাত্রায় গলে যায়। এজন্য সালফারের গলনাঙ্কের চেয়ে বেশি তাপমাত্রায় গরম পানি (সুপার হিটেড ওয়াটার) তিনটি এককেন্দ্রিক নলের বাইরের পাইপ দিয়ে প্রবাহিত করা হয় যাতে গরম পানির তাপমাত্রায় সালফার গলে যায়। আমরা জানি এক বায়ুমণ্ডলীয় চাপে পানির স্ফুটনাঙ্ক 100° C, কিন্তু চাপ বাড়ালে পানির স্ফুটনাঙ্ক বৃদ্ধি পায়। এভাবে অতিরিক্ত চাপে 100° C থেকে 374° C তাপমাত্রার মধ্যবর্তী যেকোনো তাপমাত্রার পানিকে সুপার হিটেড ওয়াটার বলে। এবার সবচেয়ে ভিতরের পাইপ দিয়ে 20-22 বায়ুমণ্ডল চাপের বাতাস প্রবাহিত করা হয়। একদিকে বাইরের পাইপ দিয়ে গরম পানির চাপে এবং সবচেয়ে ভিতরের পাইপ দিয়ে বাতাসের চাপে গলিত সালফার মাঝের পাইপ দিয়ে মাটির উপরে উঠে এসে বাইরের পাত্রে জমা হয়।

সালফারের ব্যবহার

সালফার বিভিন্ন শিল্পকারখানায় প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। যেমন–

(i) সালফিউরিক এসিড প্রস্তুতিতে সালফার ব্যবহার করা হয়।

(ii) রাবারকে টেকসই করার জন্য রাবারের মধ্যে সালফার যোগ করা হয়। একে রাবারের ভলকানাইজিং বলে।

(iii) সালফানাইড দ্বারা বিভিন্ন প্রকার ওষুধ তৈরি করা হয়। সালফানাইড ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে। সালফানাইড প্রস্তুতিতে সালফার ব্যবহার করা হয়।

চিত্র ১০.১২: ফ্রাশ পদ্ধতিতে সালফার উত্তোলন

সালফারের যৌগ

সালফারের কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ যৌগ নিচে আলোচনা করা হলো।

সালফার ডাই-অক্সাইড

সালফারকে বাতাসের অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে সালফার ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন করে।

$$S + O_2 \longrightarrow SO_2$$

সালফার ডাই-অক্সাইড গ্যাস অত্যন্ত বিষাক্ত। এই গ্যাস নাক বা মুখের মধ্য দিয়ে শরীরে প্রবেশ করলে শরীরের ক্ষতি হয়। SO_2 গ্যাস চোখে প্রবেশ করলে চোখ জ্বালাপোড়া করে। কয়লার মধ্যে যদি সালফার থাকে বা পেট্রোলিয়াম তেলের মধ্যে যদি সালফার থাকে তবে কয়লা বা তেলকে বাতাসে পোড়ালে কয়লা বা তেলের মধ্যের সালফার অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে তীব্র ঝাঁজালো SO_2 গ্যাস উৎপন্ন হয়। এই গ্যাস বায়ুমণ্ডলে চলে যায়। যখন বৃষ্টি হয় তখন এই গ্যাস পানির সাথে বিক্রিয়া করে সালফিউরাস এসিড (H_2SO_3) উৎপন্ন করে যেটি বৃষ্টির পানির সাথে মাটিতে পড়ে। এই বৃষ্টিকে এসিড বৃষ্টি বলে।

$$SO_2 + H_2O \longrightarrow H_2SO_3$$

সালফিউরিক এসিড

সালফিউরিক এসিড অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য অপেক্ষা সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় বলে সালফিউরিক এসিডকে রাসায়নিক দ্রব্যের রাজা বলা হয়। শিল্পকারখানায় কঠিন সালফার থেকে সালফিউরিক এসিডকে প্রস্তুত করা হয়। এই পদ্ধতিকে স্পর্শ পদ্ধতি বলে।

স্পর্শ পদ্ধতি: স্পর্শ পদ্ধতিটি কয়েকটি ধাপে সম্পন্ন হয়।

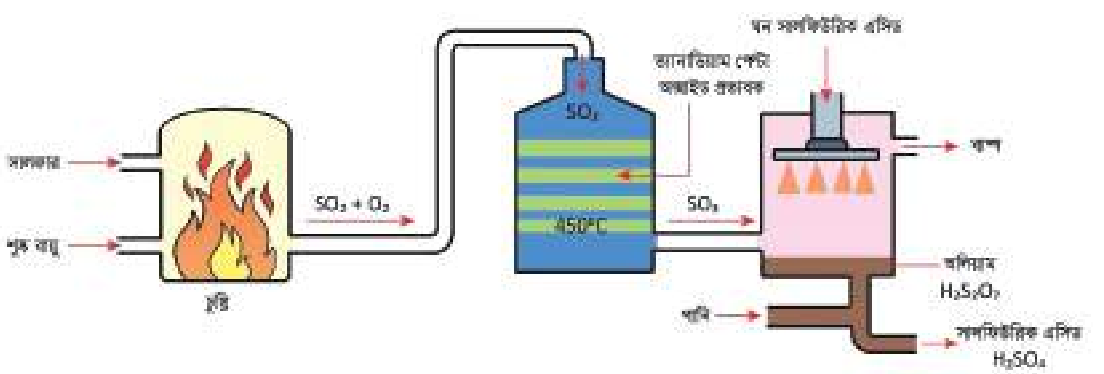

চিত্র ১০.১৩: স্পর্শ পদ্ধতিতে সালফিউরিক এসিড (H_2SO_4) প্রস্তুতি

ধাপ 1: প্রথমে একটি চুল্লিতে সালফার (S) এবং শুষ্ক বায়ু (যে বায়ুতে জলীয় বাষ্প নেই) প্রবাহিত করা হয়। এই চুল্লিতে সালফার এবং অক্সিজেন বিক্রিয়া করে সালফার ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন করে।

$$S + O_2 \longrightarrow SO_2$$

ধাপ 2: SO_2 গ্যাসের সাথে কিছু O_2 গ্যাস একটি চুল্লিতে প্রেরণ করা হয়। এই চুল্লির তাপমাত্রা থাকে $450^0C - 550^0C$ এবং প্রভাবক থাকে ভ্যানাডিয়াম পেন্টা-অক্সাইড। এই চুল্লিতে উচ্চ তাপমাত্রায় প্রভাবকের উপস্থিতিতে SO_2 এবং O_2 বিক্রিয়া করে সালফার ট্রাই-অক্সাইড উৎপন্ন করে।

$$2SO_2 + O_2 \longrightarrow 2SO_3$$

ধাপ 3: উৎপন্ন SO_3 এর সাথে H_2O এর সংস্পর্শ ঘটলে H_2SO_4 তৈরি হবে। কিন্তু SO_3 এর সাথে সরাসরি H_2O বিক্রিয়ায় বাষ্পীয় H_2SO_4 তৈরি হয় যা ঘন কুয়াশার মতো অবস্থা তৈরি করে। এতে শিল্পকারখানায় কাজের অসুবিধা হয়। এছাড়া এই বাষ্পীয় H_2SO_4 কে ঘনীভূত করে তরল H_2SO_4 এ পরিণত করা কঠিন। এজন্য SO_3 কে প্রথমে গাঢ় H_2SO_4 এর মধ্যে শোষণ করিয়ে ধূমায়মান সালফিউরিক এসিড তৈরি করা হয়। (ধূমায়মান সালফিউরিক এসিডকে অলিয়াম বলে। এর সংকেত $H_2S_2O_7$।)

$$H_2SO_4 + SO_3 \longrightarrow H_2S_2O_7$$

ধূমায়মান সালফিউরিক এসিড এর সাথে পানির বিক্রিয়া ঘটিয়ে তরল সালফিউরিক এসিড তৈরি করা হয়।

$$H_2S_2O_7 + H_2O \longrightarrow 2H_2SO_4$$

সালফিউরিক এসিডের ধর্ম

এসিড ধর্ম: লঘু H_2SO_4 বা গাঢ় H_2SO_4 কোনো ক্ষারের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ এবং পানি তৈরি করে। একে H_2SO_4 এর এসিড ধর্ম বলে। যেমন: সালফিউরিক এসিড ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড এর সাথে বিক্রিয়া করে ক্যালসিয়াম সালফেট লবণ এবং পানি উৎপন্ন করে।

H_2SO_4	+	$Ca(OH)_2$	$\longrightarrow$	$CaSO_4$	+	$2H_2O$
সালফিউরিক এসিড		ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড		ক্যালসিয়াম সালফেট		পানি

জারণ ধর্ম (Oxidation Property)

H_2SO_4 এর মধ্যে অনেক বেশি পানি থাকলে অর্থাৎ পানির মধ্যে H_2SO_4 দিলে সেই H_2SO_4 কে লঘু H_2SO_4 এসিড বলে। লঘু H_2SO_4 এর জারণ ধর্ম নেই। কিন্তু যে H_2SO_4 এর মধ্যে পানি কম পরিমাণে থাকে সেই H_2SO_4 কে গাঢ় H_2SO_4 বলে। গাঢ় H_2SO_4এর জারণ ধর্ম আছে। গাঢ় H_2SO_4 কপারকে জারিত করে কপার সালফেটে পরিণত করে এবং নিজে বিজারিত হয়ে সালফার ডাই-অক্সাইড এবং পানি উৎপন্ন করে ।

$$2H_2SO_4 \text{ (গাঢ়)} + Cu \longrightarrow CuSO_4 + SO_2 + 2H_2O$$

নিরুদন ধর্ম (The Dehydrating Property)

যে পদার্থ কোনো যৌগ থেকে পানি শোষণ করে সেই পদার্থকে নিরুদক বলে। পানি শোষণ করার ধর্মকে নিরুদন ধর্ম বলে। লঘু H_2SO_4 এর কোনো নিরুদন ধর্ম নেই, কিন্তু গাঢ় H_2SO_4 এর নিরুদন ধর্ম আছে। গাঢ় H_2SO_4 চিনি ($C_{12}H_{22}O_{11}$) থেকে পানি শোষণ করে। এজন্য গাঢ় H_2SO_4 কে নিরুদক বলে।

$$C_{12}H_{22}O_{11} + H_2SO_4 \longrightarrow 12C + H_2SO_4.11H_2O$$

একক কাজ

- একটি টেস্টটিউবে 2-3 mL চুনের পানি নিয়ে এতে কয়েক ফোঁটা লঘু সালফিউরিক এসিড যোগ করো। ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করো। পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করো এবং সম্ভাব্য বিক্রিয়াটি লেখো।

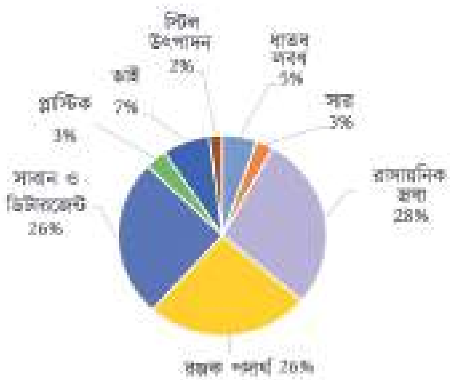

চিত্র ১০.১৪: সালফিউরিক এসিডের ব্যবহার

- একটি টেস্টটিউবে এক চিমটি পটাশিয়াম আয়োডাইড KI নিয়ে এতে কয়েক ফোঁটা ঘন সালফিউরিক এসিড যোগ করো। ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করো। পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করো এবং সম্ভাব্য বিক্রিয়াটি লেখো।
- একটি টেস্টটিউবে এক চামচ চিনি ($C_{12}H_{22}O_{11}$)) নিয়ে এতে কয়েক ফোঁটা ঘন সালফিউরিক এসিড যোগ করো। ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করো।
- পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করো এবং সম্ভাব্য বিক্রিয়াটি লেখো। এই পরীক্ষাটি সাবধানে করতে হবে।
- উপরের পরীক্ষা তিনটির কোনটিতে সালফিউরিক এসিডের কোন ধর্ম (এসিড, জারক, নিরুদক) প্রকাশ করে তা ব্যাখ্যা করো।
- সালফিউরিক এসিডের ব্যবহার প্রকাশকারী পাই চার্টের (চিত্র: ১০.১৪) তথ্যের ভিত্তিতে বাংলাদেশে সালফিউরিক এসিডের অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. টেবিলের কোন রেকর্ডটি সাধারণত ধাতুর বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে?

	গলনাঙ্ক	স্ফুটনাঙ্ক	ঘনত্ব
(ক)	1539	2887	7.86
(গ)	-113	45	0.79

	গলনাঙ্ক	স্ফুটনাঙ্ক	ঘনত্ব
(খ)	-219	183	0.002
(ঘ)	117	888	1.96

উদ্দীপক থেকে ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

একদল শিক্ষার্থী মরিচার অনুসন্ধান করছিল। তারা বাম থেকে ক্রমান্বয়ে চারটি টেস্টটিউবে চারটি লোহার পেরেক রাখল এবং নিচের চিত্রানুযায়ী ব্যবস্থা নিল।

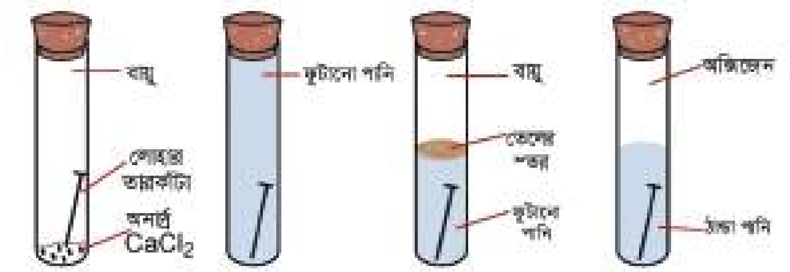

২. কোন টেস্টটিউবের পেরেকটিতে সবচেয়ে বেশি মরিচা ধরবে?

(ক) প্রথম (খ) দ্বিতীয়

(গ) তৃতীয় (ঘ) চতুর্থ

৩. পরীক্ষাটির ভিত্তিতে যে সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা যায়–

(i) মরিচা ধরার জন্য অক্সিজেন আবশ্যক

(ii) লবণ প্রভাবক হিসেবে কাজ করছে

(iii) কেবল অক্সিজেন উপস্থিত থাকলেই মরিচা ধরে না

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii

(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৪. গিনি সোনার কোন নমুনাটি সর্বোচ্চ দৃঢ়?

(ক) 18 ক্যারেট (খ) 21 ক্যারেট

(গ) 22 ক্যারেট (ঘ) 24 ক্যারেট

৫. লঘুকরণের পানিতে ফোঁটায় ফোঁটায় সালফিউরিক এসিড যোগ করার কারণ, সালফিউরিক এসিড-

(i) এর হাইড্রেশন তাপ অত্যধিক

(ii) একটি দ্বিক্ষারকীয় এসিড

(iii) ক্ষয়কারক পদার্থ

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৬. SO_3 কে 98% সালফিউরিক এসিডে শোষণ করে পানি যোগে প্রয়োজনমতো লঘু করা হয়, কারণ সালফিউরিক এসিড–

(i) জলীয় বাষ্পের সাথে ঘন কুয়াশা সৃষ্টি করে

(ii) পানিযোগে প্রচুর তাপ নির্গত করে

(iii) একটি নিরুদক পদার্থ

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৭. নিচের কোনটি খনিজমল?

(ক) Al_2O_3 (খ) ZnS

(গ) SiO_2 (ঘ) PbS

৮. সিনেবার কোন ধাতুর আকরিক?

(ক) মার্কারি (খ) কপার

(গ) জিংক (ঘ) লেড

৯. Al_2O_3 গলনাঙ্ক কত?

(ক) 2050°C (খ) 2000°C

(গ) 1000°C (ঘ) 950°C

১০. নিচের কোনটির সক্রিয়তা বেশি?

(ক) Cu (খ) Zn

(গ) Fe (ঘ) Pb

১১. তাম্রমলে থাকে

i. $CuCO_3$

ii. $CuSO_4$

iii. $Cu(OH)_2$

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

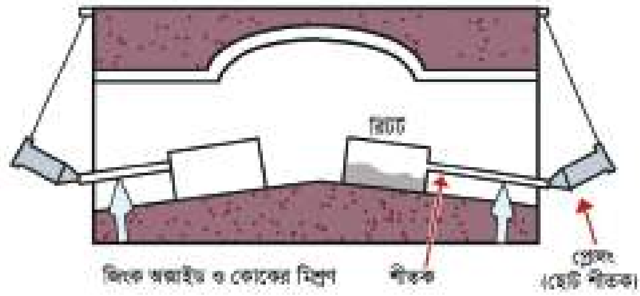

১. (ক) ক্যালামাইনের রাসায়নিক সংকেত লেখো।
   (খ) তাপজারণের ব্যাখ্যা দাও।
   (গ) রিটর্টে সংঘটিত মূল বিক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করো।
   (ঘ) উদ্দীপকের ধাতু কেবল তড়িৎ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় নিষ্কাশন না করে তিন ধাপে করার কারণ মূল্যায়ন করো।

২. একটি খনিতে বক্সাইট ও ক্যালামাইন মিশ্রিত কিছু খনিজের অস্তিত্ব পাওয়া গেল। প্রফেসর রহমানের নেতৃত্বে একদল রসায়নবিদ উক্ত খনিজ থেকে দুটি ভিন্ন পদ্ধতিতে ধাতু দুটি নিষ্কাশন করলেন।
   (ক) খনিজ কাকে বলে?
   (খ) 'সকল খনিজই আকরিক নয়' ব্যাখ্যা করো।
   (গ) দ্বিতীয় আকরিকটির বিয়োজন প্রাপ্ত অক্সাইডদ্বয়ের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করো।
   (ঘ) ভিন্ন পদ্ধতিতে ধাতু দুটি নিষ্কাশনের কারণ যুক্তিসহ লেখো।

৩. পর্যায় সারণির গ্রুপ-16 এর একটি মৌলকে বায়ুতে পোড়ালে একটি অক্সাইড A পাওয়া যায়। অক্সাইডটি ঝাঁজালো গন্ধযুক্ত অত্যন্ত বিষাক্ত গ্যাস। লা-শাতেলিয়ার নীতি প্রয়োগ করে শিল্পক্ষেত্রে A থেকে একটি এসিড B তৈরি করা যায়।
   (ক) আকরিক কাকে বলে?
   (খ) A অক্সাইড অম্লধর্মী– ব্যাখ্যা করো।
   (গ) উদ্দীপকের B এসিডটি তৈরি করার প্রক্রিয়া বর্ণনা করো।
   (ঘ) উদ্দীপকের B এসিডটির গাঢ়ত্বের ওপর জারণ ধর্ম নির্ভর করে– যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করো।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. ম্যাগনেসিয়াম ধাতুকে কার্বন বিজারণ প্রক্রিয়ায় নিষ্কাশন করা যায় না কেন? ব্যাখ্যা করো।
২. SO_2 কে অম্লধর্মী অক্সাইড বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো।
৩. অ্যালুমিনিয়াম ধাতু নিষ্কাশনে ক্রায়োলাইট ব্যবহার করা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো।

একাদশ অধ্যায়

খনিজ সম্পদ: জীবাশ্ম

(Mineral Resources: Fossils)

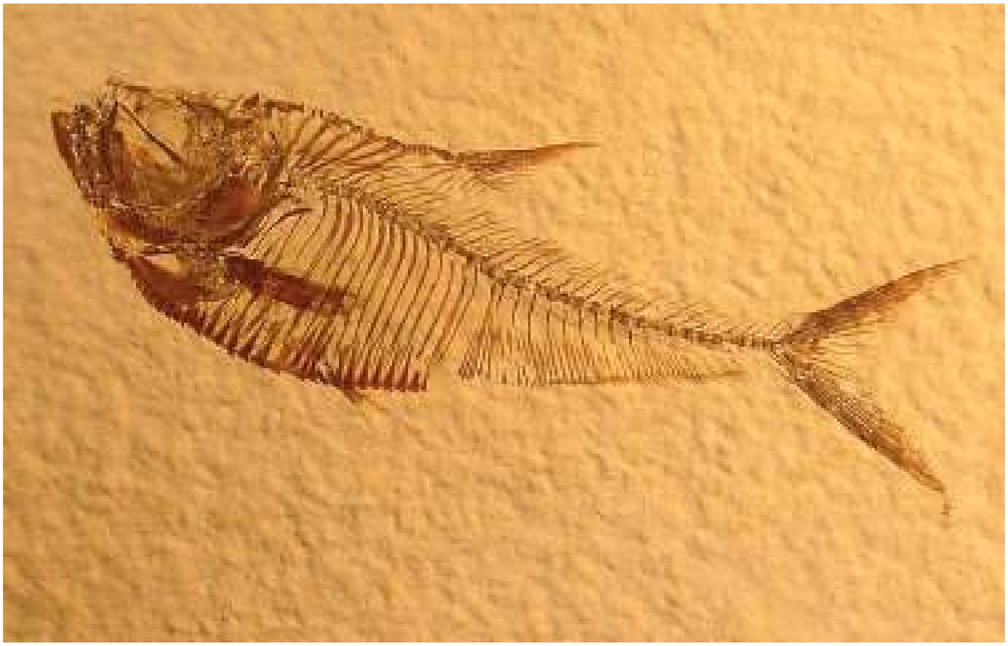

এ পৃথিবীর বয়স প্রায় 4.54 বিলিয়ন বছর। আজকে পৃথিবীকে যেমন দেখছ, অনেক অনেক বছর আগে পৃথিবীর রূপ কিন্তু এমন ছিল না। আজ থেকে 500 বা 600 মিলিয়ন বছর আগে এই পৃথিবী ছিল ঘন বনজঙ্গল, নিচু জলাভূমি আর সাগর-মহাসাগরে পরিপূর্ণ। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত মৃত প্রাণী, উদ্ভিদ, শৈবাল-ছত্রাক নিচু এলাকাগুলোতে জমা হয়েছিল। তার উপর পড়তে থাকল পলির আস্তরণ। এভাবে মিলিয়ন মিলিয়ন বছর ধরে এ সকল উদ্ভিদ আর প্রাণীর দেহাবশেষের উপর হাজার হাজার ফুট মাটি, বিভিন্ন শিলার আস্তরণ হয়ে গেল। উচ্চচাপ, উচ্চ তাপমাত্রা, মিলিয়ন মিলিয়ন বছর ধরে বিভিন্ন ভৌত আর রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে কয়লা, পেট্রোলিয়াম আর প্রকৃতিক গ্যাস সৃষ্টি হলো। এদেরকে বলে জীবাশ্ম জ্বালানি। কয়লার মূল উপাদান কার্বন। আর পেট্রোলিয়ামের মূল উপাদান শুধু কার্বন ও হাইড্রোজেনের দ্বারা সৃষ্ট যৌগ হাইড্রোকার্বন। হাইড্রোকার্বন হলো জৈব যৌগ। অ্যালকোহল, অ্যালডিহাইড, কিটোন, কার্বক্সিলিক এসিডসহ আরও যে সকল জৈব যৌগ আছে তারা মূলত হাইড্রোকার্বন থেকেই সৃষ্ট। এগুলো নিয়েই এ অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- জীবাশ্ম জ্বালানির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পেট্রোলিয়ামকে জৈব যৌগের মিশ্রণ হিসেবে ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পেট্রোলিয়ামের ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারব।
- হাইড্রোকার্বনের ধরন ও শ্রেণিবিভাগ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সম্পৃক্ত ও অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনের প্রস্তুতির বিক্রিয়া ও ধর্ম ব্যাখ্যা এবং এদের মধ্যে পার্থক্য করতে পারব।
- প্লাস্টিক দ্রব্য ও তন্তু তৈরির রাসায়নিক বিক্রিয়া এবং এর ব্যবহার বর্ণনা করতে পারব।
- পরিবেশের ওপর প্লাস্টিক দ্রব্য অপব্যবহারের কুফল উল্লেখ করতে পারব।
- প্রাকৃতিক গ্যাস, পেট্রোলিয়াম এবং কয়লা ব্যবহারের সুবিধা, অসুবিধা ও ব্যবহারের কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারব।
- হাইড্রোকার্বন থেকে অ্যালকোহল অ্যালডিহাইড ও জৈব এসিডের প্রস্তুতির কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারব।
- অ্যালকোহল, অ্যালডিহাইড ও জৈব এসিডের ব্যবহার করতে পারব।
- পরিবেশের উপর প্লাস্টিক দ্রব্যের প্রভাব সম্পর্কিত অনুসন্ধানমূলক কাজ করতে পারব।
- পরীক্ষার মাধ্যমে জৈব ও অজৈব যৌগের মধ্যে পার্থক্য করে দেখাতে পারব।
- জীবাশ্ম জ্বালানির সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতা প্রদর্শন করতে পারব।

১১.১ জীবাশ্ম জ্বালানি (Fossil Fuel)

বহু প্রাচীনকালের উদ্ভিদ এবং প্রাণীর মৃতদেহের যে ধ্বংসাবশেষ মাটির নিচে পাওয়া যায় তাকে জীবাশ্ম বলে। কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস ও পেট্রোলিয়াম যেগুলো আমরা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করি সেগুলো মাটির নিচের জীবাশ্ম শত শত মিলিয়ন বছর ধরে পরিবর্তিত হয়ে তৈরি হয়েছে। তাই কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামকে জীবাশ্ম জ্বালানি বলে।

শত শত মিলিয়ন বছর আগে এ পৃথিবীর ইতিহাসে বিভিন্ন সময় ছিল যখন এ পৃথিবীজুড়ে ছিল ঘন বনজঙ্গল, নিচু জলাভূমি আর সমুদ্র সেখানে ছিল জলজ উদ্ভিদ, ফাইটোপ্লাংকটন (পানিতে বসবাসকারী এক ধরনের শৈবাল), জুওপ্লাংকটন (পানিতে বসবাসকারী এক ধরনের ছোট প্রাণী)। বিভিন্ন সময় বড় বড় প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে এই ধরনের উদ্ভিদ, প্রাণী মাটিচাপা পড়ে যায়। সময়ের বিবর্তনে তার উপর আরও মাটি পড়ে। ধীরে ধীরে এগুলো মাটির গভীর থেকে গভীরে চলে যেতে থাকে। ফলে এর উপর চাপ ও তাপমাত্রা বাড়তে থাকে। বায়ুর অনুপস্থিতিতে এগুলোর ক্ষয় ও রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটতে থাকে। শত শত মিলিয়ন বছর ধরে তাপ, চাপ আর রাসায়নিক পরিবর্তনের কারণে বড় বড় উদ্ভিদ ও প্রাণী থেকে শুরু করে ক্ষুদ্রতম উদ্ভিদ ও প্রাণী পর্যন্ত সকল ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণী থেকে জীবাশ্ম জ্বালানির সৃষ্টি হয়েছে। বড় বড় উদ্ভিদ থেকে কয়লা আর ফাইটোপ্লাংকটন, জুওপ্লাংকটন ও মৃত প্রাণীর দেহাবশেষ থেকে পেট্রোলিয়ামের সৃষ্টি হয়েছে। এ পরিবর্তন অব্যাহত থাকায় পেট্রোলিয়াম আরও পরিবর্তিত হয়ে প্রাকৃতিক গ্যাস সৃষ্টি হয়। তাই কোথাও কোথাও পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস এক সাথেই থাকে। যেমন– বাংলাদেশের হরিপুর গ্যাসক্ষেত্রে প্রাকৃতিক গ্যাসের সাথে পেট্রোলিয়ামও পাওয়া গেছে। এই জীবাশ্ম জ্বালানির মূল উৎস জীবদেহ, তাই এ সকল জ্বালানির মূল উপাদান কার্বন ও কার্বনের যৌগ।

১১.১.১ প্রাকৃতিক গ্যাস (Natural Gas)

সাধারণত প্রাকৃতিক গ্যাসের বিভিন্ন উপাদানের অনুপাত তার প্রাকৃতিক উৎসের ভিত্তিতে ভিন্ন হয়ে থাকে। প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান উপাদান হলো মিথেন। এছাড়া প্রাকৃতিক গ্যাসে ইথেন, প্রোপেন, বিউটেন ও আইসোবিউটেন এবং পেন্টেন থাকে। বাংলাদেশে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক গ্যাসে ৯৩-৯৮% মিথেন, ০.২-৩.৯% ইথেন, ০.০৫-১.২% প্রোপেন, ০.১-০.৭২% বিউটেন এবং ১.২% পেন্টেন পাওয়া গেছে।

১১.১.২ পেট্রোলিয়ামের উপাদানসমূহ ও তাদের পৃথকীকরণ

পেট্রোলিয়াম সাধারণত 5000 ফুট বা তার চেয়েও গভীরে শিলা স্তরের মধ্যে পাওয়া যায়। পেট্রোলিয়ামের সাথে অনেক সময় প্রাকৃতিক গ্যাস থাকে, যা পেট্রোলিয়ামের উপরিভাগে চাপ প্রয়োগ

২০২৫

করে। কূপ খনন করা হলে এই প্রাকৃতিক গ্যাস পেট্রোলিয়ামকে ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগে উঠে আসতে সাহায্য করে। যে পেট্রোলিয়াম খনি থেকে সরাসরি পাওয়া যায় তাকে অপরিশোধিত তেল (Crude Oil) বা পেট্রোলিয়াম বলে। এই অপরিশোধিত তেল অস্বচ্ছ, এতে কখনো কখনো সালফারের কিছু কিছু যৌগ থাকার কারণে দুর্গন্ধযুক্ত হয়। এই পেট্রোলিয়াম মূলত বিভিন্ন হাইড্রোকার্বনের মিশ্রণ এবং সরাসরি ব্যবহার উপযোগী নয়। এই অপরিশোধিত তেল আংশিক পাতন পদ্ধতিতে স্ফুটনাঙ্কের উপর ভিত্তি করে পৃথক করা হয়।

আংশিক পাতনও হলো এক ধরনের পাতন। এখানে বাষ্পকে ঠান্ডা করার জন্য লম্বা কলাম থাকে। কলাম আবার বিভিন্ন অংশে বিভক্ত। নিচের অংশটির তাপমাত্রা সবচেয়ে বেশি। যে অংশ যত উপরে তার তাপমাত্রা তত কম। ফলে যদি একাধিক তরলের মিশ্রণকে তাপ দিয়ে বাষ্পীভূত করে আংশিক পাতন কলামের নিচের অংশে প্রবেশ করানো হয় তবে বাষ্পের ধর্ম অনুযায়ী তা কলামের উপরের দিকে উঠবে। যেহেতু উপরের অংশগুলোর তাপমাত্রা কম থাকে, তাই তরলের মিশ্রণের প্রত্যেকটি উপাদান তাদের স্ফুটনাঙ্ক অনুযায়ী আংশিক পাতন কলামের বিভিন্ন অংশে পৃথক হয়। পেট্রোলিয়াম বিভিন্ন হাইড্রোকার্বনের মিশ্রণ। এদের স্ফুটনাঙ্কও বিভিন্ন। আগেই বলা হয়েছে অপরিশোধিত তেল ব্যবহারের উপযুক্ত নয়, কিন্তু একে যদি আংশিক পাতনের সাহায্যে পৃথক করা হয় তবে এ অপরিশোধিত তেল থেকে পেট্রোল, গ্যাস, পেট্রোলিয়াম, ন্যাপথা, কেরোসিন, ডিজেল, প্যারাফিন মোম এবং পিচ প্রভৃতি অংশে বিভক্ত হয়ে যায়। যা বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা যায়। আংশিক পাতন কলাম থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন অংশের নাম, বিভিন্ন

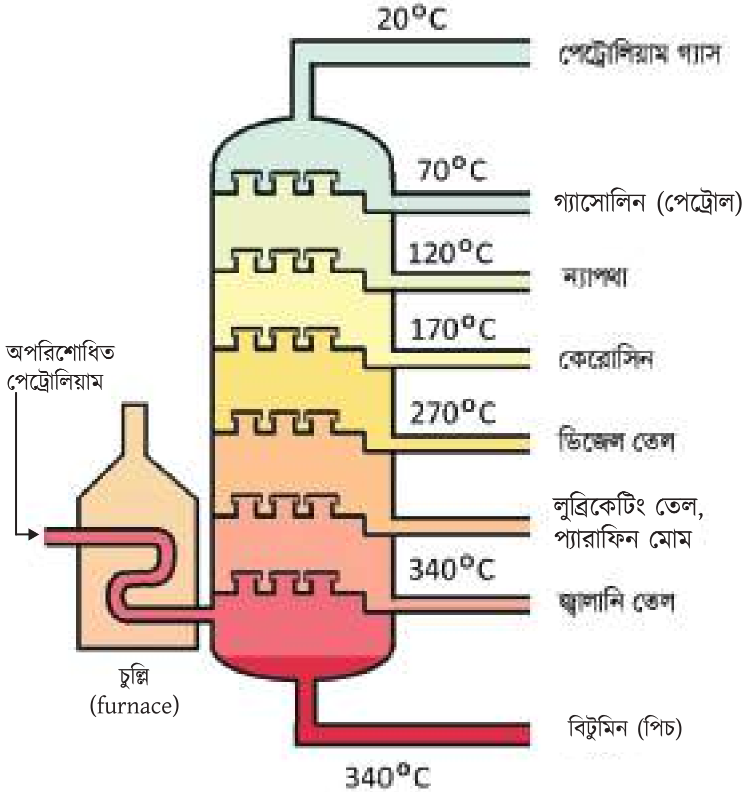

চিত্র ১১.০১: পেট্রোলিয়ামের আংশিক পাতন

অংশের স্ফুটনাঙ্ক, বিভিন্ন অংশে যে হাইড্রোকার্বনসমূহ থাকে তাদের কার্বন সংখ্যা এবং তাদের ব্যবহার নিচে বর্ণনা করা হলো:

(i) **পেট্রোলিয়াম গ্যাস:** এ অংশের স্ফুটনাঙ্ক 0°C থেকে 20°C পর্যন্ত। এ অংশে যে হাইড্রোকার্বনসমূহ থাকে তাদের অণুতে কার্বন সংখ্যা 1 থেকে 4 পর্যন্ত। পেট্রোলিয়ামে শতকরা দুই ভাগ পেট্রোলিয়াম গ্যাস থাকে। এ গ্যাসকে চাপ প্রয়োগ করে তরলে পরিণত করে সিলিন্ডারে ভর্তি করা হয় এবং LPG (Liquefied Petroleum Gas) নামে রান্নার কাজে ও অন্যান্য কাজে তাপ উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা হয়।

(ii) পেট্রোল (গ্যাসোলিন): এ অংশের স্ফুটনাঙ্ক 21°C থেকে 70°C পর্যন্ত। এ অংশে যে হাইড্রোকার্বনসমূহ থাকে তাদের অণুতে কার্বন সংখ্যা 5 থেকে 10 পর্যন্ত। পেট্রোলিয়ামে শতকরা 5 ভাগ পেট্রোল থাকে। একে গ্যাসোলিনও বলা হয়। যানবাহনের ইঞ্জিনে জ্বালানি হিসেবে গ্যাসোলিন ব্যবহার করা হয়।

(iii) ন্যাপথা: এ অংশের স্ফুটনাঙ্ক 71°C থেকে 120°C পর্যন্ত। এ অংশে যে হাইড্রোকার্বনসমূহ থাকে তাদের অণুতে কার্বন সংখ্যা 7 থেকে 14 পর্যন্ত। পেট্রোলিয়ামে শতকরা 10 ভাগ ন্যাপথা থাকে। জ্বালানি ও পেট্রোকেমিক্যাল শিল্পে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ ও অন্যান্য অনেক ব্যবহার্য দ্রব্য তৈরি করা হয়।

(iv) কেরোসিন: এ অংশের স্ফুটনাঙ্ক 121°C থেকে 170°C পর্যন্ত। এ অংশে যে সকল হাইড্রোকার্বন থাকে তাদের অণুতে কার্বন সংখ্যা 11 থেকে 16 পর্যন্ত। পেট্রোলিয়ামে শতকরা 13 ভাগ কেরোসিন থাকে। পেট্রোলিয়ামের এই অংশকে জেট ইঞ্জিনের জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

(v) ডিজেল: এ অংশের স্ফুটনাঙ্ক 171°C থেকে 270°C পর্যন্ত। এ অংশে যে হাইড্রোকার্বনসমূহ থাকে তাদের অণুতে কার্বন সংখ্যা 17 থেকে 20 পর্যন্ত। যানবাহনের জ্বালানি, পিচ্ছিলকারক পদার্থ ও দ্রাবক হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

(vi) প্যারাফিন মোম: এ অংশের স্ফুটনাঙ্ক 271°C থেকে 340°C পর্যন্ত। এ অংশে যে হাইড্রোকার্বনসমূহ থাকে তাদের অণুতে কার্বন সংখ্যা 20 থেকে 30 পর্যন্ত। প্যারাফিন মোম টয়লেট্রিজ এবং ভ্যাসলিন তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

(vii) পিচ: এ অংশের স্ফুটনাঙ্ক 340°C থেকে উচ্চ তাপমাত্রা পর্যন্ত। এ অংশে যে হাইড্রোকার্বনসমূহ থাকে তাদের অণুতে কার্বন সংখ্যা 30 এর বেশি। রাস্তা তৈরিতে এটি কাজ লাগে।

১১.২ হাইড্রোকার্বন (Hydrocarbons)

হাইড্রোকার্বন হলো শুধু কার্বন ও হাইড্রোজেন এর সমন্বয়ে গঠিত যৌগ। যেমন: মিথেন (CH_4), ইথিন (C_2H_4), সাইক্লোহেক্সেন (C_6H_{12}), বেনজিন (C_6H_6) ইত্যাদি। দেখতেই পাচ্ছ যৌগগুলোতে কার্বন আর হাইড্রোজেন ছাড়া আর কোনো মৌল নেই।

হাইড্রোকার্বন মূলত দুই প্রকার: (i) অ্যালিফেটিক হাইড্রোকার্বন ও (ii) অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন।

১১.২.১ অ্যালিফেটিক হাইড্রোকার্বন (Aliphatic Hydrocarbons)

অ্যালিফেটিক কথাটির অর্থ হলো চর্বিজাত। এই শ্রেণির হাইড্রোকার্বন মূলত প্রাণীর চর্বি থেকে পাওয়া গিয়েছিল। তাই এ ধরনের হাইড্রোকার্বনের নাম অ্যালিফেটিক হাইড্রোকার্বন দেওয়া হয়েছে। অ্যালিফেটিক হাইড্রোকার্বন দুই ধরনের– (i) মুক্ত শিকল হাইড্রোকার্বন এবং (ii) বদ্ধ শিকল হাইড্রোকার্বন।

(i) মুক্ত শিকল হাইড্রোকার্বন (Open Chain Hydrocarbon)

যে সকল হাইড্রোকার্বনের কার্বন শিকলের দুই প্রান্তের কার্বন দুইটি মুক্ত অবস্থায় থাকে। তাদেরকে মুক্ত শিকল হাইড্রোকার্বন বলে। যেমন–

বিউটেন: $CH_3-CH_2-CH_2-CH_3$, ইথিন: $CH_2=CH_2$ ইত্যাদি।

মুক্ত শিকল হাইড্রোকার্বন আবার সম্পৃক্ত (saturated) এবং অসম্পৃক্ত (unsaturated) দুই ধরনের হয়।

(a) **সম্পৃক্ত মুক্ত শিকল হাইড্রোকার্বন (Saturated Open Chain Hydrocarbons):** যে মুক্ত শিকল হাইড্রোকার্বনে শুধু কার্বন-কার্বন একক বন্ধন (C-C) থাকে, তাকে সম্পৃক্ত মুক্ত শিকল হাইড্রোকার্বন বা অ্যালকেন বলে। যেমন-

প্রোপেন: $CH_3-CH_2-CH_3$, পেন্টেন: $CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3$

(b) অসম্পৃক্ত মুক্ত শিকল হাইড্রোকার্বন (Unsaturated Open Chain Hydrocarbons): যে মুক্ত শিকল হাইড্রোকার্বনে এক বা একাধিক কার্বন-কার্বন দ্বিবন্ধন বা কার্বন-কার্বন ত্রিবন্ধন থাকে, তাকে অসম্পৃক্ত মুক্ত শিকল হাইড্রোকার্বন বলে। যেমন: ইথাইন ($CH\equiv CH$)

অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনে কার্বন-কার্বন দ্বিবন্ধন বা ত্রিবন্ধনের পাশাপাশি কার্বন-কার্বন একক বন্ধনও থাকতে পারে।

অসম্পৃক্ত মুক্ত শিকল হাইড্রোকার্বনকে দ্বিবন্ধন কিংবা ত্রিবন্ধনের উপর নির্ভর করে আবার অ্যালকিন ও অ্যালকাইনে ভাগ করা হয়েছে। আমরা এই অধ্যায়ে অ্যালকিন ও অ্যালকাইন সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানব।

অ্যালকিনে কার্বন-কার্বন দ্বিবন্ধন উপস্থিত থাকে। যেমন: প্রোপিন (CH_3-CH=CH_2)
অ্যালকাইনে কার্বন-কার্বন ত্রিবন্ধন উপস্থিত থাকে। যেমন: ইথাইন ($CH \equiv CH$), প্রোপাইন ($H_3C{-}C{\equiv}CH$)

(ii) বদ্ধ শিকল হাইড্রোকার্বন (Closed Chain Hydrocarbons)

এ জাতীয় হাইড্রোকার্বনের কার্বন শিকলের দুই প্রান্তের কার্বন পরস্পর যুক্ত হয়ে একটি বলয় বা চক্র গঠন করে। বিভিন্ন আকারের শিকল বিভিন্ন আকারের বলয় গঠন করে। মুক্ত শিকল হাইড্রোকার্বনের মতো এরাও সম্পৃক্ত বা অসম্পৃক্ত এ দুই ধরনের হতে পারে:

সম্পৃক্ত বদ্ধ শিকল হাইড্রোকার্বন:

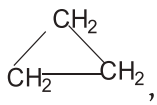

সাইক্লোপ্রোপেন

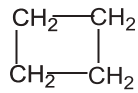

সাইক্লোবিউটেন

অসম্পৃক্ত বদ্ধ শিকল হাইড্রোকার্বন:

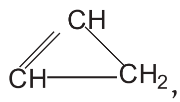

সাইক্লোপ্রোপিন

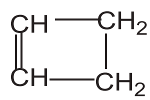

সাইক্লোবিউটিন

বদ্ধ শিকল হাইড্রোকার্বনকে অনেক সময় অ্যালিসাইক্লিক হাইড্রোকার্বনও বলা হয়।

১১.২.২ অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন (Aromatic Hydrocarbons)

গ্রিক শব্দ অ্যারোমা (Aroma) থেকে অ্যারোমেটিক শব্দটি এসেছে। অ্যারোমেটিক শব্দের অর্থ হলো সুগন্ধযুক্ত। প্রথমে যে অ্যারোমেটিক যৌগগুলো পাওয়া গিয়েছিল সেগুলো ছিল সুগন্ধযুক্ত, তাই এ ধরনের নামকরণ করা হয়েছে। বেনজিন (C_6H_6) বা ন্যাপথলিন ($C_{10}H_8$) হচ্ছে অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বনের উদাহরণ।

অ্যারোমেটিক যৌগগুলো সাধারণত 5, 6 কিংবা 7 সদস্যের সমতলীয় যৌগ (planar compounds)। এগুলোতে একান্তর (alternate) দ্বিবন্ধন থাকে, অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে কার্বন-কার্বন একটি একক বন্ধন এবং তারপর একটি দ্বিবন্ধন থাকে।

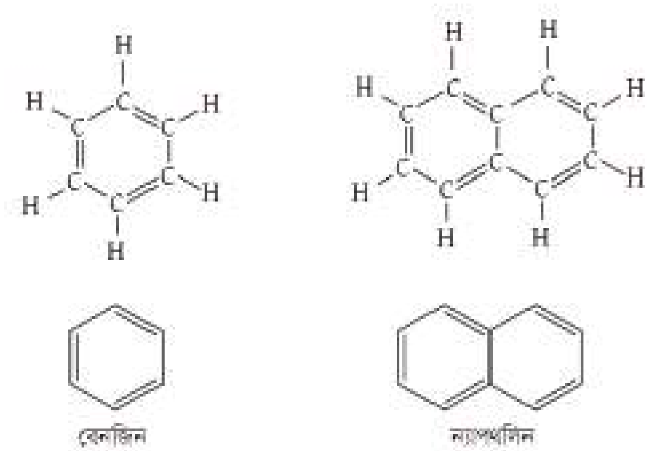

চিত্র ১১.০২: অ্যারোমেটিক যৌগ বেনজিন (C_6H_6),এবং ন্যাপথলিন ($C_{10}H_8$)

আমরা এই অধ্যায়ে আমাদের আলোচনা মূলত অ্যালিফেটিক হাইড্রোকার্বনের মাঝে সীমাবদ্ধ রাখব।

সমগোত্রীয় শ্রেণি (Homologous Series): যে সকল যৌগের কার্যকরীমূলক একই হওয়ায় তাদের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মের গভীর মিল থাকে তারা একই শ্রেণিভুক্ত।এদেরকে সমগোত্রীয় শ্রেণি বলে। একই সমগোত্রীয় শ্রেণির সকল সদস্যকে একটি সাধারণ সংকেত দিয়ে প্রকাশ করা যায়। যেমন– অ্যালকেন সমগোত্রীয় শ্রেণির সকল যৌগকে C_nH_{2n+2} সংকেত দিয়ে প্রকাশ করা যেতে পারে। নিচে বিভিন্ন সমগোত্রীয় শ্রেণির উদাহরণ দেওয়া হলো:

টেবিল ১১.০১: সমগোত্রীয় শ্রেণি

সমগোত্রীয় শ্রেণি	সাধারণ সংকেত	প্রথম কয়েকটি সদস্যের নাম ও সংকেত
অ্যালকেন	C_nH_{2n+2}	মিথেন (CH_4), ইথেন (C_2H_6), প্রোপেন (C_3H_8), বিউটেন (C_4H_{10})
অ্যালকিন	C_nH_{2n}	ইথিন (C_2H_4), প্রোপিন (C_3H_6)
অ্যালকাইন	C_nH_{2n-2}	ইথাইন (C_2H_2), প্রোপাইন (C_3H_4)
অ্যালকোহল	$C_nH_{2n+1}OH$	মিথানল ($CH_3–OH$), ইথানল (C_2H_5OH)
অ্যালডিহাইড	C_nH_{2n+1} CHO	ইথান্যাল ($CH_3–CHO$), প্রোপান্যাল (C_2H_5CHO)
কার্বক্সিলিক এসিড	C_nH_{2n+1} COOH	ইথানয়িক এসিড (CH_3COOH), প্রোপানয়িক এসিড (C_2H_5COOH)

১১.৩ সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন: অ্যালকেন (Saturated Hydrocarbons: Alkanes)

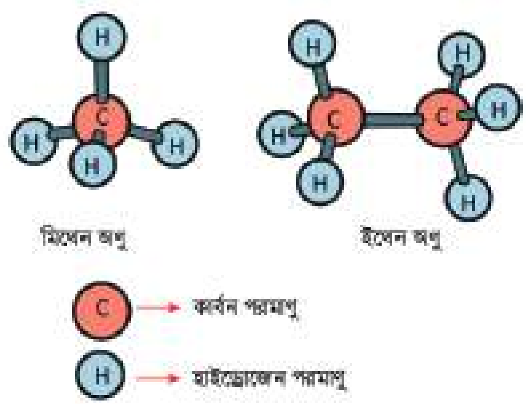

চিত্র ১১.০৩: মিথেন এবং ইথেন

যে সকল হাইড্রোকার্বনের কার্বন শিকলে কার্বন-কার্বন একক বন্ধন বিদ্যমান থাকে তাকে অ্যালকেন বলে। অ্যালকেনের সাধারণ সংকেত C_nH_{2n+2} (n = 1, 2, 3, 4, ...)। এ শ্রেণির প্রথম সদস্যের নাম মিথেন। প্রথম সদস্য বলে সাধারণ সংকেতে n = 1, তাই এর সংকেত CH_4। দ্বিতীয় সদস্য (n = 2) এর নাম ইথেন। ইথেনের সংকেত C_2H_6। অ্যালকেনের কার্বন-কার্বন ও কার্বন-হাইড্রোজেন বন্ধন ভাঙা অনেক কঠিন। তাই অ্যালকেন রাসায়নিকভাবে অনেকটা নিষ্ক্রিয়। এজন্য এদেরকে প্যারাফিন বলে, প্যারাফিন অর্থ স্বল্প আসক্তি। সাধারণত উচ্চ তাপমাত্রা, উচ্চ চাপ কিংবা শক্তিশালী প্রভাবকের উপস্থিতিতেই অ্যালকেন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে।

অ্যালকেনের নামকরণ

IUPAC পদ্ধতিতে অ্যালকেনের নামকরণের নিয়ম এরকম:

(i) সরল শিকলবিশিষ্ট অ্যালকেনে এক কার্বনবিশিষ্ট অ্যালকেন (CH_4) কে মিথেন, দুই কার্বন বিশিষ্ট অ্যালকেন ($CH_3–CH_3$) কে ইথেন, তিন কার্বনবিশিষ্ট অ্যালকেন ($CH_3–CH_2–CH_3$) কে প্রোপেন এবং চার কার্বনবিশিষ্ট অ্যালকেন ($CH_3–CH_2–CH_2–CH_3$) কে বিউটেন নাম দেওয়া হয়েছে।

(ii) অ্যালকেনের ক্ষেত্রে কার্বন সংখ্যার গ্রিক সংখ্যাসূচক শব্দের শেষে এন (ane) যোগ করে নামকরণ করা হয়।

অ্যালকাইল মূলক (Alkyl Group)

অ্যালকেন থেকে একটি হাইড্রোজেন পরমাণু অপসারণ করলে যে একযোজী মূলকের সৃষ্টি হয় তাকে অ্যালকাইল মূলক বলে। যেহেতু অ্যালকেনের সাধারণ সংকেত C_nH_{2n+2}, তাই অ্যালকাইল মূলক R ব্যবহার করে লিখতে চাইলে আমরা C_nH_{2n+2} এর পরিবর্তে R-H লিখতে পারি। যেখানে অ্যালকাইল মূলক R = C_nH_{2n+1}। যে অ্যালকেন থেকে হাইড্রোজেন পরমাণুকে অপসারণ করে অ্যালকাইল মূলক তৈরি হয় সেই অ্যালকেন এর নামের শেষ অংশের এন (ane) বাদ দিয়ে আইল (yl) যোগ করে অ্যালকাইল মূলকের নামকরণ করা হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, মিথেন (CH_4) থেকে মিথাইল (CH_3-), ইথেন (C_2H_6) থেকে ইথাইল (CH_3-CH_2-), প্রোপেন থেকে প্রোপাইল (CH_3-CH_2-CH_2-),

বিউটেন থেকে বিউটাইল (CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-), পেন্টেন থেকে পেন্টাইল (CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-) ইত্যাদি।

টেবিল ১১.০২: অ্যালকেনের কার্বন সংখ্যা, নাম এবং সংকেত

অ্যালকেনের কার্বন সংখ্যা	অ্যালকেনের নাম	অ্যালকেনের সংকেত
1	মিথেন (Methane)	CH_4
2	ইথেন (Ethane)	CH_3-CH_3
3	প্রোপেন (Propane)	CH_3-CH_2-CH_3
4	বিউটেন (Butane)	CH_3-CH_2-CH_2-CH_3
5	পেন্টেন (Pentane)	CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3
6	হেক্সেন (Hexane)	CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3
7	হেপ্টেন (Heptane)	CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3
8	অক্টেন (Octane)	CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2 -CH_3
9	ননেন (Nonane)	CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2 -CH_2-CH_2-CH_3
10	ডেকেন (Decane)	CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3

অ্যালকেনের প্রস্তুতি

কার্বন ডাই-অক্সাইড থেকে: নিকেল প্রভাবকের উপস্থিতিতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের সাথে হাইড্রোজেনকে 250°C তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে মিথেন এবং পানি উৎপন্ন হয়।

$$CO_2 + 4H_2 \xrightarrow[250^\circ C]{Ni} CH_4 + 2H_2O$$

কার্বন ডাই-অক্সাইড   হাইড্রোজেন   মিথেন   পানি

অ্যালকিন ও অ্যালকাইন থেকে: নিকেল প্রভাবক এর উপস্থিতিতে পৃথকভাবে ইথিন এবং ইথাইনের সাথে হাইড্রোজেনকে 180°C-200°C তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে ইথেন উৎপন্ন হয়।

$$CH_2{=}CH_2 + H_2 \xrightarrow[180^\circ\ C\text{-}200^\circ\ C]{Ni} CH_3\text{-}CH_3$$

ইথিন   হাইড্রোজেন   ইথেন

$$CH{\equiv}CH + 2H_2 \xrightarrow[180^\circ\ C\text{-}200^\circ\ C]{Ni} CH_3\text{-}CH_3$$

ইথাইন   হাইড্রোজেন   ইথেন

ডিকার্বক্সিলেশন বিক্রিয়া থেকে : ক্যালসিয়াম অক্সাইডের উপস্থিতিতে সোডিয়াম ইথানয়েটকে সোডালাইম (NaOH + CaO) এর সাথে উত্তপ্ত করলে মিথেন এবং সোডিয়াম কার্বনেট উৎপন্ন হয়। এই বিক্রিয়াকে ডিকার্বক্সিলেশন বিক্রিয়া বলে।

$$CH_3COONa + NaOH \xrightarrow[\Delta]{CaO} CH_4 + Na_2CO_3$$

সোডিয়াম ইথানয়েট   সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড   মিথেন   সোডিয়াম কার্বনেট

অ্যালকেনের ধর্ম

ভৌত ধর্ম: সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন বা অ্যালকেনের গলনাঙ্ক, স্ফুটনাঙ্ক এবং ভৌত অবস্থা অ্যালকেনের কার্বন সংখ্যার উপর নির্ভর করে। কার্বন সংখ্যার পরিবর্তন হলে ভৌত অবস্থার পরিবর্তন হয়। 1 থেকে 4 কার্বন সংখ্যার সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনের স্ফুটনাঙ্ক কক্ষ তাপমাত্রার নিচে, তাই এগুলো গ্যাসীয় অবস্থায় থাকে। 5 থেকে 15 কার্বন সংখ্যার সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনের স্ফুটনাঙ্ক কক্ষ তাপমাত্রার উপরে বলে এগুলো তরল অবস্থায় থাকে। 5 কার্বনবিশিষ্ট সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন পেন্টেনের স্ফুটনাঙ্ক 36.1°C। সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনের কার্বন সংখ্যা 16 থেকে বেশি হলে এগুলো কঠিন প্রকৃতির হয়।

রাসায়নিক ধর্ম

আগেই বলা হয়েছে অ্যালকেনসমূহ রাসায়নিকভাবে অনেকটা নিষ্ক্রিয়। তাই সাধারণ অবস্থায় এসিড, ক্ষারক, জারক বা বিজারকের সাথে বিক্রিয়া করে না। তারপরও এরা কিছু রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে।

ক্লোরিনের সাথে বিক্রিয়া: অতিবেগুনি (UV) আলোর উপস্থিতিতে মিথেনের সাথে ক্লোরিন মিশ্রিত করলে টেট্রাক্লোরো মিথেন উৎপন্ন হয়। এই বিক্রিয়া চার ধাপে সম্পন্ন হয়।

CH_4	+	Cl_2	$\xrightarrow{UV}$	CH_3Cl	+	HCl
মিথেন		ক্লোরিন		ক্লোরো মিথেন		হাইড্রোজেন ক্লোরাইড
CH_3Cl	+	Cl_2	$\xrightarrow{UV}$	CH_2Cl_2	+	HCl
ক্লোরো মিথেন		ক্লোরিন		ডাইক্লোরো মিথেন		হাইড্রোজেন ক্লোরাইড
CH_2Cl_2	+	Cl_2	$\xrightarrow{UV}$	$CHCl_3$	+	HCl
ডাইক্লোরো মিথেন		ক্লোরিন		ট্রাইক্লোরো মিথেন		হাইড্রোজেন ক্লোরাইড
$CHCl_3$	+	Cl_2	$\xrightarrow{UV}$	CCl_4	+	HCl
ট্রাইক্লোরো মিথেন		ক্লোরিন		টেট্রাক্লোরো মিথেন		হাইড্রোজেন ক্লোরাইড

অক্সিজেনের সাথে দহন বিক্রিয়া: মিথেন বায়ুর অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে কার্বন ডাই-অক্সাইড জলীয় বাষ্প এবং তাপশক্তি উৎপন্ন হয়। এই তাপশক্তি রান্নাবান্নার কাজে ব্যবহৃত হয়।

CH_4	+	$2O_2$	$\longrightarrow$	CO_2	+	$2H_2O$	+	তাপশক্তি
মিথেন		অক্সিজেন		কার্বন ডাই-অক্সাইড		পানি		

১১.৪ অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন: অ্যালকিন ও অ্যালকাইন (Unsaturated Hydrocarbons: Alkenes and Alkynes)

১১.৪.১ অ্যালকিন (Alkenes)

যে জৈব যৌগের কার্বন শিকলে অন্তত একটি কার্বন-কার্বন দ্বিবন্ধন থাকে তাকে অ্যালকিন বলে। অ্যালকিনের সাধারণ সংকেত C_nH_{2n}। অ্যালকিনের নিম্নতর সদস্যগুলো (ইথিন, প্রোপিন ইত্যাদি)

হ্যালোজেনের (Cl_2, Br_2) এর সঙ্গে বিক্রিয়ায় তৈলাক্ত পদার্থ উৎপন্ন করে বলে অ্যালকিনকে অনেক সময় অলিফিন (Olefin, Greek: Olefiant = oil forming) বলে।

অ্যালকিনের নামকরণ

IUPAC পদ্ধতিতে অ্যালকেনের নামের শেষের এন (ane) বাদ দিয়ে ইন (ene) যোগ করে অ্যালকিনের নামকরণ করতে হয়।

অ্যালকেন (Alkane)	অ্যালকিন (Alkene)	অ্যালকিনের সংকেত
ইথেন (Ethane)	ইথিন (Ethene)	$CH_2=CH_2$
প্রোপেন (Propane)	প্রোপিন (Propene)	$CH_3-CH=CH_2$

অ্যালকিনের প্রস্তুতি

ইথাইল ক্লোরাইড থেকে: ইথাইল ক্লোরাইড এর সাথে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের অ্যালকোহলীয় দ্রবণকে উত্তপ্ত করলে ইথিন, সোডিয়াম ক্লোরাইড এবং পানি উৎপন্ন হয়।

$$\underset{\text{ইথাইল ক্লোরাইড}}{CH_3-CH_2Cl} + \underset{\text{সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড}}{NaOH} \longrightarrow \underset{\text{ইথিন}}{CH_2=CH_2} + \underset{\text{সোডিয়াম ক্লোরাইড}}{NaCl} + \underset{\text{পানি}}{H_2O}$$

ইথানল থেকে: ইথানলের সাথে অতিরিক্ত গাঢ় সালফিউরিক এসিডকে উত্তপ্ত করলে ইথিন এবং পানি উৎপন্ন হয়।

$$\underset{\text{ইথানল}}{CH_3-CH_2-OH} \xrightarrow{H_2SO_4} \underset{\text{ইথিন}}{CH_2=CH_2} + \underset{\text{পানি}}{H_2O}$$

অ্যালকিনের রাসায়নিক ধর্ম

অ্যালকিনে কার্বন-কার্বন দ্বিবন্ধন থাকে। এই দ্বিন্ধন থাকার কারণে এরা রাসায়নিকভাবে খুবই সক্রিয়। কারণ দ্বিবন্ধনের একটি বন্ধন শক্তিশালী হলেও অন্যটি তুলনামূলকভাবে দুর্বল। সাধারণত বিক্রিয়া করার সময় অ্যালকিনের দুর্বল বন্ধন ভেঙে যায় এবং সংযোজন বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে।

হাইড্রোজেন সংযোজন: নিকেল প্রভাবকের উপস্থিতিতে ইথিনকে হাইড্রোজেনের সাথে $180\text{-}200^0C$ তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে ইথেন উৎপন্ন হয়।

$$\underset{\text{ইথিন}}{CH_2 = CH_2} + \underset{\text{হাইড্রোজেন}}{H_2} \xrightarrow[180\text{-}200^0C]{Ni} \underset{\text{ইথেন}}{CH_3-CH_3}$$

পানি সংযোজন: ফসফরিক এসিড প্রভাবকের উপস্থিতিতে ইথিন পানির বাষ্পের সাথে উচ্চ তাপ এবং উচ্চ চাপে বিক্রিয়া করে ইথানল উৎপন্ন করে।

$$CH_2 = CH_2 + H_2O \xrightarrow[\text{ফসফরিক এসিড } (H_3PO_4)]{\text{উচ্চ তাপ এবং উচ্চ চাপ}} CH_3\text{-}CH_2OH$$

ইথিন পানি ইথানল

অ্যালকোহলকে পরিবেশবান্ধব জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয় এবং পেট্রোলিয়াম শিল্পে দ্রাবক হিসেবে ব্যবহার করা হয় বলে এই বিক্রিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ব্রোমিন সংযোজন: ইথিনের মধ্যে লাল বর্ণের ব্রোমিন দ্রবণ যোগ করলে ইথিন লাল বর্ণের ব্রোমিন দ্রবণের সাথে বিক্রিয়া করে ডাইব্রোমো ইথেন উৎপন্ন করে। এই বিক্রিয়ায় ব্রোমিনের লাল বর্ণ অপসারিত হয়। সকল অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন এই বিক্রিয়া প্রদর্শন করে। ইথিন যে অসম্পৃক্ত যৌগ তা এই বিক্রিয়া দ্বারা প্রমাণিত হয়।

$$CH_2 = CH_2 + Br_2 \longrightarrow CH_2Br\text{-}CH_2Br$$

ইথিন ব্রোমিন ডাইব্রোমো ইথেন

পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট (জায়মান অক্সিজেন) দ্বারা জারণ: ইথিনের মধ্যে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট এর গোলাপি বর্ণের দ্রবণ এবং পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড যোগ করলে ইথিলিন গ্লাইকল উৎপন্ন করে। এই বিক্রিয়ায় পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট এর গোলাপি বর্ণ অপসারিত হয়। সকল অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন এই বিক্রিয়া প্রদর্শন করে। ইথিন যে অসম্পৃক্ত যৌগ তা এই বিক্রিয়া দ্বারা প্রমাণিত হয়। (প্রথমে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট এবং পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড বিক্রিয়া করে যে জায়মান অক্সিজেন তৈরি করে, সেই জায়মান অক্সিজেন এবং দ্রবণের পানি ইথিনের সাথে বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে ইথিলিন গ্লাইকল উৎপন্ন করে।)

$$CH_2 = CH_2 + H_2O + [O] \xrightarrow[KOH]{KMnO_4} CH_2OH\text{-}CH_2OH$$

ইথিন পানি ইথিলিন গ্লাইকল

ইথিনের পলিমারকরণ বিক্রিয়া: সামান্য পরিমাণ অক্সিজেনের উপস্থিতিতে 1000 atm চাপে ও 200°C তাপমাত্রায় ইথিনকে উত্তপ্ত করলে পলিথিন উৎপন্ন হয়। এই বিক্রিয়াকে পলিমারকরণ বিক্রিয়া বলে। এই বিক্রিয়ায় ইথিনকে মনোমার বলা হয়।

$$nCH_2 = CH_2 \xrightarrow[\text{200°C তাপমাত্রা, সামান্য অক্সিজেন}]{\text{1000 atm}} (\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-})_n$$

ইথিন পলিথিন

১১.৪.২ অ্যালকাইন (Alkynes)

যে জৈব যৌগে কার্বন শিকলে অন্তত একটি কার্বন-কার্বন ত্রিবন্ধন ($-C\equiv C-$) থাকে তাকে অ্যালকাইন বলে। তাই অ্যালকাইনের সাধারণ সংকেত C_nH_{2n-2}। অ্যালকাইন শ্রেণির ক্ষুদ্রতম সরল সদস্য ইথাইন ($CH\equiv CH$) বা এসিটিলিন (acetylene)।

অ্যালকাইনের নামকরণ

অ্যালকেনের নামের শেষের এন (ane) বাদ দিয়ে আইন (yne) যোগ করে অ্যালকাইনের নামকরণ করা হয়। যেমন: $CH\equiv CH$ এর নাম ইথাইন, $CH_3-C\equiv CH$ এর নাম প্রোপাইন, $CH_3-C\equiv C-CH_3$ এর নাম বিউটাইন-2।

অ্যালকাইনের প্রস্তুতি

ক্যালসিয়াম কার্বাইড থেকে: ক্যালসিয়াম কার্বাইডের মধ্যে পানি যোগ করলে ইথাইন এবং ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড উৎপন্ন হয়।

$$CaC_2 + 2H_2O \longrightarrow CH\equiv CH + Ca(OH)_2$$

ক্যালসিয়াম কার্বাইড + পানি → ইথাইন + ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড

অ্যালকাইনের রাসায়নিক ধর্ম

অ্যালকাইনে কার্বন-কার্বন ত্রিবন্ধন থাকে। এখানে একটি বন্ধন শক্তিশালী এবং অন্য দুইটি দুর্বল বন্ধন থাকে। অ্যালকাইনে এই দুর্বল বন্ধনগুলো ভেঙে সংযোজন বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে।

হাইড্রোজেন সংযোজন: তোমরা এর মাঝে জেনে গেছ, নিকেল প্রভাবকের উপস্থিতিতে ইথাইনকে হাইড্রোজেনের সাথে $180\text{-}200^0C$ তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে ইথেন উৎপন্ন হয়।

$$CH\equiv CH + 2H_2 \xrightarrow[180\text{-}200^0C]{Ni} CH_3\text{-}CH_3$$

ইথাইন + হাইড্রোজেন → ইথেন

ব্রোমিন সংযোজন: ইথাইনের মধ্যে লাল বর্ণের ব্রোমিন দ্রবণ যোগ করলে ইথাইন লাল বর্ণের ব্রোমিন দ্রবণের সাথে বিক্রিয়া করে টেট্রা ব্রোমো ইথেন উৎপন্ন করে। এই বিক্রিয়ায় ব্রোমিনের লাল বর্ণ অপসারিত হয়। ইথাইন যে অসম্পৃক্ত যৌগ তা এই বিক্রিয়া দ্বারা প্রমাণিত হয়।

$$CH\equiv CH + 2Br_2 \longrightarrow CHBr_2\text{-}CHBr_2$$

ইথাইন + ব্রোমিন → টেট্রাব্রোমো ইথেন

পানি সংযোজন: ৪০°C তাপমাত্রায় ইথাইন এর মধ্যে 20% সালফিউরিক এসিড এবং 2% মারকিউরিক সালফেট দ্রবণ যোগ করলে ইথান্যাল উৎপন্ন হয় ।

$CH\equiv CH$	$+ H_2O$	$\xrightarrow[80^0C]{20\%\ H_2SO_4,\ 2\%\ HgSO_4}$	CH_3CHO
ইথাইন	পানি		ইথান্যাল বা এসিটালডিহাইড

১১.৫ অ্যালকোহল, অ্যালডিহাইড ও ফ্যাটি এসিড (Alcohols, Aldehydes and Fatty Acids)

১১.৫.১ অ্যালকোহল (Alcohol)

যে জৈব যৌগে হাইড্রক্সিল মূলক (–OH) বিদ্যমান থাকে তাকে অ্যালকোহল বলে। তবে কিছু কিছু যৌগে হাইড্রক্সিল মূলক (–OH) বিদ্যমান থাকলেও তাদেরকে অ্যালকোহল বলা হয় না (যেমন ফেনল C_6H_5–OH)। অ্যালকোহলের সাধারণ সংকেত $C_nH_{2n+1}OH$। এ শ্রেণির প্রথম সদস্য হচ্ছে মিথানল (CH_3-OH), দ্বিতীয় সদস্য ইথানল (CH_3-CH_2-OH)। অ্যালকোহলকে R-OH দিয়ে প্রকাশ করা যায় যেখানে R হলো অ্যালকাইল মূলক। এ শ্রেণির প্রথম দিকের সদস্যগুলো বর্ণহীন তরল পদার্থ এবং পানিতে যে কোনো অনুপাতে মিশ্রিত হয়।

নামকরণ: অ্যালকেনের নামের শেষের ‘e’ বাদ দিয়ে অল (ol) যোগ করে অ্যালকোহলের নামকরণ করা হয়। যেমন: ইথানল (CH_3CH_2OH)

অ্যালকোহলের প্রস্তুতি

ইথাইল ব্রোমাইড থেকে: ব্রোমো ইথেন এর মধ্যে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এর জলীয় দ্রবণ যোগ করে উত্তপ্ত করলে ইথানল এবং সোডিয়াম ব্রোমাইড উৎপন্ন হয়।

CH_3-CH_2Br	+	NaOH	$\xrightarrow{\Delta}$	CH_3-CH_2OH	+	NaBr
ব্রোমো ইথেন		সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড		ইথানল		সোডিয়াম ব্রোমাইড

১১.৫.২ অ্যালডিহাইড (Aldehyde)

যে জৈব যৌগে অ্যালডিহাইড গ্রুপ (-CHO) বিদ্যমান থাকে তাকে অ্যালডিহাইড বলে।

নামকরণ: অ্যালকেনের নামের শেষের ‘e’ বাদ দিয়ে অ্যাল (al) যোগ করে অ্যালডিহাইড এর নামকরণ করা হয়। যেমন: প্রোপান্যাল (CH_3CH_2CHO)। অ্যালডিহাইড শ্রেণির প্রথম সদস্যের নাম মিথান্যাল (H-CHO)।

অ্যালডিহাইডের প্রস্তুতি

পানি সংযোজন: 80°C তাপমাত্রায় ইথাইন এর মধ্যে 20% সালফিউরিক এসিড এবং 2% মারকিউরিক সালফেট দ্রবণ যোগ করলে ইথান্যাল উৎপন্ন হয়।

$$\underset{\text{ইথাইন}}{CH\equiv CH} + \underset{\text{পানি}}{H_2O} \xrightarrow[80^0C]{20\%H_2SO_4,\ 2\%HgSO_4} \underset{\text{ইথান্যাল}}{CH_3CHO}$$

চিত্র ১১.০৪: ফরমালিনে রক্ষিত বিভিন্ন মৃত প্রাণীদেহ

ফরমালিন (Formalin): ফরমালডিহাইড (মিথান্যাল) এর 40% জলীয় দ্রবণকে ফরমালিন বলে। ফরমালিনে 40 ভাগ মিথান্যাল আর 60 ভাগ পানি থাকে। গবেষণাগারে ফরমালিন এর ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। বিভিন্ন মৃত প্রাণীদেহ সংরক্ষণ করার জন্য ফরমালিন ব্যবহার করা হয়।

১১.৫.৩ জৈব এসিড বা ফ্যাটি এসিড (Fatty Acid)

যে জৈব যৌগে কার্বক্সিল গ্রুপ (-COOH) বিদ্যমান থাকে তাকে জৈব এসিড বা ফ্যাটি এসিড বলে। জৈব এসিড এর সাধারণ সংকেত $C_nH_{2n+1}COOH$। এটাকে সংক্ষেপে R-COOH দিয়ে প্রকাশ করা হয়। জৈব এসিড এর সাধারণ সংকেত $C_nH_{2n+1}COOH$।

নামকরণ: মূল অ্যালকেনের ইংরেজি নামের শেষের ‘e’ বাদ দিয়ে অয়িক এসিড (oic acid) যুক্ত করে জৈব এসিডের নামকরণ করা হয়। যেমন: ইথানয়িক এসিড।

ফ্যাটি এসিডের প্রস্তুতি

ইথান্যাল থেকে: ইথান্যালের মধ্যে লঘু সালফিউরিক এসিড ও পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট যোগ করলে ইথানয়িক এসিড উৎপন্ন হয়। (প্রথমে পটাশিয়াম ডাইক্রমেট এবং সালফিউরিক এসিড বিক্রিয়া করে যে জায়মান অক্সিজেন তৈরি করে সেই জায়মান অক্সিজেন এবং ইথান্যাল বিক্রিয়া করে ইথানয়িক এসিড উৎপন্ন করে।)

$$CH_3\text{-}CHO + [O] \xrightarrow{K_2Cr_2O_7 + H_2SO_4} CH_3\text{-}COOH$$

ইথান্যাল — জায়মান অক্সিজেন — ইথানয়িক এসিড বা এসিটিক এসিড

ফ্যাটি এসিডের রাসায়নিক ধর্ম

অম্লীয় ধর্ম: সকল ফ্যাটি এসিড হলো দুর্বল এসিড। ফ্যাটি এসিডসমূহ জলীয় দ্রবণে সামান্য পরিমাণে আয়নিত হয়। ফ্যাটি এসিডের জলীয় দ্রবণ নীল লিটমাসকে লাল করে। ফ্যাটি এসিড ক্ষারের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ ও পানি উৎপন্ন করে। যেমন, ইথানয়িক এসিড সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের জলীয় দ্রবণের সাথে বিক্রিয়া করে সোডিয়াম ইথানয়েট লবণ ও পানি উৎপন্ন করে।

$$CH_3COOH + NaOH \longrightarrow CH_3COONa + H_2O$$

ইথানয়িক এসিড — সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড — সোডিয়াম ইথানয়েট — পানি

ভিনেগার: ইথানয়িক এসিডের 4% থেকে 10% জলীয় দ্রবণকে ভিনেগার (Vinegar) বলে। ভিনেগার খাবার তৈরিতে ও খাদ্য সংরক্ষক হিসেবে কাজ করে। এ দ্রবণ মৃদু অম্লীয় বলে খাদ্যে ব্যবহার করলে খাদ্যে ব্যাকটেরিয়া বা ইস্ট জন্মাতে পারে না। ফলে খাদ্য পচে না।

১১.৫.৪ হাইড্রোকার্বন থেকে অ্যালকোহল, অ্যালডিহাইড ও জৈব এসিড প্রস্তুতি

তোমরা বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় অ্যালকোহল, অ্যালডিহাইড ও জৈব এসিড প্রস্তুতির কথা জেনেছ। পেট্রোলিয়ামের প্রধান উপাদান হচ্ছে হাইড্রোকার্বন (অ্যালকেন, অ্যালকিন ও অ্যালকাইন) এবং এই হাইড্রোকার্বন থেকেও অ্যালকোহল, অ্যালডিহাইড ও জৈব এসিড প্রস্তুত করা যায়।

(i) সূর্যালোকের উপস্থিতিতে সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন বা অ্যালকেন হ্যালোজেনের সাথে বিক্রিয়া করে অ্যালকাইল হ্যালাইড উৎপন্ন করে। তোমরা ইতোমধ্যে জেনেছ, সূর্যালোকের অতিবেগুনি রশ্মির উপস্থিতিতে কীভাবে মিথেনের সাথে ক্লোরিন বিক্রিয়া করছে। হাইড্রোজেন পার-অক্সাইডের উপস্থিতিতে অ্যালকিন হাইড্রোজেন ব্রোমাইডের সাথে বিক্রিয়া করে অ্যালকাইল ব্রোমাইড উৎপন্ন করে। অ্যালকাইল

হ্যালাইড সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের জলীয় দ্রবণের সাথে বিক্রিয়ায় অ্যালকোহলে পরিণত হয়। উৎপন্ন অ্যালকোহলকে শক্তিশালী জারক ($K_2Cr_2O_7$ ও H_2SO_4) দ্বারা জারিত করলে প্রথমে অ্যালডিহাইড/কিটোন এবং পরবর্তীকালে জৈব এসিডে পরিণত হয়।

(ii) ফসফরিক এসিডের উপস্থিতিতে অ্যালকিন 300°C তাপমাত্রায় এবং 60 atm চাপে জলীয় বাষ্পের (H_2O) সাথে বিক্রিয়া করে অ্যালকোহল উৎপন্ন করে। 2% মারকিউরিক সালফেট ($HgSO_4$) এবং 20% সালফিউরিক এসিডের (H_2SO_4) উপস্থিতিতে অ্যালকাইন (ইথাইন) পানির সাথে বিক্রিয়া করে অ্যালডিহাইড উৎপন্ন করে। তবে $HgSO_4$ বিষাক্ত হওয়ায় শিল্পক্ষেত্রে এর ব্যবহার নিরুৎসাহিত করা হয়। পেট্রোলিয়াম থেকে প্রাপ্ত অ্যালকেনকে উচ্চ তাপ ও চাপে বায়ুর অক্সিজেন দ্বারা জারিত করলে জৈব এসিড উৎপন্ন হয়।

১১.৬ অ্যালকোহল, অ্যালডিহাইড ও জৈব এসিডের ব্যবহার (The Uses of Alcohol, Aldehydes and Organic Acids)

অ্যালকোহল: মিথানল বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ। মিথানল মূলত অন্য রাসায়নিক পদার্থ প্রস্তুত করতে ব্যবহৃত হয়। রাসায়নিক শিল্পে ইথানয়িক এসিড, বিভিন্ন জৈব এসিডের এস্টার প্রস্তুত করা হয়। ইথানলকে প্রধানত পারফিউম, কসমেটিকস ও ওষুধ শিল্পে দ্রাবক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ফার্মাসিউটিক্যাল গ্রেডের ইথানলকে ওষুধ শিল্পে এবং রেকটিফাইড স্পিরিটকে হোমিও ওষুধে ব্যবহার করা হয়। ইথানলের 95.6% জলীয় দ্রবণকে রেকটিফাইড স্পিরিট (rectified spirit) বলে। পারফিউম শিল্পেও ইথানলের ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। পারফিউমে ইথানল ব্যবহারের পূর্বে তাকে গন্ধমুক্ত করা হয়। ওষুধ ও খাদ্য শিল্প ব্যতীত অন্য শিল্পে রেকটিফাইড স্পিরিট সামান্য মিথানল যোগে বিষাক্ত করে ব্যবহার করা হয়। একে মেথিলেটেড স্পিরিট (methylated spirit) বলে। কাঠ এবং ধাতুর তৈরি আসবাবপত্র বার্নিশ করার জন্য মেথিলেটেড স্পিরিট ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে ব্রাজিলে জীবাশ্ম জ্বালানির পরিবর্তে ইথানলকে মোটর ইঞ্জিনের জ্বালানিরূপে ব্যবহার করা হচ্ছে।

স্টার্চ (চাল, গম, আলু ও ভুট্টা) থেকে গাঁজন (Fermentation) প্রক্রিয়ায় অ্যালকোহল প্রস্তুত করা হয়। এছাড়া চিনি শিল্পের উপজাত উৎপাদ (by-product) চিটাগুড় থেকে একই প্রক্রিয়ায় অ্যালকোহল (ইথানল) পাওয়া যায়। বাংলাদেশের দর্শনায় কেরু এন্ড কেরু কোম্পানিতে ইথানল প্রস্তুত করে দেশের চাহিদা পূরণ করা হয়। অ্যালকোহলকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করলে একদিকে জীবাশ্ম জ্বালানির উপর চাপ কমে, অপরদিকে পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখা যায়।

অ্যালডিহাইড: অ্যালডিহাইড এর পলিমারকরণ বিক্রিয়ায় বিভিন্ন প্লাস্টিক দ্রব্য তৈরি করা হয়। ফরমালডিহাইড (মিথান্যাল) এর জলীয় দ্রবণকে অতি নিম্ন চাপে উত্তপ্ত করলে ডেরলিন পলিমার

উৎপন্ন হয়। ডেরলিন পলিমার দিয়ে চেয়ার, ডাইনিং টেবিল, বালতি ইত্যাদি প্লাস্টিক দ্রব্য তৈরি করা হয়। ফরমালডিহাইড ও ইউরিয়া থেকে ঘনীভবন পলিমারকরণ বিক্রিয়ায় ইউরিয়া-ফরমালডিহাইড রেজিন উৎপন্ন হয় যা গৃহের প্লেট, গ্লাস, মগ ইত্যাদি তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়।

জৈব এসিড: জৈব এসিডসমূহ অজৈব এসিডের তুলনায় দুর্বল। জৈব এসিড মানুষের খাদ্যোপযোগী উপাদান। আমরা লেবুর রস (সাইট্রিক এসিড), তেঁতুল (টারটারিক এসিড), দধি (ল্যাকটিক এসিড) ইত্যাদি জৈব এসিডকে খাবার হিসেবে গ্রহণ করি। জৈব এসিডের ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করার ক্ষমতা থাকায় একে খাদ্য সংরক্ষক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ইথানয়িক এসিডের 4% থেকে 10% জলীয় দ্রবণকে ভিনেগার বলা হয়। ভিনেগার সস্ ও আচার সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হয়।

১১.৭ পলিমার (Polymer)

যে বিক্রিয়ায় কোনো পদার্থের অনেকগুলো ক্ষুদ্র অণু পরস্পর যুক্ত হয়ে বৃহৎ অণু গঠন করে সেই বিক্রিয়াকে পলিমারকরণ বিক্রিয়া (Polymerization Reaction) বলে। পলিমারকরণ বিক্রিয়ায় যে ছোট অণুগুলো অংশগ্রহণ করে তাদের প্রত্যেকটিকে এক একটি মনোমার (monomer) বলে এবং বিক্রিয়ার ফলে যে বৃহৎ অণু গঠিত হয় তাকে পলিমার অণু বলে। দুইটি মনোমার একসাথে যুক্ত হলে তাকে বলে ডাইমার (dimer), তিনটি মনোমার একসাথে যুক্ত হয়ে তৈরি হয় ট্রাইমার (trimer)। এভাবে অনেকগুলো মনোমার এক সাথে যুক্ত হয়ে পলিমারের সৃষ্টি হয়। আমাদের খাদ্যের একটি প্রধান উপাদান প্রোটিন। এই প্রোটিনও অ্যামাইনো এসিডের একটি পলিমার।

পলিমারকে বিভিন্নভাবে শ্রেণিবিভাগ করা যেতে পারে। তবে গঠন প্রকৃতি অনুযায়ী পলিমার দুই প্রকার, যথা– সংযোজন বা যুত পলিমার এবং ঘনীভবন পলিমার।

১১.৭.১ সংযোজন বা যুত পলিমার (Addition Polymer)

যে পলিমারকরণ বিক্রিয়ায় মনোমার অণুগুলো সরাসরি একে অপরের সাথে যুক্ত হয়ে দীর্ঘ শিকলবিশিষ্ট পলিমার গঠন করে তাকে সংযোজন পলিমারকরণ বিক্রিয়া বলা হয়। সংযোজন পলিমারকরণ বিক্রিয়ায় গঠিত পলিমারকে সংযোজন পলিমার বলে।

সংযোজন পলিমারকরণ বিক্রিয়া : সামান্য পরিমাণ অক্সিজেনের উপস্থিতিতে 1000 atm চাপে ও 200°C তাপমাত্রায় ইথিনকে উত্তপ্ত করলে পলিথিন উৎপন্ন হয়। এই বিক্রিয়াকে সংযোজন পলিমারকরণ বিক্রিয়া বলে। এই বিক্রিয়ায় ইথিনকে মনোমার বলা হয়।

$$nCH_2 = CH_2 \xrightarrow[\text{200°C তাপমাত্রা, সামান্য অক্সিজেন}]{\text{1000 atm}} (-CH_2-CH_2-)_n$$

ইথিন — পলিথিন

পলিপ্রোপিন (Polypropene): প্রোপিনকে টাইটানিয়াম ক্লোরাইডের উপস্থিতিতে 140 atm চাপে 120°C তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে পলিপ্রোপিন উৎপন্ন হয়।

$$nCH_2=CH(CH_3) \xrightarrow[\text{120°C, টাইটানিয়াম ক্লোরাইড}]{\text{140 atm}} [-CH_2-CH(CH_3)-]_n$$

প্রোপিন — পলিপ্রোপিন

পলিপ্রোপিন পলিথিনের চেয়ে মজবুত ও হালকা এবং উচ্চ তাপ সহ্য করতে পারে, তাই পলিপ্রোপিন দিয়ে দড়ি, পাইপ, কার্পেট প্রভৃতি তৈরি করা যায়।

পলিভিনাইল ক্লোরাইড বা পিভিসি (PVC): ভিনাইল ক্লোরাইডকে জৈব পার-অক্সাইডের উপস্থিতিতে উচ্চ চাপ এবং উচ্চ তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে পলিভিনাইল ক্লোরাইড বা পিভিসি উৎপন্ন হয়। বিভিন্ন ধরণের পাইপ, তার এমনকি মেডিকেল ডিভাইস তৈরিতে এই পলিমার বহুল ব্যবহৃত।

$$nCH_2 = CHCl \xrightarrow[\text{জৈব পার-অক্সাইড}]{\text{উচ্চ চাপ, উচ্চ তাপমাত্রা}} -(CH_2-CHCl)-_n$$

ভিনাইল ক্লোরাইড — পলি ভিনাইল ক্লোরিইড

১১.৭.২ ঘনীভবন পলিমার (Condensation Polymer)

যে পলিমারকরণ বিক্রিয়ায় মনোমার অণুসমূহ পরস্পরের সাথে যুক্ত হবার সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু যেমন: H_2O, CO_2 ইত্যাদি অপসারণ করে সেই পলিমারকরণ বিক্রিয়াকে ঘনীভবন পলিমারকরণ বিক্রিয়া বলা হয়। ঘনীভবন পলিমারকরণ বিক্রিয়ায় নাইলন 6 : 6 পলিমার তৈরি হয়।

নাইলন 6:6 উৎপাদন: টাইটানিয়াম অক্সাইড এর উপস্থিতিতে হেক্সামিথিলিন ডাই-অ্যামিন এর সাথে অ্যাডিপিক এসিড উত্তপ্ত করলে নাইলন- 6 : 6 উৎপন্ন হয়।

$$nHOOC-(CH_2)_4-COOH + nNH_2-(CH_2)_6-NH_2 \xrightarrow[\Delta]{TiO_2} (-OC-(CH_2)_4-CONH-(CH_2)_6-NH-)_n + 2nH_2O$$

অ্যাডিপিক এসিড — হেক্সামিথিলিন ডাই-অ্যামিন — নাইলন 6 : 6 — পানি

উৎসের উপর ভিত্তি করে পলিমারকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়: প্রাকৃতিক পলিমার এবং কৃত্রিম পলিমার বা প্লাস্টিক।

প্রাকৃতিক পলিমার

প্রাকৃতিকভাবে অনেক পলিমার উৎপন্ন হয়। যেমন- উদ্ভিদের সেলুলোজ ও স্টার্চ দুটোই প্রাকৃতিক পলিমার, যা বহুসংখ্যক গ্লুকোজ অণু থেকে তৈরি হয়।

প্রোটিন অ্যামাইনো এসিডের পলিমার। রাবার গাছের কষ একটি প্রাকৃতিক পলিমার। আমাদের দেশে পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, হবিগঞ্জ, সিলেট ও টাঙ্গাইল জেলায় রাবার চাষ হচ্ছে। প্রাকৃতিক রাবারের চেয়ে বহুগুণ বেশি প্লাস্টিক শিল্পকারখানায় সংশ্লেষণ করা হচ্ছে।

টেবিল ১১.০৩: বিভিন্ন ধরনের পলিমার, তার ধর্ম ও ব্যবহার

পলিমারের নাম	মনোমারের সংকেত	পলিমারের ধর্ম	ব্যবহার
পলিথিন	$CH_2=CH_2$	সহজে কাটা যায় না, টেকসই	প্লাস্টিক ব্যাগ, প্লাস্টিক শিট
পলিপ্রোপিন	$CH_2=CH-CH_3$	সহজে কাটা যায় না, টেকসই	প্লাস্টিক রশি, প্লাস্টিক বোতল
পলিভিনাইল ক্লোরাইড (PVC)	$CH_2=CHCl$	শক্ত, কঠিন এবং পলিথিনের তুলনায় কম নমনীয়	পানির পাইপ, বিদ্যুৎ অপরিবাহী পদার্থ
নাইলন 6:6	$HOOC-(CH_2)_4-COOH$ ও $H_2N-(CH_2)_6-NH_2$	চকচকে, টেকসই, নমনীয়	কৃত্রিম কাপড়, রশি, দাঁতের ব্রাশ

কৃত্রিম পলিমার বা প্লাস্টিক

শক্ত, হালকা, সস্তা এবং যেকোনো পছন্দসই রঙের প্লাস্টিক (plastic) পাওয়া যায়। প্লাস্টিককে গলানো যায় এবং ছাঁচে ঢেলে যেকোনো আকার দেওয়া যায়। প্লাস্টিক শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ Plastikos থেকে। Plastikos অর্থ হলো গলানো সম্ভব। অনেকেই পরিত্যক্ত প্লাস্টিক অংশটি গলিয়ে নানা কিছু তৈরি করেন। এটি করা বিপজ্জনক কারণ, প্লাস্টিক দ্রব্যকে পোড়ালে বা উত্তাপে গলানো হলে অনেক রকম বিষাক্ত গ্যাস উৎপন্ন হয়। খাবার রাখার পাত্র, মোড়ক, বলপেন, চেয়ার, টেবিল, গাড়ির যন্ত্রাংশ, পানির ট্যাংক, গামলা, বালতি, মগ ইত্যাদি সামগ্রী প্রস্তুত করার জন্য ব্যাপকভাবে প্লাস্টিক দ্রব্য ব্যবহার করা হয়।

২০২৬

১১.৭.৩ প্লাস্টিক ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধা

বর্তমান বিশ্বে ব্যাপক হারে প্লাস্টিক জাতীয় কৃত্রিম পলিমার ব্যবহার করা হচ্ছে। এ জাতীয় পদার্থ ব্যবহারের প্রচুর সুবিধা রয়েছে। অপরদিকে, প্লাস্টিক জাতীয় পদার্থ আমাদের পরিবেশের জন্য হুমকিস্বরূপ। বর্তমানে এ জাতীয় পদার্থ আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে গেছে। তাই এগুলোকে বর্জনও করতে পারছি না। সেক্ষেত্রে এগুলোর ব্যবহার সঠিক উপায়ে করতে পারলে আমরা এ সকল অসুবিধা থেকে কিছুটা মুক্তি পেতে পারি।

সুবিধা: প্লাস্টিক জাতীয় পদার্থ থেকে আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস যেমন- থালাবাসন, বিভিন্ন ধরনের পাইপ, বিভিন্ন কন্টেইনার, ব্যাগসহ আরও অনেক কিছু প্রস্তুত করা হয়। এগুলো তৈরিতে আগে সম্পূর্ণরূপে ধাতু, প্রাকৃতিক তন্তু যেমন- তুলা, পাট, রেশম, কাঠ ইত্যাদি ব্যবহার করা হতো। প্লাস্টিক এদের তুলনায় অনেক পাতলা। প্লাস্টিককে ইচ্ছা অনুযায়ী রূপ দিয়ে আমরা বিভিন্ন আকারের জিনিস তৈরি করতে পারি। তাতে বিভিন্ন ধরনের রং মিশিয়ে আকর্ষণীয় করে তুলতে পারি।

অসুবিধা: প্লাস্টিক জাতীয় দ্রব্যের সবচেয়ে বড় অসুবিধা হলো তা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। আমরা যে সকল জিনিস মাটিতে বা পানিতে ফেলি সেগুলো ব্যাকটেরিয়া বা বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন বা মাটি বা পানিতে অন্য পদার্থের সাথে বিক্রিয়া করে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখে। কিন্তু প্লাস্টিক দ্রব্য যেমন ব্যাকটেরিয়া দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, তেমনই অন্যান্য পদার্থের সাথেও বিক্রিয়া করে না। তাই মাটিতে বা পানিতে ফেললে তা একই রকম থেকে যায়। ফলে মাটি ও পানির দূষণ ঘটায়। সেই সাথে পরিবেশেরও ভারসাম্য নষ্ট হয়।

আমাদের করণীয়: প্লাস্টিক জাতীয় দ্রব্যকে যেখানে-সেখানে ফেলে না দিয়ে তাকে সংরক্ষণ করে আবার প্রক্রিয়াজাত (recycling) করে পুনরায় ব্যবহার করা উচিত। অন্যদিকে কাঠ, ধাতু, প্রাকৃতিক তন্তু ব্যবহারের পরিমাণও আমাদের বাড়াতে হবে। বিজ্ঞানীরা পচনশীল প্লাস্টিক দ্রব্য তৈরি করার চেষ্টা করছেন এবং ইতোমধ্যে তারা অনেক ক্ষেত্রে সফলও হয়েছেন। তাই আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে বাজারে বর্তমানে ব্যবহৃত প্লাস্টিক দ্রব্যের পরিবর্তে পচনশীল প্লাস্টিকের তৈরি দ্রব্যসামগ্রী পাওয়া যাবে।

১১.৭.৪ জৈব ও অজৈব যৌগের পার্থক্য

এ অধ্যায়ে তোমরা যে সকল যৌগ সম্পর্কে অধ্যয়ন করেছ তার সবই জৈব যৌগ। সাধারণত সমযোজী বন্ধনের মাধ্যমে জৈব যৌগসমূহ গঠিত হয় এবং আয়নিক বন্ধনের মাধ্যমে অজৈব যৌগসমূহ গঠিত হয়।

জৈব যৌগ	অজৈব যৌগ
1. সাধারণত জৈব যৌগে কার্বন অবশ্যই থাকবে। যেমন: মিথেন (CH_4)	1. দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া সাধারণত অজৈব যৌগে কার্বন থাকে না। যেমন: হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S)
2. জৈব যৌগের বিক্রিয়া হতে সাধারণত অনেক বেশি সময় লাগে।	2. অজৈব যৌগের বিক্রিয়া হতে সাধারণত অনেক কম সময় লাগে।
3. জৈব যৌগসমূহ সাধারণত সমযোজী বন্ধনের মাধ্যমে গঠিত হয়।	3. অজৈব যৌগসমূহ সাধারণত আয়নিক বা সমযোজী বন্ধনের মাধ্যমে গঠিত হয়।

নিজে করো

কাজ: জৈব যৌগের সংজ্ঞা দাও। কয়েকটি জৈব ও অজৈব যৌগ নিয়ে গলনাঙ্ক নির্ণয় করে পার্থক্য দেখাও।

চিন্তা করো: আয়নিক ও সমযোজী যৌগের পার্থক্যের ভিত্তিতে কীভাবে জৈব ও অজৈব যৌগের মধ্যে পার্থক্য করা যায়।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. প্রাকৃতিক গ্যাসে শতকরা কত ভাগ ইথেন থাকে?

(ক) 3 ভাগ (খ) 4 ভাগ
(গ) 6 ভাগ (ঘ) 7 ভাগ

২. নিচের কোন যৌগটি ব্রোমিন দ্রবণের লাল বর্ণকে বর্ণহীন করতে পারে?

(ক) C_3H_8 (খ) C_3H_8O
(গ) C_2H_6O (ঘ) C_2H_4

বিক্রিয়া: $$CH_3\text{-}C\equiv CH \xrightarrow{Br_2} X \xrightarrow{Br_2} Y$$

উপরের বিক্রিয়া থেকে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

৩. Y যৌগটির নাম কী?

(ক) 1, 1- ডাইব্রোমো প্রোপেন (খ) 2, 2- ডাইব্রোমো প্রোপেন
(গ) 1, 1, 2, 2- টেট্রাব্রোমো প্রোপেন (ঘ) 1, 2- ডাইব্রোমো প্রোপিন

৪. উদ্দীপকের ‘X’ যৌগটি–

(i) সংযোজন বিক্রিয়া দেয়
(ii) প্লাস্টিক তৈরিতে ব্যবহৃত হয়
(iii) Y অপেক্ষা কম সক্রিয়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. মার্চ-জুন মাসে বাংলাদেশে সংরক্ষণের অভাবে প্রচুর পরিমাণে আলু নষ্ট হয়। আলু থেকে নিচের বিক্রিয়ায় ইথানল উৎপন্ন করা যায়।

$$\text{স্টার্চ} \xrightarrow[\text{পানি}]{\text{এনজাইম (ডায়াসটেজ ও ম্যাল্টেজ)}} \text{গ্লুকোজ} \xrightarrow{\text{এনজাইম (জাইমেজ)}} \text{ইথানল}$$

(ক) পেট্রোলিয়ামের প্রধান উপাদান কী?
(খ) অ্যালকেন অপেক্ষা অ্যালকিন সক্রিয় কেন? ব্যাখ্যা করো।
(গ) উদ্দীপকের বিক্রিয়া ব্যবহার করে আলু থেকে মিথেন প্রস্তুতির বর্ণনা দাও।
(ঘ) অতিরিক্ত আলুকে জীবাশ্ম জ্বালানির বিকল্প হিসেবে ব্যবহারের সম্ভাবনা বিশ্লেষণ করো।

২. পর্যায়ক্রমে একটি গ্যাসকে i থেকে iii বিক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন পদার্থে পরিণত করা হয়।

(i) $2CH_4 \longrightarrow HC{\equiv}CH + H_2$

(ii) $HC{\equiv}CH + HCl \longrightarrow CH_2{=}CHCl$

(iii) $nCH_2{=}CHCl \xrightarrow{\text{পলিমারকরণ}} -(CH_2{-}CHCl)-_n$

(ক) হাইড্রোকার্বন কাকে বলে?
(খ) বেনজিন অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন কেন?
(গ) ii নং বিক্রিয়াটি কোন ধরনের বিক্রিয়া? ব্যাখ্যা করো।
(ঘ) উদ্দীপকের প্রথম বিক্রিয়ক গ্যাসটির ব্যবহার বহুমুখীকরণের সম্ভাবনা বিশ্লেষণ করো।

৩.
$$\underset{}{X} + \underset{\text{সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড}}{NaOH} \longrightarrow \underset{\text{সোডিয়াম ইথানয়েট}}{CH_3COONa} + \underset{\text{পানি}}{H_2O}$$

(ক) অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন কী?
(খ) ক্যালসিয়াম কার্বাইড থেকে কীভাবে ইথাইন তৈরি করা যায়? বিক্রিয়াসহ লেখো।
(গ) উদ্দীপকের বিক্রিয়াটি সম্পন্ন করো।
(ঘ) X যৌগটি এসিড হবে কী? বিশ্লেষণ করো।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. ন্যাপথলিনকে অ্যারোমেটিক যৌগ বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো।
২. 'প্রোটিন একটি প্রাকৃতিক পলিমার' ব্যাখ্যা করো।
৩. ইথানল ও ইথিন সমগোত্রীয় শ্রেণিভুক্ত নয় কেন? ব্যাখ্যা করো।

দ্বাদশ অধ্যায়

আমাদের জীবনে রসায়ন

(Chemistry in Our Lives)

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত কিছু রাসায়নিক পণ্য

আমরা মাটির উর্বরতা বাড়ানোর জন্য জমিতে বিভিন্ন প্রকার সার দেই। এই সার মূলত রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা তৈরি। তোমরা কি জানো? পাউরুটি ফোলানোর জন্য আমরা ময়দার মধ্যে বেকিং সোডা ব্যবহার করি। কোনো খাদ্য দীর্ঘদিন বাড়িতে রেখে দেওয়ার জন্য ভিনেগার বা অন্যান্য ফুড প্রিজারভেটিভ ব্যবহার করি। এসব কিছুই রাসায়নিক পদার্থ। আবার, শিল্পকারখানার যে সকল বর্জ্য পরিবেশকে দূষিত করে সেগুলোও রাসায়নিক পদার্থ। আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসায়নিক পদার্থের ভূমিকা রয়েছে। এ সকল রাসায়নিক পদার্থ কীভাবে প্রস্তুত করা হয়, এগুলোর ধর্ম, ব্যবহার ইত্যাদি এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- গৃহে ব্যবহার্য কতিপয় খাদ্যসামগ্রীর আহরণ, ধর্ম ও ব্যবহারের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব।
- গৃহে প্রসাধন সামগ্রীর উপযোগিতা নির্ধারণে pH এর গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব।
- গৃহে ব্যবহার্য পরিষ্কারক সামগ্রীর প্রস্তুতি ও পরিষ্কার করার কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারব।
- কৃষিক্ষেত্রে উপযুক্ত যৌগ ব্যবহার করে মাটির pH মান নিয়ন্ত্রণ করে পারব।
- কৃষিদ্রব্য প্রক্রিয়াকরণের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারব।
- কৃষিদ্রব্য সংরক্ষণের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারব।
- রাসায়নিক বর্জ্য সম্পর্কে জেনে এর ক্ষতিকারক প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে সাবান প্রস্তুত করতে পারব।
- ব্লিচিং পাউডারের বিরঞ্জন ক্রিয়া প্রদর্শন করতে পারব।
- মাটি, পানি ও বায়ু দূষণ রোধে রাসায়নিক দ্রব্যের যথাযথ ব্যবহারের বিষয়ে আস্থার সাথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মতামত দিতে পারব।
- স্বাস্থ্য সচেতন দ্রব্য ব্যবহারে আগ্রহ প্রদর্শন করতে পারব।
- স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যদ্রব্য ব্যবহারে আগ্রহ প্রদর্শন করতে পারব।
- খাদ্যদ্রব্যে বেকিং পাউডারের ভূমিকা পরীক্ষার মাধ্যমে দেখাতে পারব।

১২.১ গৃহস্থালির রসায়ন (Domestic Chemistry)

আমরা আমাদের বাসায় নানা ধরনের রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করি। যেমন- খাদ্য লবণ, বেকিং পাউডার, ভিনেগার, কোমল পানীয় ইত্যাদি রাসায়নিক পদার্থ।

খাদ্যলবণ

সাগরের পানিতে অনেক বেশি পরিমাণে খাদ্য লবণ বা সোডিয়াম ক্লোরাইড ($NaCl$) এবং তার সাথে খুবই সামান্য পরিমাণে $CaCl_2$, $MgCl_2$ সহ অন্য কিছু লবণ দ্রবীভূত থাকে। আবার, মাটির তলদেশে খনিজ পদার্থ হিসেবেও সোডিয়াম ক্লোরাইড পাওয়া যায়। আমাদের দেশে সমুদ্রের পানি থেকে খাদ্য লবণ সংগ্রহ করা হয়। সমুদ্র উপকূলের লবণ চাষিরা বিভিন্ন আকৃতির বর্গাকার বা আয়তাকার জমির চারপাশে বাঁধ নির্মাণ করে খানিকটা খুলে রাখে। জোয়ারের সময় যখন পানি ঐ জায়গায় প্রবেশ করে তখন পানি প্রবেশের মুখ বন্ধ করে জোয়ারের পানি আটকে দেওয়া হয়। যখন ঐ পানি সূর্যের তাপে শুকিয়ে যায় তখন ঐ জায়গায় লবণ দেখতে পাওয়া যায়। এটাকে সল্ট হারভেস্টিং বলে। সল্ট হারভেস্টিং এর মাধ্যমে পাওয়া এই লবণকে শিল্পকারখানায় বিভিন্ন প্রক্রিয়া সম্পাদন করে খাবার উপযোগী খাদ্যলবণে পরিণত করা হয়।

চিত্র ১২.০১: সমুদ্র উপকূলে লবণ চাষ

সল্ট হারভেস্টিং এর মাধ্যমে পাওয়া লবণের সাথে বালু মিশ্রিত থাকে। এই লবণকে কোনো পাত্রে নিয়ে পানি মিশালে লবণ পানিতে দ্রবীভূত হয়ে যায় কিন্তু বালু পাত্রের তলায় পড়ে থাকে। তখন লবণ পানির দ্রবণকে ছেঁকে আলাদা করে নেওয়া হয়। এবার এই দ্রবণকে তাপ প্রয়োগ করলে পানি বাষ্পীভূত হয়ে উড়ে যায় এবং লবণ পাত্রের তলায় পড়ে থাকে। এভাবে উৎপন্ন লবণকে প্যাকেটে করে বিক্রির জন্য পাঠানো হয়। আমাদের শরীরের যাবতীয় কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হবার জন্য বিভিন্ন আয়ন যেমন: Na^+, K^+ ইত্যাদি দরকার হয়। শরীরে যদি কোনো কারণে Na^+ এর ঘাটতি হয় তবে $NaCl$ পানির সাথে মিশিয়ে খেলে সেই ঘাটতি পূরণ হয়।

$NaCl$ এর ব্যবহার: $NaCl$ অনেক কাজে ব্যবহার করা হয়। যেমন-

(i) ভাত-এর সাথে আমরা তরকারি খাই। তরকারিতে $NaCl$ লবণ না দিলে তরকারি সুস্বাদু হয় না।

(ii) শিল্পকারখানায় NaOH যৌগ প্রস্তুত করার জন্য NaCl ব্যবহৃত হয়।

(iii) ডায়রিয়া বা পানিশূন্যতা পূরণের জন্য ওষুধ শিল্পে স্যালাইন তৈরিতে NaCl প্রয়োজন হয়।

বেকিং পাউডার

বেকিং সোডা বা খাবার সোডার রাসায়নিক নাম সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট ($NaHCO_3$)। খাবার সোডাকে সোডিয়াম বাই-কার্বনেটও বলা হয়ে থাকে। বেকিং সোডা ($NaHCO_3$) তৈরি করে তার মধ্যে টারটারিক এসিড ($C_4H_6O_6$) মিশালে বেকিং পাউডার তৈরি হয়। সাধারণত কেক বানানোর কাজে বেকিং পাউডার ব্যবহার করা হয়।

বেকিং সোডা প্রস্তুতি

অ্যামোনিয়া গ্যাস, খাদ্যলবণ, পানি এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড থেকে বেকিং সোডা প্রস্তুত করা যায়। প্রথমে পানির মধ্যে NaCl কে দ্রবীভূত করে NaCl এর সম্পৃক্ত দ্রবণ প্রস্তুত করা হয়। এবার এই সম্পৃক্ত দ্রবণের মধ্যে NH_3 গ্যাস প্রবাহিত করে NH_3 দ্বারা সম্পৃক্ত করা হয়। কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসকে NH_3 সম্পৃক্ত NaCl দ্রবণের মধ্যে প্রবাহিত করা হয়। এক্ষেত্রে CO_2, NH_3, H_2O একত্র হয়ে প্রথমে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট (NH_4HCO_3) উৎপন্ন হয়। এরপর অ্যামোনিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট সোডিয়াম ক্লোরাইড-এর সাথে বিক্রিয়া করে সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট ($NaHCO_3$) বা বেকিং সোডা উৎপন্ন করে।

$$CO_2 + NH_3 + H_2O \longrightarrow NH_4HCO_3$$

$$NH_4HCO_3 + NaCl \longrightarrow NaHCO_3 + NH_4Cl$$

বেকিং সোডাকে বিক্রিয়া পাত্র থেকে পৃথক করে তার সাথে টারটারিক এসিড মেশানো হয়। এ মিশ্রণকে বেকিং পাউডার বলে।

বেকিং সোডার ব্যবহার: কেক প্রস্তুতির সময় ময়দার মধ্যে বেকিং পাউডার মিশিয়ে তাপ প্রদান করা হয়। বেকিং সোডা মিশ্রণের টারটারিক এসিডের ($C_4H_6O_6$) সাথে বিক্রিয়া করে সোডিয়াম টারটারেট ($C_4H_4\ Na_2O_6$), CO_2 গ্যাস এবং H_2O উৎপন্ন করে। এই CO_2 গ্যাস এর জন্য কেক ফুলে উঠে।

$$2NaHCO_3 + C_4H_6O_6 \longrightarrow C_4H_4Na_2O_6 + 2CO_2 + 2H_2O$$

বাড়িতে কিংবা বেকারিতে পাউরুটি ফোলানোর জন্য ইস্ট নামক ছত্রাকও ব্যবহার করা হয়। এজন্য প্রথমে চিনির দ্রবণে ইস্ট মেশানো হয়। এই মিশ্রণ দিয়ে ময়দা মাখিয়ে দলা করে উষ্ণ জায়গায় রেখে দিলে ইস্টের সবাত শ্বসনের কারণে কার্বন ডাই-অক্সাইডের উৎপন্ন হয় যা পাউরুটিকে ফুলতে সাহায্য করে। পাউরুটি ফুলে ওঠার পর ওভেনে বেকিং করা হলে উত্তাপে ইস্ট মারা যায়, তখন পাউরুটির ফোলা বন্ধ হয়।

একক কাজ

পৃথকভাবে বেকিং পাউডার এবং ইস্টের সাথে ময়দা মেখে রেখে দাও। কিছু সময় পরে এই ময়দা দিয়ে আলাদা আলাদাভাবে কেক বানাও। দুটি কেকের মাঝে তুলনা করো। কেক দুটিতে কোনো পার্থক্য দেখা যায়? এর কারণ ব্যাখ্যা করো।

সিরকা বা ভিনেগার

ইথানয়িক এসিড বা অ্যাসিটিক এসিডের 4% – 10% জলীয় দ্রবণকে ভিনেগার বলা হয়। ভিনেগার তরল পদার্থ। সাধারণত আচার তৈরি করার সময় ভিনেগার যোগ করা হয়।

ভিনেগারের প্রস্তুতি

$25^{\circ}C$-$35^{\circ}C$ তাপমাত্রায় রাখা একটি স্টিলের পাত্রে ইথানল (CH_3CH_2OH) এবং অ্যাসিটোব্যাকটর নিয়ে এর মধ্যে অক্সিজেন গ্যাসের বুদবুদ প্রবাহিত করলে ভিনেগার বা অ্যাসিটিক এসিড বা ইথানয়িক এসিড (CH_3COOH) প্রস্তুত হয়। অ্যাসিটোব্যাকটর (Acetobacter) ব্যাকটেরিয়া এমন এক ধরনের এনজাইম নিঃসৃত করে যা ইথানলকে অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করতে সাহায্য করে।

$$CH_3CH_2OH + O_2 \xrightarrow{\text{অ্যাসিটোব্যাকটর}} CH_3COOH + H_2O$$

খাদ্য সংরক্ষণে ভিনেগারের ভূমিকা

আচারকে যদি ব্যাকটেরিয়া আক্রমণ করে তবে আচার পচে যায় বা নষ্ট হয়ে যায়। আচার-এর মধ্যে ভিনেগার দিলে আচারকে ব্যাকটেরিয়া আক্রমণ করতে পারে না। ভিনেগারের মূল উপাদান ইথানয়িক এসিড। ভিনেগারকে যখন আচারের মধ্যে দেওয়া হয় তখন ইথানয়িক এসিড কর্তৃক ত্যাগকৃত প্রোটন, H^+ ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে এবং খাদ্য দীর্ঘকাল ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়। এভাবে ভিনেগার দিয়ে খাদ্য সংরক্ষণ করা হয়।

কোমল পানীয় (Soft drinks or Carbonated soda)

ঠান্ডা অবস্থায় ও উচ্চ চাপে পানিতে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস দ্রবীভূত করে কোমল পানীয় তৈরি করা হয়। কোমল পানীয়তে কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং পানি বিক্রিয়া করে কার্বনিক এসিড (H_2CO_3) উৎপন্ন করে। খাদ্য হজম বা পরিপাক হবার জন্য মানুষ কোমল পানীয় পান করে থাকে, যদিও এর কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি (scientific evidence) নেই।

১২.২ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় রসায়ন (Chemistry for Cleanliness)

সুস্থ দেহের সুস্থ মনকেই স্বাস্থ্য বলা হয়। স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য আমরা আমাদের শরীরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখি। আমাদের শরীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলে মনও ভালো থাকে। গোসলের সময় আমরা প্রসাধনী সাবান ব্যবহার করি। আমাদের পোশাক বা কাপড়-চোপড় পরিষ্কার রাখার জন্য আমরা কাপড় কাচা সোডা, ব্লিচিং পাউডার ইত্যাদি ব্যবহার করি। ঘরের জানালার কাচ বা অন্যান্য কাচদ্রব্য পরিষ্কার করার জন্য আমরা গ্লাস ক্লিনার ব্যবহার করি। টয়লেট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য টয়লেট ক্লিনার ব্যবহার করি। এসব পরিষ্কার সামগ্রীর প্রস্তুতি এবং পরিষ্কারকরণের ক্রিয়াকৌশল নিম্নে আলোচনা করা হলো:

কাপড় কাচা সোডা

সোডিয়াম কার্বনেট (Na_2CO_3) কে সোডা অ্যাস (Soda ash) বলা হয়। সোডা অ্যাসের 1 অণুর সাথে 10 অণু পানি রাসায়নিকভাবে যুক্ত হলে তাকে কাপড় কাচা সোডা বা ওয়াশিং সোডা বলে। কাপড় কাচা সোডার রাসায়নিক নাম সোডিয়াম কার্বনেট ডেকা হাইড্রেট ($Na_2CO_3.10H_2O$)।

কাপড় কাচা সোডা প্রস্তুতি

গাঢ় NaOH এর দ্রবণের মধ্যে CO_2 কে অধিক পরিমাণে চালনা করলে সোডিয়াম কার্বনেট উৎপন্ন হয় যা পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে।

$$2NaOH + CO_2 \longrightarrow Na_2CO_3 + H_2O$$

বিক্রিয়া পাত্রের মধ্যে Na_2CO_3 এবং পানি থাকে। সোডিয়াম কার্বনেট 10 অণু পানির সাথে যুক্ত হয়ে কাপড় কাচা সোডা ($Na_2CO_3.10H_2O$) উৎপন্ন হয়।

$$Na_2CO_3 + 10H_2O \longrightarrow Na_2CO_3.10H_2O$$

কাপড় কাচা সোডার ব্যবহার

কাপড় পরিষ্কার করতে কাপড় কাচা সোডা ব্যবহার করা হয়।

টয়লেট ক্লিনার

টয়লেট ক্লিনারের মূল উপাদান হাইড্রোক্লোরিক এসিড (HCl)। হাইড্রোক্লোরিক এসিড এর সাথে সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইট (NaOCl) মিশ্রিত থাকে। বেসিন, কমোড ইত্যাদি পরিষ্কার করার জন্য টয়লেট ক্লিনার ব্যবহার করা হয়। টয়লেট, বেসিন, কমোড ইত্যাদিতে চর্বি জাতীয় পদার্থ, প্রোটিন জাতীয় পদার্থ, বিভিন্ন রং (Pigments) এর জৈব পদার্থ, অজৈব পদার্থ, রোগজীবাণু ইত্যাদি থাকে। যখন টয়লেট, বেসিন, কমোড ইত্যাদিতে টয়লেট ক্লিনার যোগ করা হয়, তখন সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইট

বিভিন্ন পিগমেন্ট এবং রোগজীবাণুর সাথে বিক্রিয়া করে এদের কার্যকারিতা নষ্ট করে দেয়।

টয়লেট ক্লিনার দ্বারা টয়লেট পরিষ্কারের কৌশল

টয়লেট ক্লিনারকে যখন টয়লেটের উপর ঢালা হয় তখন টয়লেট ক্লিনারের বিভিন্ন উপাদান বিভিন্নরূপে বিক্রিয়া করে।

টয়লেট ক্লিনারের সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইট (NaOCl) পানির সাথে বিক্রিয়া করে হাইপোক্লোরাস এসিডে (HOCl) পরিণত হয় যা ভেঙে জায়মান অক্সিজেন উৎপন্ন করে। এই জায়মান অক্সিজেন রঙিন পদার্থকে বর্ণহীন করে এবং জীবাণুকে ধ্বংস করে।

$$NaOCl + H_2O \longrightarrow NaOH + HOCl$$

$$HOCl \longrightarrow HCl + [O]$$

$$\text{রঙিন পদার্থ} + [O] \longrightarrow \text{বর্ণহীন পদার্থ}$$

$$\text{জীবাণু} + [O] \longrightarrow \text{মৃত জীবাণু}$$

এভাবে টয়লেট ক্লিনার রঙিন পদার্থকে বর্ণহীন করে এবং জীবাণুকে ধ্বংস করে। (তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে অক্সিজেন পরমাণু দিয়ে জায়মান অক্সিজেনকে বোঝানো হয়। জায়মান অক্সিজেন = [O], জায়মান অক্সিজেন বা nascent oxygen বলতে সদ্য তৈরি হওয়া অস্থায়ী রিয়েকটিভ অক্সিজেন পরমাণুকে বোঝায় যা এখনো O_2 অণু তৈরি করেনি।

সাবান

সাধারণত সাবান হলো উচ্চতর ফ্যাটি এসিডের সোডিয়াম লবণ (R-COONa) বা উচ্চতর ফ্যাটি এসিডের পটাশিয়াম লবণ (R-COOK)। এখানে R কে অ্যালকাইল মূলক বলা হয়। R এর সাধারণ সংকেত C_nH_{2n+1} এবং n এর মান 12 থেকে 18 পর্যন্ত। যেমন: সোডিয়াম স্টিয়ারেট সাবানের সংকেত $C_{17}H_{35}COONa$ এবং পটাশিয়াম স্টিয়ারেট সাবানের সংকেত $C_{17}H_{35}COOK$। তেল বা চর্বির সাথে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড বা পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড বিক্রিয়া করে সাবান এবং গ্লিসারিন তৈরি হয়। সাবান ও গ্লিসারিন তৈরির এই প্রক্রিয়াকে সাবানায়ন (Saponification) বলে। সাবানায়ন প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত সাবান এবং গ্লিসারিনের মিশ্রণের মধ্যে NaCl যোগ করলে গ্লিসারিন পাত্রের নিচে অবস্থান করে এবং সাবানের অণুগুলো NaCl কে ঘিরে একত্র হয়ে পাত্রের উপরের দিকে কেকের আকারে ভেসে উঠে। একে সোপ কেক বলে। সোপ কেককে ছাঁকনির সাহায্যে ছেঁকে পৃথক করে বিভিন্ন আকৃতির ছাঁচে ঢেলে বিভিন্ন আকৃতির সাবান তৈরি করা হয়।

সাবান একটি পরিষ্কারক দ্রব্য যা তেল বা চর্বি এবং ক্ষার থেকে প্রস্তুত করা হয়। ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে সাবানকে মূলত দুই ভাগে ভাগ করা যায়– প্রসাধনী সাবান এবং লন্ড্রি সাবান।

প্রসাধনী সাবান (Cosmetic soap): আমাদের ত্বককে পরিষ্কার করার জন্য যেসব সাবান ব্যবহার করি তাদেরকে প্রসাধনী সাবান বলে।

লন্ড্রি সাবান (Laundry soap): কাপড়-চোপড় পরিষ্কার করার জন্য আমরা যেসব সাবান ব্যবহার করি তাদেরকে কাপড় কাচা সাবান বা লন্ড্রি সাবান বলা হয়।

সাবান তৈরির সময় সাবানের সাথে গ্লিসারিনও তৈরি হয়। সাবান এবং গ্লিসারিনের মিশ্রণের সাথে তেল, চর্বি বা ক্ষার ইত্যাদি থেকে যেতে পারে। এগুলো থেকে সাবানকে আলাদা করা হয়। এই আলাদা করার সময় যদি সাবানের মধ্যে অধিক তেল বা চর্বি থেকে যায় তখন সাবানের মধ্যে তৈলাক্ত ভাব থেকে যায়। এই সাবান ব্যবহারের সময় তেমন কোনো ফেনা উৎপন্ন করে না। যদি সাবানের মধ্যে অধিক পরিমাণে ক্ষার থেকে যায় তবে এই সাবান ব্যবহার করলে ত্বকের ক্ষতি হয়। এজন্য সাবান তৈরি কারখানায় সঠিক অনুপাতে তেল বা চর্বি এবং ক্ষার যোগ করতে হয় যাতে তেল বা চর্বি এবং ক্ষার সম্পূর্ণরূপে বিক্রিয়া করতে পারে। কার্বক্সিল গ্রুপ অনেক বড় কার্বন শিকলের সাথে যুক্ত থাকলে ঐ যৌগকে উচ্চতর ফ্যাটি এসিড বলে। ফ্যাটি এসিড অ্যালকোহল বা গ্লিসারিনের সাথে বিক্রিয়া করে এস্টার উৎপন্ন করে। উচ্চতর ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারিনের ট্রাই এস্টার তরল অবস্থায় থাকলে তাকে তেল এবং কঠিন অবস্থায় থাকলে তাকে চর্বি বলা হয়।

স্টিয়ারিক এসিড হলো প্রাণিদেহের ফ্যাট থেকে প্রাপ্ত সম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড। সম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিডে কার্বন-কার্বন একক বন্ধন থাকে। কোনো দ্বিবন্ধন বা কোনো ত্রিবন্ধন থাকে না।

জলপাই থেকে যে তেল পাওয়া যায় তাকে অলিভ অয়েল বলে। অলিভ অয়েল থেকে অলিক এসিড পাওয়া যায়। অলিক এসিড হলো অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড। অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিডে কার্বন-কার্বন দ্বিবন্ধন বা কার্বন-কার্বন ত্রিবন্ধন থাকে। লন্ড্রি সাবানে ক্ষার বা অন্যান্য অপদ্রব্য তুলনামূলক বেশি থাকে এবং এতে সুগন্ধি বা জীবাণুনাশক পদার্থ যোগ করা হয় না। প্রসাধনী সাবানে ক্ষার এবং অন্যান্য অপদ্রব্যের পরিমাণ তুলনামূলক কম থাকে। প্রসাধনী সাবানে সুগন্ধিকারক পদার্থ বা জীবাণুনাশক পদার্থ যোগ করা হয়।

ডিটারজেন্ট

ডিটারজেন্ট সাবানের মতোই এক প্রকার পরিষ্কারক দ্রব্য। ডিটারজেন্ট সাধারণত পাউডারের মতো হয় এবং তরল আকারেও পাওয়া যায়। লরাইল অ্যালকোহলের ($C_{12}H_{26}O$) সাথে সালফিউরিক এসিড (H_2SO_4) বিক্রিয়া করে লরাইল হাইড্রোজেন সালফেট ($C_{12}H_{26}SO_4$) এবং পানি উৎপন্ন করে। এই লরাইল হাইড্রোজেন সালফেট ($C_{12}H_{26}SO_4$) এর সাথে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড (NaOH) বিক্রিয়া করে সোডিয়াম লরাইল সালফেট ($C_{12}H_{25}SO_4Na$) এবং পানি (H_2O) উৎপন্ন হয়। সোডিয়াম লরাইল সালফেট ($C_{12}H_{25}SO_4Na$) ডিটারজেন্ট নামে পরিচিত।

$$C_{12}H_{26}O + H_2SO_4 \longrightarrow C_{12}H_{26}SO_4 + H_2O$$

$$C_{12}H_{26}SO_4 + NaOH \longrightarrow C_{12}H_{25}SO_4Na + H_2O$$

ডিটারজেন্টকে ব্যবহার উপযোগী করার জন্য ডিটারজেন্টের মধ্যে বিভিন্ন পদার্থ যোগ করা হয়। ডিটারজেন্টকে পাউডার আকৃতির করার জন্য সোডিয়াম সালফেট (Na_2SO_4) যোগ করা হয়।

সাবান ও ডিটারজেন্ট দ্বারা ময়লা পরিষ্কার করার কৌশল

সাবান ও ডিটারজেন্ট এর মূল কাজ হলো কাপড়-চোপড় থেকে তেলকে অপসারণ করা এবং পানি দিয়ে ধুয়ে ধুলাবালিকে অপসারণ করা। আমাদের শরীর থেকে তৈলাক্ত পদার্থ বের হয়ে কাপড়ে লেগে যায়। এছাড়া বাতাস থেকে কিছু তৈলাক্ত পদার্থ কাপড়ে লেগে যায়। এরপর ধুলাবালি এই তৈলাক্ত পদার্থের উপর লেগে ময়লা তৈরি করে।

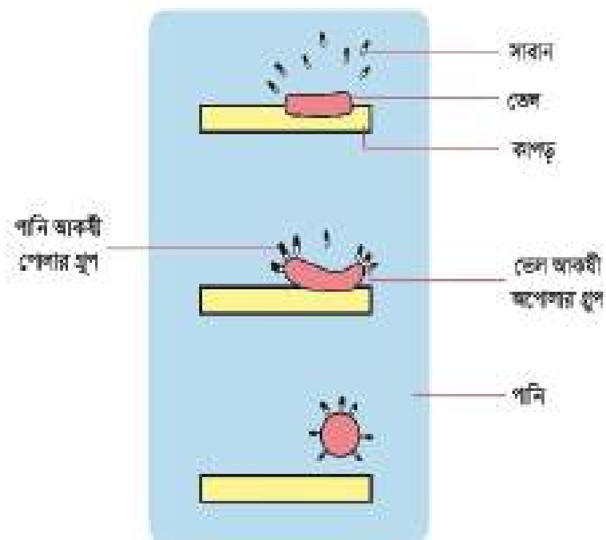

চিত্র ১২.০২: সাবান কিংবা ডিটারজেন্ট দিয়ে ময়লা পরিষ্কার করার কৌশল

সাবান (R-COONa) ও ডিটারজেন্ট ($C_{12}H_{25}SO_4Na$) একটি দীর্ঘ কার্বন শিকলবিশিষ্ট অণু। পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় এরা ঋণাত্মক চার্জ বিশিষ্ট সাবান ($R\text{-}COO^-$) বা ডিটারজেন্ট আয়ন ($C_{12}H_{25}SO_4^-$) এবং ধনাত্মক সোডিয়াম আয়নে (Na^+) ভাগ হয়ে যায়। সাবান বা ডিটারজেন্ট আয়নের এক প্রান্তে ঋণাত্মক চার্জ যুক্ত থাকে। এই প্রান্ত পানিকে আকর্ষণ করে বলে হাইড্রোফিলিক বা পানি আকর্ষী বলে। সাবান বা ডিটারজেন্ট আয়নের অন্য প্রান্ত তেল বা গ্রিজে দ্রবীভূত হয়, এই প্রান্তকে হাইড্রোফোবিক বা পানি বিকর্ষী বলে।

সাবান কিংবা ডিটারজেন্টকে যখন পানির উপস্থিতিতে তেল বা গ্রিজজাতীয় ময়লাযুক্ত কাপড়ের সংস্পর্শে আনা হয় তখন তার হাইড্রোফোবিক প্রান্ত তেল বা গ্রিজের দিকে আকর্ষিত হয় এবং এতে দ্রবীভূত হয়। অন্যদিকে হাইড্রোফিলিক অংশ পানির দিকে আকর্ষিত হয়ে পানির স্তরে প্রসারিত হয়। এ অবস্থায় কাপড়কে ঘষা দিলে বা মোচড়ানো হলে তেল বা গ্রিজের ময়লার কণা চারদিক থেকে সাবান বা ডিটারজেন্টের ঋণাত্মক চার্জবিশিষ্ট আয়ন দিয়ে আবৃত হয়ে পড়ে এবং তেল বা গ্রিজের

ময়লার কণার চারপাশে ঋণাত্মক চার্জের একটা বলয় সৃষ্টি হয়। তখন এগুলো একটি আরেকটি থেকে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ দূরত্বে থাকতে চায় এবং তেল, সাবান এবং পানির সাথে একত্র হয়ে একটি মিশ্রণ তৈরি করে। এই মিশ্রণ ফেনা নামে পরিচিত। ফেনাতে আরও পানি যোগ করলে ফেনা অপসারিত হবার সাথে তেল ও ধুলাবালি কাপড় থেকে অপসারিত হয়। এভাবেই সাবান ময়লা পরিষ্কার করে।

সাবান ও ডিটারজেন্টের পার্থক্য

সাবান	ডিটারজেন্ট
1. সাবান হলো দীর্ঘ কার্বন শিকলবিশিষ্ট ফ্যাটি এসিডের সোডিয়াম বা পটাশিয়াম লবণ।	1. ডিটারজেন্ট হলো দীর্ঘ কার্বন শিকলবিশিষ্ট বেনজিন সালফোনিক এসিডের সোডিয়াম লবণ।
2. সাবান খর পানিতে ভালো কাজ করতে পারে না।	2. ডিটারজেন্ট খর পানিতেও ভালো কাজ করতে পারে।
3. ডিটারজেন্ট এর চেয়ে পরিষ্কারকরণের ক্ষমতা সাবানের কম।	3. সাবানের চেয়ে পরিষ্কারকরণের ক্ষমতা ডিটারজেন্টের বেশি।

অতিরিক্ত সাবান ও ডিটারজেন্ট ব্যবহারের কুফল

সাবানের মধ্যে কিছু পরিমাণ ক্ষার, গ্লিসারিন, তেল, চর্বি ইত্যাদি থেকে যায়। অতিরিক্ত সাবান ব্যবহার করলে ক্ষার হাতের ক্ষতি করে। আবার পুকুর বা জলাশয়ের ধারে বা নদীর তীরে কাপড় কাচা হলে সাবানের ফেনা পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কমিয়ে দেয়। পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কমে গেলে পানির মধ্যে যে সকল জলজ উদ্ভিদ এবং মাছ রয়েছে সেগুলো মারা যায়। এভাবেই অতিরিক্ত সাবান ব্যবহারে পানি দূষিত হয়। আবার ডিটারজেন্টের মধ্যে ট্রাইসোডিয়াম ফসফেট (Na_3PO_4) থাকে। এই ট্রাইসোডিয়াম ফসফেট উদ্ভিদের বেঁচে থাকার জন্য ভালো সার হিসেবে কাজ করে। এতে পুকুরে উদ্ভিদের পরিমাণ বেড়ে যায়। উদ্ভিদ তার বেঁচে থাকার জন্য পানির মধ্যে দ্রবীভূত অক্সিজেন খরচ করে ফেলে, ফলে পানিতে অক্সিজেনের অভাবে মাছ মরে যায়। এভাবেই অতিরিক্ত ডিটারজেন্ট ব্যবহারে পানি দূষিত হয়।

প্রসাধনী ব্যবহারে

মানুষ ত্বক পরিষ্কার করতে, ত্বকের সৌন্দর্য রক্ষায়, চুল পরিষ্কার করতে এবং বিভিন্ন কাজে প্রসাধনী (সাবান, ক্রিম, শ্যাম্পু) ব্যবহার করে। তোমরা আগেই জেনেছ ত্বকের pH 4.8 থেকে 5.5 এর মধ্যে। অর্থাৎ ত্বক অম্লীয় প্রকৃতির যা ত্বকে জীবাণুর আক্রমণ বা বংশবৃদ্ধি প্রতিরোধ করে। কাজেই প্রসাধনীর pH 4.8 থেকে 5.5 এর বেশি থাকলে সেই প্রসাধনী ব্যবহারের কারণে ত্বকের স্বাভাবিক অম্লত্ব কমে

যাবে, যার কারণে ত্বকের সৌন্দর্য নষ্ট হবে এবং জীবাণুর সংক্রমণ হওয়ার আশঙ্কা বেড়ে যাবে। তাই প্রসাধনীর pH এবং ত্বকের pH এর সামঞ্জস্য থাকতে হয়।

একক কাজ

সাবান প্রস্তুতি

অনুমিত প্রকল্প: ক্ষারের সাথে তেল বা চর্বির বিক্রিয়ায় সাবান উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন সাবানের pH মান 7 এর বেশি হবে।

উপকরণ: নারকেল তেল, কস্টিক সোডা, NaCl এর সম্পৃক্ত দ্রবণ, বাজারের সাবান, কেরোসিন তেল।

যন্ত্রপাতি: একটি বুনসেন বার্নার/স্পিরিট ল্যাম্প/কেরোসিন কুকার, দুইটি বিকার 400 mL, দুইটি টেস্টটিউব, একটি বড় পোর্সেলিন বাটি, একটি নাড়ানি কাঠি, একটি স্পেচুলা, একটি মাপ চোঙ (10 mL), একটি ফানেল, একটি ফিল্টার পেপার।

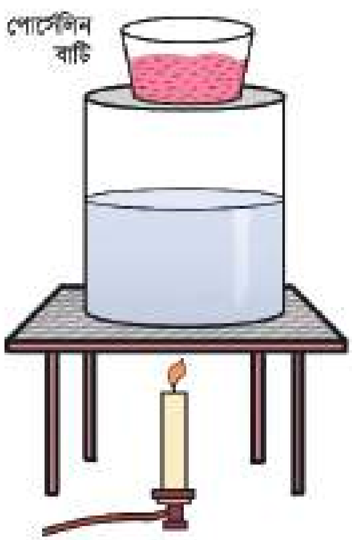

চিত্র ১২.০৩: সাবান প্রস্তুতি

নিরাপত্তামূলক সতর্কতা

সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড গরম অবস্থায় অত্যন্ত তীব্র ক্ষয়কারক পদার্থ। কাজেই এটি যেন পড়ে গিয়ে কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। উৎপন্ন সাবান হাতে বা গায়ে ব্যবহার না করা।

কার্যপদ্ধতি

(a) একটি বিকারে পানি পূর্ণ করে এর উপরে চিত্রের ন্যায় পোর্সেলিন বাটি বসিয়ে স্টিম বাথ প্রস্তুত করো।

(b) পোর্সেলিন বাটিতে 5 mL নারকেল তেল বা 5 গ্রাম চর্বি এবং 30 mL সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্রবণ নাও।

(c) মিশ্রণটিকে স্টিম বাথে 30 মিনিট ধরে ফুটাও। এ সময় নাড়ানি কাঠি দিয়ে একটু পর পর নাড়তে থাকো এবং পানি যোগ করে স্টিম বাথের বাষ্পীভূত পানির ঘাটতি পূরণ করো। এ সময় তেল বা চর্বি সম্পূর্ণ দ্রবীভূত হয়ে এক ধরনের আঠালো পদার্থ সৃষ্টি হবে।

(d) তখন তাপ দেওয়া বন্ধ করো এবং মিশ্রণটিকে ঠান্ডা হতে দাও।

(e) ঠান্ডা মিশ্রণে 50 mL NaCl এর সম্পৃক্ত দ্রবণ যোগ করে সারা রাত রেখে দাও।

(f) পরের দিন একটি ফিল্টার পেপারের সাহায্যে মিশ্রণটিকে ছেঁকে পরিস্রুতটুকু ফেলে দাও এবং সাবানকে শুকোতে দাও।

উৎপন্ন সাবানের পরীক্ষা

1. একটি টেস্টটিউবের তিন ভাগের এক ভাগ পানি ও তোমার তৈরি সাবানের নমুনা নাও। টেস্টটিউবের মুখ বন্ধ করো ঝাঁকাও। লক্ষ করো ফেনা উৎপন্ন হয় কি না।

2. এবার টেস্টটিউবে 2/3 ফোঁটা কেরোসিন যোগ করে ঝাঁকাও এবং পর্যবেক্ষণ করো। কেরোসিনকে গ্রিজ ধরে নিয়ে ফলাফল ব্যাখ্যা করো।

3. তোমার তৈরি সাবানের pH মান নির্ণয় করো।

4. বাজার থেকে কিনে আনা সাবানের জন্য উপরের পরীক্ষা তিনটি সম্পন্ন করো এবং তোমার তৈরি সাবানের সাথে বাজারের সাবানের তুলনা করো।

ব্লিচিং পাউডার

ব্লিচিং পাউডার এর রাসায়নিক নাম ক্যালসিয়াম ক্লোরো হাইপোক্লোরাইট, $Ca(OCl)Cl$। বলপেন এর কালি বা অন্য কোনো রং যেগুলো সাবান এবং ডিটারজেন্ট দিয়ে তোলা যায় না সেগুলোকে কাপড় থেকে উঠানোর জন্য তথা বর্ণহীন করার জন্য ব্লিচিং পাউডার ব্যবহার করা হয়। এছাড়া মেঝে, কমোড, বেসিন ইত্যাদি জায়গা থেকে জীবাণু ধ্বংস করার কাজেও ব্লিচিং পাউডার ব্যবহার করা হয়। 40°C তাপমাত্রায় কঠিন ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইডের মধ্যে ক্লোরিন গ্যাস চালনা করলে ব্লিচিং পাউডার, $Ca(OCl)Cl$ উৎপন্ন হয়।

$$Ca(OH)_2 + Cl_2 \xrightarrow{\Delta} Ca(OCl)Cl + H_2O$$

ব্লিচিং পাউডার দ্বারা কাপড়ের রঙিন দাগ উঠানোর কৌশল

ব্লিচিং পাউডার কাপড়ের রঙিন দাগকে বর্ণহীন করে। এজন্য ব্লিচিং পাউডারকে বিরঞ্জক বলা হয়। কাপড়ের দাগ ও ব্লিচিং পাউডার উভয়ই রাসায়নিক পদার্থ। ব্লিচিং পাউডারকে যখন কোনো কাপড়ের

দাগের উপর রেখে পানি যোগ করা হয় তখন ব্লিচিং পাউডার প্রথমে পানির সাথে বিক্রিয়া করে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ($CaCl_2$) এবং হাইপোক্লোরাস এসিড ($HOCl$) তৈরি হয়।

$$Ca(OCl)Cl + H_2O \longrightarrow CaCl_2 + HOCl$$

$HOCl$ ভেঙে গিয়ে HCl ও জায়মান অক্সিজেন [O] তৈরি করে

$$HOCl \longrightarrow HCl + [O]$$

রঙিন পদার্থের সাথে জায়মান অক্সিজেনের (O) বিক্রিয়া করে রঙিন পদার্থকে বর্ণহীন করে।

$$\text{রঙিন পদার্থ} + [O] \longrightarrow \text{বর্ণহীন পদার্থ}$$

ব্লিচিং পাউডার দ্বারা জীবাণু ধ্বংস করার কৌশল

ঘরের মেঝে, কমোড, বেসিন ইত্যাদি জায়গা থেকে জীবাণু ধ্বংস করার কাজে ব্লিচিং পাউডার ব্যবহার করা হয়। ব্লিচিং পাউডারকে যখন কোনো ঘরের মেঝে, কমোড, বেসিন ইত্যাদির উপর রেখে পানি যোগ করা হয় তখন ব্লিচিং পাউডার প্রথমে পানির সাথে বিক্রিয়া করে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ($CaCl_2$) এবং হাইপোক্লোরাস এসিডে ($HOCl$) পরিণত হয়।

$$Ca(OCl)Cl + H_2O \longrightarrow CaCl_2 + HOCl$$

হাইপোক্লোরাস এসিড ভেঙে গিয়ে জায়মান অক্সিজেন [O] তৈরি করে যা জীবাণুকে ধ্বংস করে।

$$HOCl \longrightarrow HCl + [O]$$
$$\text{জীবাণু} + [O] \longrightarrow \text{মৃত জীবাণু}$$

গ্লাস ক্লিনার

গ্লাস পরিষ্কার করার জন্য যে পরিষ্কারক দ্রব্য ব্যবহার করা হয় তাকে গ্লাস ক্লিনার বলে। কাচের গায়ে যদি তেল, চর্বি বা গ্রিজ লাগে তবে এগুলোর উপর ধুলাবালি পড়ে কাচে ময়লা তৈরি হয়। কাচ পরিষ্কারকরণে এমন একটি ক্লিনার ব্যবহার করতে হবে যা তেল, চর্বি বা গ্রিজের সাথে বিক্রিয়া করে কিন্তু কাচের উপাদান সোডিয়াম সিলিকেট বা ক্যালসিয়াম সিলিকেট এর সাথে বিক্রিয়া করে না। সাধারণত অ্যামোনিয়া গ্যাসকে পানিতে দ্রবীভূত করে তৈরিকৃত আমোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড (NH_4OH) এর সাথে আইসো প্রোপাইল অ্যালকোহল, $CH_3CH(OH)CH_3$ মিশিয়ে গ্লাস ক্লিনার প্রস্তুত করা হয়। অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইডকে অ্যামোনিয়া দ্রবণ বলেও উল্লেখ করা হয়।

গ্লাস ক্লিনার দ্বারা কাচ পরিষ্কার করার কৌশল

গ্লাস ক্লিনারকে যখন কাচের গায়ে দেওয়া হয় তখন NH_4OH কাচের তেল, চর্বি বা গ্রিজের সাথে বিক্রিয়া করে তেল বা চর্বি বা গ্রিজকে কাচ থেকে অপসারণ করে। যদি কাচের গায়ে কোনো জৈব

২০২৪

পদার্থ লেগে থাকে তবে আইসো-প্রোপাইল অ্যালকোহল সেই জৈব পদার্থকে দ্রবীভূত করে জৈব পদার্থকে কাচ থেকে অপসারিত করে। গ্লাস ক্লিনার দিয়ে যখন কাচ পরিষ্কার করা হয় তখন নাকে ও মুখে মাস্ক পরে নিতে হয়। কারণ গ্লাস ক্লিনারের মধ্যে যে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড থাকে সেই অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড গ্যাস বের হয়ে নাকে ও মুখে যেতে পারে।

অ্যামোনিয়া গ্যাসের পরীক্ষাগার প্রস্তুতি

পরীক্ষাগারে সাধারণত দুইটি পদ্ধতিতে অ্যামোনিয়া গ্যাস প্রস্তুত করা হয়।

পরীক্ষাগারে একটি টেস্টটিউবে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড (NH_4Cl) এবং ক্যালসিয়াম অক্সাইড (CaO) মিশিয়ে উত্তপ্ত করে অ্যামোনিয়া উৎপন্ন করা হয়।

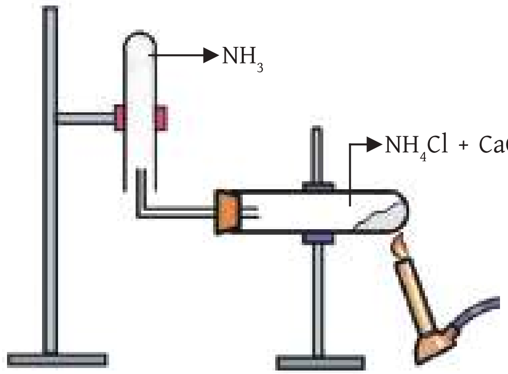

চিত্র ১২.০৪: পরীক্ষাগারে অ্যামোনিয়া গ্যাসের প্রস্তুতি

$$2NH_4Cl + CaO \longrightarrow 2NH_3 + CaCl_2 + H_2O$$

অথবা পরীক্ষাগারে একটি টেস্টটিউবে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড এবং কলিচুন $Ca(OH)_2$ মিশিয়ে উত্তপ্ত করলে অ্যামোনিয়া গ্যাস, ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড এবং পানি উৎপন্ন হয়।

$$2NH_4Cl(s) + Ca(OH)_2 \xrightarrow{\Delta} 2NH_3 + CaCl_2 + 2H_2O$$

শিল্পকারখানায় অ্যামোনিয়া গ্যাস প্রস্তুতি

শিল্পকারখানায় হেবার পদ্ধতিতে অ্যামোনিয়া গ্যাস উৎপাদন করা যায়। হেবার পদ্ধতিতে N_2 এবং H_2 গ্যাস 1:3 অনুপাতে মিশ্রিত করে এর মধ্যে Fe প্রভাবক যোগ করে যদি মিশ্রণকে 450-550°C তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করা হয় তবে NH_3 গ্যাস উৎপন্ন হয়। (1:3 অনুপাতে N_2ও H_2 দ্বারা বোঝায় N_2 যত লিটার নেওয়া হবে তার 3 গুণ H_2 নেওয়া হবে।) NH_3 গ্যাস উৎপাদনের সময় কিছু তাপ উৎপন্ন হয়। এই বিক্রিয়াটি উভমুখী বিক্রিয়া। একদিকে N_2 এবং H_2 বিক্রিয়া করে NH_3 তৈরি হয়, অপরদিকে কিছু NH_3 গ্যাস ভেঙে N_2 এবং H_2 গ্যাসে পরিণত হয়। এই বিক্রিয়ায় উভমুখী তির চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

$$N_2(g) + 3H_2(g) \underset{\substack{200\text{-}250\ atm \\ 450^\circ C\text{-}550^\circ C}}{\overset{Fe}{\rightleftharpoons}} 2NH_3 + 92\ kJ$$

১২.৩ কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে রসায়ন
(Chemistry in Agriculture and Industries)

শিল্পকারখানায় উৎপন্ন বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ মাটিতে প্রয়োগ করে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করা হয়। চুনাপাথর ($CaCO_3$) একটি মূল্যবান খনিজ সম্পদ। আমাদের দেশে সুনামগঞ্জ জেলায় এবং সেন্টমার্টিন দ্বীপে প্রচুর চুনাপাথর পাওয়া যায়। চুনাপাথর দ্বারা অনেক পদার্থ তৈরি করা যায়। যেমন- সিমেন্ট তৈরি করার প্রধান উপাদান হিসেবে চুনাপাথর ব্যবহার করা হয়। কোনো কারণে মাটি যদি অম্লীয় হয় অর্থাৎ মাটিতে যদি H^+ এর পরিমাণ বেড়ে যায়, তবে মাটির অম্লত্ব কমানোর জন্য সেই মাটিতে চুনাপাথর প্রয়োগ করা হয়। চুনাপাথর H^+ এর সাথে বিক্রিয়া করে ক্যালসিয়াম আয়ন (Ca^{2+}), কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং পানি তৈরি করে। ফলে মাটির অম্লত্ব কমে যায়।

$$CaCO_3 + 2H^+ \longrightarrow Ca^{2+} + CO_2 + H_2O$$

ইউরিয়া (Urea)

ইউরিয়া মূল্যবান পদার্থ। কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং অ্যামোনিয়া গ্যাসের মিশ্রণকে উচ্চ চাপে এবং 130^0-150^0C তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে প্রথমে অ্যামোনিয়াম কার্বামেট (NH_2COONH_4) উৎপন্ন হয়। পরবর্তীতে অ্যামোনিয়াম কার্বামেট ভেঙে ইউরিয়া (NH_2-CO-NH_2) প্রস্তুত হয়।

$$CO_2 + 2NH_3 \xrightarrow{\Delta} NH_2COONH_4$$
$$NH_2COONH_4 \longrightarrow NH_2\text{-}CO\text{-}NH_2 + H_2O$$

শিল্পক্ষেত্রে এবং কৃষিক্ষেত্রে ইউরিয়ার ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। শিল্পক্ষেত্রে ইউরিয়া থেকে ম্যালামাইন পলিমার তৈরি করা হয়। কৃষিক্ষেত্রে ইউরিয়াকে সার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। জমিতে ইউরিয়া সার দেওয়া হয় যাতে গাছ ইউরিয়া সার থেকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান নাইট্রোজেন গ্রহণ করতে পারে। উদ্ভিদ বায়ু থেকে সরাসরি N_2 গ্রহণ করে না। মাটিতে ইউরিয়েজ (urease) এনজাইমের উপস্থিতিতে ইউরিয়া পানির সাথে বিক্রিয়া করে NH_4^+, OH^- এবং CO_2 তৈরি করে। উদ্ভিদ এই NH_4^+ শোষণ করে।

$$NH_2\text{-}CO\text{-}NH_2 + 3H_2O \xrightarrow{\text{ইউরিয়েজ এনজাইম}} 2NH_4^+ + 2OH^- + CO_2$$

অ্যামোনিয়াম সালফেট (Ammonium Sulphate)

অ্যামোনিয়া এবং সালফিউরিক এসিড বিক্রিয়া করে অ্যামোনিয়াম সালফেট [$(NH_4)_2SO_4$] এবং পানি উৎপন্ন হয়।

$$2NH_3 + H_2SO_4 \longrightarrow (NH_4)_2SO_4 + H_2O$$

কৃষিক্ষেত্রে অ্যামোনিয়াম সালফেট এর ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। অ্যামোনিয়াম সালফেট ক্ষারকের সাথে বিক্রিয়া করতে পারে কাজেই মাটিতে ক্ষারকের পরিমাণ বেড়ে গেলে অ্যামোনিয়াম সালফেট প্রয়োগ

২০২১

করে ক্ষারকের পরিমাণ কমানো হয়। এটি উদ্ভিদের জন্য অতি প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান। এ থেকে উদ্ভিদ নাইট্রোজেন ও সালফার গ্রহণ করে।

কৃষিদ্রব্য প্রক্রিয়াকরণে রাসায়নিক দ্রব্য

ফলমূল, শাকসবজি, মাছ ইত্যাদিকে কৃষিদ্রব্য বলা হয়। যে প্রক্রিয়ায় কোনো রাসায়নিক পদার্থের মাধ্যমে কোনো কৃষিজাত দ্রব্যকে দীর্ঘদিন ভালো রাখা বা পচনের হাত থেকে রক্ষা করা হয় সেই প্রক্রিয়াকে কৃষিদ্রব্য প্রক্রিয়াকরণ বলা হয়। রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারের ভালো এবং খারাপ উভয় দিকই রয়েছে। ব্যবসায়ীরা পাকা আম বাস, ট্রাক বা ট্রেনে করে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাবার সময় আমের গায়ে দাগ লাগে। এই দাগযুক্ত আম মানুষ কিনতে চায় না। এজন্য অসাধু ব্যবসায়ী অনেক সময় কাঁচা আম কিনে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যায়, ফলে আমের গায়ে দাগ পড়ে না। এরপর এই কাঁচা আমের উপর অসাধু ব্যবসায়ীরা ক্যালসিয়াম কার্বাইডের জলীয় দ্রবণ ব্যবহার করে, ফলে আম পেকে যায়। ক্যালসিয়াম কার্বাইড (CaC_2) এর মধ্যে পানি যোগ করে অ্যাসিটিলিন গ্যাস তৈরি করা হয়। এই অ্যাসিটিলিন গ্যাস ফল পাকাতে সাহায্য করে।

$$CaC_2 + 2H_2O \longrightarrow C_2H_2 + Ca(OH)_2$$

এছাড়া ইথিলিন গ্যাস দ্বারাও কাঁচা আম পাকানো হয়। ইথিলিনও আমদের শরীরের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। কার্বাইড দিয়ে আম পাকানো বলতে অ্যাসিটিলিন দ্বারা আম পাকানোর পদ্ধতিকেই বোঝানো হয়। সাধারণত পাকা ফল থেকে ইথিলিন (প্রাকৃতিক হরমোন) গ্যাস নিঃসৃত হয়ে আশপাশের কাঁচা ফলকেও পাকিয়ে ফেলে।

কৃষিদ্রব্য সংরক্ষণে রাসায়নিক দ্রব্য

কৃষিদ্রব্য যাতে দুর্গন্ধ না হয় বা যাতে এগুলোতে পচন না ধরে সেজন্য বরফ, খাদ্য লবণ, ভিনেগার ইত্যাদি দ্বারা কৃষিদ্রব্য সংরক্ষণ করা হয়। বরফ দ্বারা মাছ সংরক্ষণ করা হয়। টমেটো, কাঁচা আম ইত্যাদি কৌটাতে দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করার জন্য ভিনেগার ব্যবহৃত হয়। খাদ্যের সাথে আমাদের শরীরে ভিনেগার প্রবেশ করলেও আমাদের কোনো সমস্যা হয় না। ফরমালিন দ্বারা খাদ্য সংরক্ষণ করা হয় না। কারণ ফরমালিন মানুষ এবং প্রাণী সকলের জন্য বিষাক্ত পদার্থ। আমাদের শরীরে ফরমালিন প্রবেশ করে আমাদের মৃত্যুর কারণও হতে পারে। অতএব, ফরমালিন দ্বারা কৃষিপণ্য সংরক্ষণ করা উচিত না। গবেষণাগারে মৃত প্রাণীদেহ সংরক্ষণে ফরমালিন ব্যবহার করা হয়।

কয়েকটি অনুমোদিত ফুড প্রিজারভেটিভ

যেসব রাসায়নিক দ্রব্য খাদ্যসামগ্রীতে দিলে খাদ্যসামগ্রীতে ব্যাকটেরিয়া জন্মাতে পারে না, দুর্গন্ধ হয় না, পচন হয় না সেসব রাসায়নিক দ্রব্যকে ফুড প্রিজারভেটিভ বলে। যেসব ফুড প্রিজারভেটিভ আমাদের শরীরে গেলে শরীরের কোনো ক্ষতি হয় না এবং যেগুলোকে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) খাদ্য সংরক্ষক হিসেবে অনুমোদন দিয়েছে, সেসব ফুড প্রিজারভেটিভকে অনুমোদিত ফুড প্রিজারভেটিভ বলা

২০২৩

হয়। যেসব ফুড প্রিজারভেটিভ আমাদের শরীরে গেলে আমাদের শরীরের ক্ষতি হয় সেগুলোকে অননুমোদিত ফুড প্রিজারভেটিভ বলা হয়। সোডিয়াম বেনজোয়েট, বেনজোয়িক এসিড, ভিনেগার, লবণের দ্রবণ, চিনির দ্রবণ ইত্যাদি অনুমোদিত ফুড প্রিজারভেটিভ। ইথিলিন, অ্যাসিটিলিন ইত্যাদি অননুমোদিত ফুড প্রিজারভেটিভ।

শিল্প বর্জ্য ও পরিবেশ দূষণ

শিল্পকারখানা থেকে নির্গত বর্জ্য পদার্থ পরিবেশকে দূষিত করে। বাংলাদেশে চামড়া শিল্প, রং শিল্প, কীটনাশক শিল্প থেকে বর্জ্য হিসেবে বিভিন্ন প্রকার ভারী ধাতু; যেমন– ক্রোমিয়াম (Cr), লেড (Pb), মার্কারি (Hg) এবং ক্যাডমিয়াম (Cd) ইত্যাদি নির্গত হয়। এসব ভারী ধাতু বা বর্জ্য পদার্থ মাটি এবং পানিতে প্রবেশ করে। এসব মাটিতে যেসব উদ্ভিদ জন্মে সেসব উদ্ভিদের মধ্যে এসব ধাতু প্রবেশ করে। এসব উদ্ভিদের ফলমূল খেলে আমাদের শরীরে এসব ভারী ধাতু প্রবেশ করে আমাদের কিডনি ও লিভারের ক্ষতি করে এমনকি, মৃত্যুও ঘটাতে পারে। আবার সাবান ও ডিটারজেন্ট কারখানা থেকে প্রচুর পরিমাণে কস্টিক সোডা (NaOH) মাটি এবং পানিতে নির্গত হয়। পানিতে NaOH গেলে পানিতে ক্ষারকের মাত্রা বেড়ে যায়, ফলে পানিতে জলজ প্রাণী এবং উদ্ভিদ ভালোভাবে বাঁচতে পারে না।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. অ্যামোনিয়া গ্যাস উৎপাদনে ব্যবহৃত হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেনের অনুপাত কতো?

(ক) 1 : 2　　(খ) 1 : 3

(গ) 2 : 1　　(ঘ) 3 : 1

২. NH_3 + H_2SO_4 বিক্রিয়াটি–

(i) একটি প্রশমন বিক্রিয়া

(ii) উৎপাদ উদ্ভিদের একটি গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি উপাদান

(iii) উৎপাদের জলীয় দ্রবণের pH এর মান 7 এর চেয়ে বেশি

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii　　(খ) ii ও iii

(গ) i ও iii　　(ঘ) i, ii ও iii

৩. কোনটি রঙিন পদার্থকে বর্ণহীন করে?

(ক) NaOH　　(খ) Ca(OCl)Cl

(গ) HCl　　(ঘ) CH_3COOH

৪. জমিতে ইউরিয়া প্রয়োগ করলে কোন আয়ন উদ্ভিদ দ্বারা পরিশোষিত হয়?

(ক) OH^- (খ) NH_4^+

(গ) H^+ (ঘ) Cl^-

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. দশম শ্রেণির ছাত্র শাওন টিউবওয়েলের পানিতে সাবান দিয়ে কাপড় ধুয়ে দেখল সেটি তেমন পরিষ্কার হয়নি এবং ফেনাও ভালো হয়নি। তার বন্ধু রিয়াদকে কথাটি জানালে রিয়াদ তাকে ডিটারজেন্ট ব্যবহার করার পরামর্শ দিলো।

(ক) সাবান কী?

(খ) গ্লাস ক্লিনার ও টয়লেট ক্লিনারের পার্থক্য লেখো।

(গ) শাওন প্রথমে যে পদার্থ দিয়ে কাপড় পরিষ্কার করার চেষ্টা করেছিল তার পরিষ্কারক কৌশল বর্ণনা করো।

(ঘ) রিয়াদ কাপড় পরিষ্কার করার জন্য শাওনকে যে পরিষ্কারক সামগ্রীর পরামর্শ দিয়েছিল সেটি কার্যকর হওয়ার কারণ যুক্তিসহ ব্যাখ্যা দাও।

২. ডা. চন্দ্রার গৃহকর্মীর বদহজম হওয়ায় গৃহকর্মী বিশ্রাম নিচ্ছেন। হঠাৎ বাড়ির ফ্রিজটি বিকল হওয়ায় ডা. চন্দ্রা বাজার থেকে আনা কাঁচা মাছ-মাংস, লবণ, হলুদ, বেকিং পাউডার এবং ভিনেগার নিয়ে চিন্তায় পড়লেন। ইতোমধ্যে গৃহকর্মী গোপনে বেকিং পাউডার খেয়ে সুস্থবোধ করলেন। ডা. চন্দ্রা ঘটনাটি জেনে, ভবিষ্যতে তাকে এটি খেতে নিষেধ করলেন।

(ক) গ্লাস ক্লিনারের মূল উপাদান কী?

(খ) আমাদের দেশের অ্যামোনিয়া শিল্পে বাতাসের ভূমিকা কোথায়?

(গ) তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিতে ডা. চন্দ্রা মাছ, মাংস সংরক্ষণের জন্য গৃহকর্মীকে উদ্দীপকের কোনটিকে ব্যবহার করতে বলবেন? ব্যাখ্যা করো।

(ঘ) উদ্দীপকের গৃহকর্মীর বদহজম থেকে মুক্তি পাওয়ার রসায়ন সমীকরণসমূহ ব্যাখ্যা করো।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. সাবান প্রস্তুতিতে NaCl ব্যবহার করা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো।

২. অতিরিক্ত ডিটারজেন্ট ব্যবহার জলাশয়ের জন্য ক্ষতিকর কেন? ব্যাখ্যা করো।

৩. প্রসাধনীর pH 4.8 থেকে 5.5 এর মধ্যে হয় কেন? ব্যাখ্যা করো।

সমাপ্ত

২০২৬ শিক্ষাবর্ষ

দাখিল নবম ও দশম : রসায়ন

স্বপ্ন সেটা নয় যা তুমি ঘুমিয়ে দেখ,
স্বপ্ন সেটা যা তোমাকে ঘুমাতে দেয় না।
–এ পি জে আব্দুল কালাম

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।